



মহাবিশ্বে মহাকাশে

অকূল তিমিরসাগরে দীপকণার মতো নক্ষত্রখচিত গ্যালাক্সি ছড়ানো এই বিশ্বের কি কোথাও শেষ আছে?

বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল কি এক মহাবিস্ফোরণে? সেই অগ্নিময় প্রত্যুষেই কি বিশ্বের সমস্ত রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিল? নাকি এ বিশ্ব চিরদিনই ছিল? শূন্য থেকেই কি বিশ্ব জেগে উঠেছিল কণাপুঞ্জের ফেনা হয়ে?

এই বিভ্রান্তিকর বিশ্বে মানুষের স্থান কোথায়? বিশ্ব সংগঠনে এই অকল্পনীয় সামঞ্জস্য, এই অপরূপ সুষমা কোথা থেকে এলো? আমাদের বুদ্ধি, চিন্তা, সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ক কী? আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত সমীকরণের সঙ্গে বিশ্বের চলাচ্ছন্দ মিলে যায় কী করে?

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানী মৃণালকুমার দাশগুপ্তের ভাষায় লেখক এইসব প্রশ্নের আলোচনা "সাবলীল ছন্দে লিপিবদ্ধ করেছেন অননুকরণীয় ভাবে ও ভঙ্গীতে"।

গৌরীপ্রসাদ ঘোষ (জন্ম 1928) ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সুপরিচিত অধ্যাপক। খেয়ালচর্চা থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান এখন তাঁর সাধনার বিষয়। তিনি Sky Watchers' Association-এর প্রাক্তন সভাপতি। বাংলা ও ইংরেজি বিজ্ঞানপত্রিকার লেখক। তাঁর গবেষণাগ্রন্থ শেক্‌স্‌পিয়ার ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত।



ধনুরাশির বিখ্যাত উজ্জ্বল নীহারিকা Trifid Nebula বা M20

মহাবিশ্বে মহাকাশে

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বলোকের রূপ ও রহস্য

গৌরীপ্রসাদ ঘোষ

লেখনী প্রকাশন
কলকাতা

Mahāviśve Mahākaśe
IN THE IMMENSE SPACES OF THE UNIVERSE:
the Form and the Mystery of the Cosmos as viewed by Modern Astronomy
by Gouriprosad Ghosh

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৯৩
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : জুন, ১৯৯৪

প্রকাশক :
সংঘমিত্রা চন্দ
৩এ গোপী বোস লেন,
কলকাতা-৭০০ ০১২

ফটো টাইপ সেটিং :
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
৭, জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
প্রিন্ট-ও-গ্রাফ
৯ সি, ভবানী দত্ত লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

অলঙ্করণ : সর্বজিৎ সেন

বিন্যাস : সমীর দাস

প্রচ্ছদ পরিচিতি : Centaurus অঞ্চলে অবস্থিত ছায়াপথের একটি নক্ষত্র-নীহারিকা-সমৃদ্ধ অংশ

মূল্য : ষাট টাকা মাত্র

ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অভ্ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স-এর
কাভালুর ভৈনু বাপ্পু মানমন্দিরের ও কোদাইকানাল
সৌর মানমন্দিরের প্রাক্তন অধ্যক্ষ,
গৌরীবিদানুর রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্রের
প্রাক্তন যুগ্মাধ্যক্ষ এবং আমার পরম প্রেরণাদাতা

ডক্টর জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

করকমলে.

পরিচায়িকা

কয়েক বছর আগে অধ্যাপক গৌরীপ্রসাদ ঘোষ তাঁর লেখা কয়েকটি রচনা আমাকে পড়তে দিয়ে যান। লেখাগুলো "আমাদের মহাবিশ্ব—প্রকৃতি, গঠন, বিবর্তন" নামে ধারাবাহিকভাবে অধুনালুপ্ত "অন্বেষা" পত্রিকায় পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাগুলো পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাই। অধ্যাপক ঘোষের কাছে একটি প্রস্তাব রাখলাম: বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবং আধুনিক গবেষণালব্ধ নব্য তথ্যাবলীর যথাযথ সংযুক্তি ঘটিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ করুন। বললাম, ঠিক এই ধরনের পুস্তক বাংলা ভাষায় খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, তিনি আমার প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর কাজ শেষ—আমার হাতে এলো "মহাবিশ্বে মহাকাশে"-র পাণ্ডুলিপি।

গৌরীপ্রসাদবাবু ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ। দীর্ঘদিন বিভিন্ন সরকারি কলেজে ও বেশ কিছুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন, এবং সর্বশেষে মৌলানা আজাদ কলেজের ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছেন। পেশা আজীবন অধ্যাপনা, এবং তাঁর গবেষণা ও প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ মূলত শেক্স্পীয়র ও রবীন্দ্রনাথের ওপর। এর পাশাপাশি দুটি অনবদ্য নেশায় তিনি মেতে থাকতেন। প্রথমটি—আকাশ পর্যবেক্ষণ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চা। প্রথম দিকে বিভিন্ন কলেজের এবং পরে নিজের হাতে তৈরি ছোট মাপের দূরবীনে চোখ রেখে রাতের পর রাত ছাদে কাটাতে কখনও ক্লান্ত হতেন না। বিশ্বরহস্য তাঁকে বিহ্বল করে তুলতো। সঙ্গে সঙ্গে বিগত যুগের Jeans ও Eddington থেকে পরবর্তীকালের George Gamow, Fred Hoyle, Jayant Narlikar, Steven Weinberg প্রমুখ প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিজ্ঞানীদের লেখা পড়ে বিশ্বলোকের বিচিত্র রহস্য সম্বন্ধে পর্যায়ে পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। গত তিন বছর ধরে তিনি ছিলেন কলকাতার amateur astronomer-দের সুপরিচিত সংগঠন Sky Watchers' Association-এর সক্রিয় সভাপতি। যোগ্য ব্যক্তির যোগ্যতম পদমর্যাদা! কয়েক বছর আগে তিনি ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ মানমন্দিরের বড় মাপের দূরবীন ও আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমেও আকাশ পর্যবেক্ষণ করেন।

দ্বিতীয় নেশাটি আরো বৈচিত্র্যময়—হিমালয়ের দুর্গম গিরিমালার ক্রমবর্ধমান হাতছানি! সুযোগ পেলেই দু-একজন সঙ্গীসাথী নিয়ে ছুটতেন পর্বতাঞ্চলে—দুর্গম থেকে দুর্গমতর অঞ্চলে, হিমবাহ থেকে তুষারশৈলমূলে। রোমাঞ্চকর বিচিত্র সব কাহিনী তাঁর কাছ থেকে তন্ময় হয়ে শুনেছি। আমার বিশ্বাস, তাঁর পেশাগত পাণ্ডিত্য ও শিল্পসৌন্দর্যবোধের বিকাশ এবং নেশাগত প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তাই হয়তো "মহাবিশ্বে মহাকাশে" রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্যই অনুপ্রেরণা পেয়েছেন কবিগুরুর "বিশ্বপরিচয়" থেকে। আলোচ্য গ্রন্থের সুচিন্তিত নামকরণ সেই ইঙ্গিতই বহন করে!

পাণ্ডুলিপিটি বেশ কয়েকবার আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল।বইটির নামকরণ আমার কাছে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। মহাবিশ্ব, মহাকাশ এবং মহাকাল সম্বন্ধে গ্যালিলিওর (১৬১০ খৃঃ) আমল থেকে বর্তমান "মহাকাশ-যুগ" পর্যন্ত বহুবিধ তথ্য ও তত্ত্বাদির আলোতে গ্রন্থকার বিশ্বরহস্যের যথাযথ আলোচনা করেছেন। সাবলীল ছন্দে লিপিবদ্ধ করেছেন অননুকরণীয় ভাবে ও ভঙ্গীতে। লেখাটির প্রতি পর্যায়ে তাঁর অনবদ্য মুনশীয়ানা সত্যি প্রশংসনীয়।

বিগত কয়েক দশকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। শুধুমাত্র ভূপৃষ্ঠের মানমন্দিরই নয়—মহাকাশযান থেকে বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক চোখে ধরা পড়েছে অনেক অজানা রহস্য। আলোক-জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং রেডিও -জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়াও আলট্রাভায়োলেট, ইনফ্রারেড, এক্সরে, গামারশ্মি প্রভৃতি নব্য জ্যোতির্বিজ্ঞান উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। নবলব্ধ তথ্যাদির বিচারে অনেক ক্ষেত্রে জানা তত্ত্বগুলোর নতুন করে মূল্যায়ন করতে হয়েছে। গ্রন্থকার বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে সবকিছুই আলোচনা করেছেন। নক্ষত্র-নীহারিকা-খচিত গ্যালাক্সিসমূহ এবং গ্যালাক্সিপুঞ্জ -খচিত বিশ্ব-পরিসর; চতুর্মাত্রিক বিশ্ব-পরিসরের বিভিন্ন সম্ভাব্য গঠন ও পরিণতি; বিশ্বগঠনে অতিক্ষুদ্র ও অতিবৃহতের আন্তঃসম্পর্ক; "আদিম অগ্নিকুণ্ডের অবশেষ-রশ্মি" (2.7°K background radiation); নিউট্রন-তারা; পালসার; কোয়াসার; ব্ল্যাকহোল; অতিকায় অণুমেঘ; missing mass বা dark matter; বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কিত সম্প্রতিতম Inflation theory; বহির্বিশ্বে প্রাণের সম্ভাব্য অস্তিত্ব ইত্যাদি কোনো বিষয়ই আলোচনা থেকে বাদ যায়নি।

বিদেশী ভাষায় বিশেষজ্ঞদের লেখা এ-ধরনের জনপ্রিয় গ্রন্থের কথা আমরা জানি। বাংলা ভাষায় এখন পর্যন্ত সেরকম কিছু নেই বললেই চলে। অধ্যাপক গৌরীপ্রসাদ ঘোষ তাঁর রচনার মাধ্যমে সেই অভাব পূরণ করতে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর এই অনবদ্য অবদানের জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।আশা রাখি সুধী পাঠকমহলে "মহাবিশ্বে মহাকাশে" বিশেষভাবে সমাদৃত হবে।

মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
১৬·৭·৯৩

Professor M. K. Das Gupta
Formerly, Head, Centre of Advanced study
in Radio Physics-Electronics, Calcutta University
& Senior Scientist, INSA

আমার কথা

সারাজীবন সাহিত্যচর্চা করে কেন যে এই পদার্থবিদ্যার সূত্র-কন্টকিত (বা -আলোকিত) মহাকাশ-নিরীক্ষার ব্যাপারে ক্রমশই আগ্রহী হয়ে উঠলাম তা জানি না। নিছক খেয়ালই আমাকে এই বিচিত্র বিপথে নিয়ে গেছে।

তবে দায়হীন খেয়ালচর্চায় থাকে আনন্দ। এই যাত্রাপথে যে সামান্য জ্ঞানলাভ করেছি তার চেয়ে আনন্দ পেয়েছি শতগুণ বেশি। নানারকম দূরবীন দিয়ে মহাকাশের অবর্ণনীয় সব দৃশ্য দেখে যেমন অভিভূত হয়েছি তেমনিই বার বার রোমাঞ্চিত হয়েছি (সেদিনের James Jeans থেকে শুরু করে আজকের Stephen Hawking পর্যন্ত) প্রখ্যাত সব জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিজ্ঞানীদের বিশ্বলোক সম্পর্কিত তথ্যবিশ্লেষণ ও তত্ত্বরচনার অপূর্বতার আস্বাদ পেয়ে। আরো আনন্দের আহ্বান, আরো গভীর রহস্যের ইশারাই আমাকে এই দুরূহ পথে টেনে নিয়ে গেছে।

Astrophysics বা জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান-আবিষ্কৃত বিশ্বচিত্রের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টি দেওয়ার পিছনে আছে এই আনন্দের ঐশ্বর্যকে আমার মতো আরো অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা। তাছাড়া, এও মনে হয়, আমরা তো শুধু পৃথিবী নামক ছোট্টো গ্রহটির বাসিন্দা নই, আমরা সমস্ত বিশ্বলোকের নাগরিক। এই যে সীমাহীন মহাবিশ্ব তার অকূল শূন্যতা এবং অগণ্য জ্যোতিষ্কপুঞ্জ নিয়ে আমাদের ঘিরে আছে, এতো আমাদেরই জগৎ, আমরা তো এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, এর বিবর্তনের সঙ্গে আমরাও বিবর্তিত হয়েছি, এর অগণ্য কোটি তারার একটি তারা আমাদের জীবন-উৎস, এর উৎপত্তি ও চলচ্ছন্দের দোলা আমাদের সত্তার মধ্যে সঞ্চারিত। তাই মানুষের মতো উচ্চচেতনাসম্পন্ন জীবের পক্ষে তার এই বৃহত্তর আবাসটি সম্বন্ধে কিছুই না জানা, এই ক্ষুদ্র গ্রহটিকেই সব কিছু মনে করে তার সংকীর্ণ জটিলতায় আবদ্ধ থাকা, ঠিক শোভা পায় না। শুধু কয়েকজন বিজ্ঞানীর মধ্যেই এই বৃহত্তর বিশ্বচেতনা সীমাবদ্ধ থাকবে, এ দেশের সাধারণ মানুষ তার প্রায় কিছুই জানবে না, এটা বড় দুঃখের ব্যাপার বলে মনে হয়। তাই, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বিশ্বলোকের যে মহাবিস্ময়কর চিত্রটি উদ্ঘাটিত করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত ও সরল পরিচয় আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে সকলের কাছে পরিবেশন করার এই প্রয়াস।

বইটির নাম যে রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গানের প্রথম পংক্তি থেকে নেওয়া তা বোধহয় উল্লেখের প্রয়োজন নেই। 1938 সালে প্রকাশিত বিশ্বকবির "বিশ্বপরিচয়" গ্রন্থে ব্রহ্মাণ্ডের সংগঠন ও চলচ্ছন্দ সম্বন্ধে যে আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে তা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

শ্রী ধীরেন রায় ও শ্রী অবনী রায়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত একদা-সুপরিচিত মাসিক বিজ্ঞানপত্রিকা "অন্বেষা"-য় এই রচনার আদি রূপটি 1985 সালে পাঁচটি অংশে প্রকাশিত হয়।

"অন্বেষা"-র অন্যতম সম্পাদক খ্যাতিমান তরুণ পদার্থবিজ্ঞানী অভিজিৎ লাহিড়ীই প্রথম লেখাটির পুনঃপ্রকাশের কথা তুলেছিলেন। তাছাড়া আরো কয়েকজন বিজ্ঞানীর, এমন-কি বাঙ্গালোরের Indian Institute of Astrophysics-এর অধ্যক্ষ প্রফেসার জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রভূত প্রশংসা সত্ত্বেও এটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার কথা আমার মতো অবিজ্ঞানীর মাথায় আসেনি। মাঝখানে অক্সফোর্ডের উচ্চতম সম্মানের অধিকারী ইংরেজির অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী লেখাটিকে আশ্চর্য প্রাঞ্জল বলে বর্ণনা করে বলেন যে ওটি অবশ্যই বই হয়ে বেরোনো উচিত। তারপর বছরদেড়েক আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Radio Physics & Electronics বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন radio astronomer ডক্টর মৃণালকুমার দাশগুপ্ত আমার ঐ পুরোনো লেখাগুলি পড়ে বলেন যে রচনাটিকে পুনর্মার্জিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করলে সেটি popular science-এর এই বিশেষ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হবে। তাঁর এই আগ্রহের ফলেই শেষ পর্যন্ত বইটি বেরুলো।

আমি মূলত আর্টস লাইনের লোক। বিশেষ চর্চার বিষয় ছিলো উনিশ শতকের ইংরেজি কাব্য, শেকসপিয়ার ও রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতির্বিজ্ঞান বা বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যে অতি-সামান্য জ্ঞান আমি অর্জন করেছি তা হয়েছে শুধু আমার নিজের চেষ্টায়। তা যদি হয়, অর্থাৎ আমার মতো লোক যদি এ-সব দুরূহ ব্যাপার কিছুটা বুঝতে পেরে থাকে, তাহলে যে-কোনো আগ্রহী শিক্ষিত মানুষের পক্ষে এর অনেকটাই বোঝা সম্ভব। তাছাড়া বিষয়টির এমনই এক সম্মোহনী আকর্ষণ যে আগ্রহী পাঠক নিজের অজ্ঞাতসারেই এর রহস্যলোকে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন।

বিষয়টি আমি নিজের চেষ্টায় শিখেছি ঠিকই। কিন্তু গত দশ বছর ধরে বহু সুপরিচিত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর অমূল্য সান্নিধ্য লাভ করেছি, এবং ভারতের দুটি শ্রেষ্ঠ মানমন্দির IIA-র (93-ইঞ্চি ব্যাসের Vainu Bappu Telescope-সমন্বিত) Kavalur Observatory এবং হায়দ্রাবাদের Osmania University-র (48-ইঞ্চি টেলিস্কোপযুক্ত) Rangapar Observatory-তে অতিথি হিসাবে থেকে ঐ আশ্চর্য যন্ত্রগুলি দিয়ে আকাশ দেখার সুযোগ পেয়েছি। এর জন্য আমি ঐ দুই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত বিজ্ঞানী ও কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে ঋণী প্রফেসার জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রয়াত ডক্টর কে· কে· স্কারিয়া, ডক্টর কাজল ঘোষ, প্রফেসর এস· এম· আলাদিন ও ডক্টর শ্রীধর রাওয়ের কাছে।

আরো মনে পড়ে,11500 ফুট উঁচুতে সুদূর লাদাকের ছোট্টো লে (Leh) শহরের প্রান্তে অবস্থিত IIA-র অস্থায়ী মানমন্দিরে কাভালুরের দুই পুরোনো বন্ধু শ্রী আপ্পাকুট্টি ও শ্রী কুপ্পুস্বামীর সঙ্গে রাতের পর রাত আকাশ-পর্যবেক্ষণ।

এ-ছাড়াও আমাকে উৎসাহিত করেছে ভারতের সবচেয়ে অগ্রসর amateur astronomer-দের সংঘ, কলকাতার Sky Watchers' Association-এর সঙ্গে আমার গত দশ বছরের সম্পর্ক। আমি এই সংস্থার সদস্য, তিন বছর এঁদের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। সুতরাং এঁদের বেশি প্রশংসা করা আমার পক্ষে ঠিক হয় না। কিন্তু জ্ঞানান্বেষী মানুষদের,বিশেষত তরুণদের, জানা উচিত, এঁদের তৈরি 9-ইঞ্চি (ও অন্যান্য) টেলিস্কোপ ও এঁদের প্রকাশিত মাসিক Sky Watching Guide এই জাতীয় যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের গৌরবের বিষয়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় 45 Beni Banerjee Avenue, Calcutta-31-এ অবস্থিত এঁদের কার্যালয় ও প্রধান পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে যে-কোনো আগ্রহী ব্যক্তি সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন।

সমস্ত physical universe সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, ধারণা, অনুমান ইত্যাদির একটা সংক্ষিপ্ত সামগ্রিক পরিচয় দিতে গিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক গোড়াকার কথা আমাকে বাদ দিতে বা অত্যন্ত অল্পকথায় বলতে হয়েছে। যেমন সৌরজগতের বা যুগ্ম তারাদের কথা বা জ্যোতিষ্কদের দূরত্বনির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতির কথা খুব কমই বলা হয়েছে। দূরবীণে দেখা মহাকাশের অনির্বাচনীয় সৌন্দর্যের কথাও বলার বিশেষ অবকাশ হয়নি। সমগ্রকে স্থান দেবার জন্যে বিশেষকে সংকুচিত করতে হয়েছে।

অন্যদিকে আবার বিশ্বলোকের সামগ্রিক লক্ষণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা একটু বিশদভাবেই করতে হয়েছে—ব্যাপারগুলিকে বোধগম্য করে তোলার জন্যে। বৃহৎবিশ্বের সংগঠন এবং উৎপত্তির ব্যাপারে অতিক্ষুদ্র কণাজগতের ভূমিকার মতো জটিল ও কঠিন বিষয়কেও আমি (আমার ধারণাসীমার মধ্যে) যথাসম্ভব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন অব-পারমানবিক ও অব-অবপারমানবিক কণাদের, এবং real ও virtual কণাদের অতিসূক্ষ্ম ছায়াময় আন্তঃক্রিয়া সম্বন্ধেও মোটের ওপর সঠিক অথচ কিছুটা চিত্রধর্মী আলোচনা করার চেষ্টা করেছি—কারণ সমগ্রের সঙ্গে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এমন-কি বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কিত যে মাথা-ঘুরিয়ে-দেওয়া তত্ত্বটি—Inflation theory—সম্প্রতি পরিবেশিত হয়েছে সেটিরও মূলকথাটি ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছি। রহস্যসন্ধানী মানবমনের এইসব সুদূর চিন্তাভাবনার মধ্যে তথ্য ও তত্ত্বের, যুক্তি ও অনুমানের, বাস্তব ও স্বপ্নের যে বিচিত্র সমন্বয় দেখা যায় তার একটু আভাস দিতে চেয়েছি।

পাঠককে একটি অনুরোধ: বোঝার চেষ্টা করেও যদি কোথাও আটকে যায় তাহলে দয়া করে তখনকার মতো রেখে দিয়ে পরে আবার পড়বেন। দেখবেন, মাঝখানে নিজের অজান্তেই হয়তো সমাধানের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। আমার নিজের ক্ষেত্রে অসংখ্যবার এইরকম ঘটেছে।

পঁচিশটির মতো রঙিন ও সাদা-কালো প্লেটে বিভিন্ন বৃহৎ টেলিস্কোপের মাধ্যমে তোলা মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর আলোকচিত্র ও দু-একটি বিশেষ ধরনের ছক দেওয়া হল। ছবিগুলির স্বত্বাধিকারীদের প্রতি আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আলোকচিত্রগুলি প্রায় সবই বিভিন্ন উৎস থেকে অধ্যাপক-ফটোগ্রাফার সলিল বিশ্বাসের কুশলী হাতে তোলা। তাছাড়া ব্যাখ্যার পাশে পাশে আছে অনেকগুলি চিত্র বা নকশা। আর আছে সর্বজিৎ সেনের আঁকা আধুনিক বিশ্বতাত্ত্বিক চিন্তার সঙ্গে জড়িত কয়েকজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীর ছবি। প্লেটে পরিবেশিত রঙিন ও সাদা-কালো চিত্রগুলির সূক্ষ্ম রূপমুদ্রণের ব্যাপারে পুরোনো বন্ধু Hong Kong-এর *Far Eastern Economic Review*-এর Deputy Editor নয়ন চন্দের অমূল্য সহায়তা স্মরণীয়।

প্রফেসার মৃণাল কুমার দাশগুপ্তের কাছে আমার ঋণ উল্লেখের প্রয়োজন রাখে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Professor of Chemical Engineering পার্থসারথি রায় পাণ্ডুলিপিটি সযত্নে পড়ে একটি ভুল বার করেন ও দু-একটি সুন্দর সূক্ষ্ম পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। প্রকাশনার ব্যবস্থাপনায় তিন বন্ধু আশীষ লাহিড়ী, অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ সরদার ও দিলীপকুমার রায় প্রভৃত সাহায্য করেছেন। বইটির সামগ্রিক মুদ্রণ-পরিকল্পনা এবং সুরুচিপূর্ণ রূপসজ্জার কৃতিত্ব অধ্যাপক-বন্ধু পুলক চন্দের।

ব্লক H, ফ্ল্যাট 6,
বেলগাছিয়া ভিলা,
কলিকাতা 37

গৌরীপ্রসাদ ঘোষ

রঙিন প্লেট

1 সম্মুখচিত্র (Frontispiece): Sagittarius বা ধনুরাশিতে অবস্থিত চমকপ্রদ উজ্জ্বল নীহারিকা (emission nebula) Trifid Nebula (M 20 বা NGC 6514)। কয়েকটি অন্ধকার ধূলিপুঞ্জধারা যেন এটিকে তিনটি উজ্জ্বল অংশে বিভক্ত করেছে। মাঝখানের সাদা জায়গাটিতে আছে H40 নামে পরিচিত ছটি তরুণ তারার এক মহাকর্ষবদ্ধ গুচ্ছ। নীলাভ প্রধান তারাটির দীপ্তি সূর্যের প্রায় 15000 গুণ। এর প্রচণ্ড ultraviolet রশ্মি নীহারিকার হাইড্রোজেনকে আয়নিত করে তা থেকে লাল fluorescent আলোর বিকিরণ ঘটায়।

2 ছবির নিচে দেখুন।

3 উত্তর আকাশের সুন্দরতম মুক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ (open cluster) Pleiades বা কৃত্তিকা (M45)। বৃষরাশিতে প্রায় 400 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। তরুণ নীলাভ-শুভ্র তারাগুলি একটি ক্ষীণ নীহারিকার মধ্যে ভাসমান। উজ্জ্বলতর তারাগুলি সূর্যের কয়েকশো গুণ দীপ্তিমান। বহু পৌরাণিক কাহিনী এই মনোরম নক্ষত্রগুচ্ছটির সঙ্গে জড়িত।

4. দক্ষিণ আকাশের Carina মণ্ডলের অন্তর্গত নক্ষত্রগুচ্ছ NGC 3293। বিশাল উজ্জ্বল নীহারিকা Carina Nebula বা Keyhole Nebula-র একটু উত্তরে অবস্থিত। নীলাভ তরুণ তারা ও পুরোনো লালচে তারাদের সমাবেশ লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যে ঐ নক্ষত্রপুঞ্জটির জন্মদাত্রী নীহারিকাটি থেকে অতীতকালে পর্যায়ে পর্যায়ে নতুন তারার সৃষ্টি হয়েছে। নিচের লাল মেঘপুঞ্জটি Carina নীহারিকার একটি প্রান্ত।

5 আপাত-উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধক (Sirius) ও তার সাদা বামন (white dwarf) সঙ্গী। প্রায় সাড়ে আট আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। প্রধান তারাটির ভর সূর্যের প্রায় আড়াই গুণ এবং ঔজ্জ্বল্য প্রায় 25 গুণ। সাদা বামনটির ভর সূর্যের মতন, কিন্তু আয়তন পৃথিবীর চেয়ে সামান্য একটু বেশি—জ্বলনপর্বের শেষে অভিকর্ষ-ঘটিত সংকোচনের ফলে এর ঘনত্ব এমনই অস্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

6 The Great Orion Nebula (M42) বা কালপুরুষ মহানীহারিকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিখ্যাত বহু-সমন্বিত নক্ষত্র (multiple star) Theta Orionis। এর প্রধান চারটি তারা একটি চতুর্ভুজ গঠন করে আছে বলে এই সমাহারটি the Trapezium নামে পরিচিত।

বিপুল নীহারিকাটির ব্যাস 30 আলোকবর্ষের মতো এবং এটি আছে 1600 থেকে 1800 আলোকবর্ষ দূরে। এর একটি ক্ষুদ্র অংশ এখানে দেখানো হয়েছে। ট্র্যাপিজিয়াম্-এর অতিতরুণ প্রচণ্ড-দ্যুতিময় নীলাভ (0 শ্রেণীর) তারাগুলি থেকে বিকীর্ণ অতিবেগুনি রশ্মিস্রোত নীহারিকাটিকে তোলপাড় করে দিচ্ছে। এই অভিঘাতে আবার আয়নিত হাইড্রোজেন থেকে লালচে আলো ও দ্বি-আয়নিত অক্সিজেন থেকে সবুজ আলো বিপুল ধারায় বিকীর্ণ হচ্ছে। উজ্জ্বল গ্যাসপুঞ্জ ও কৃষ্ণবর্ণ ধূলিপুঞ্জ থেকে নীহারিকার মধ্যে এখনও নতুন তারার সৃষ্টি হচ্ছে।

7 Dumb-bell Nebula (M27 or NGC 6853) উত্তর-ঘেঁসা মধ্য আকাশে Vulpecula মণ্ডলে অবস্থিত সুবৃহৎ ও চমকপ্রদ Planetary nebula (গ্রহবৎ বা গ্রহোপম নীহারিকা)। মধ্যভরের তারারা জ্বলনের শেষ পর্বে বার বার স্ফীত-সংকুচিত হতে হতে উত্তপ্ত গ্যাসপুঞ্জ উৎক্ষিপ্ত করে। সংকোচমান তারাটির রঙিন গ্যাস-আবেষ্টনটিই planetary nebula বলে পরিচিত। M27-এর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নীল বামন (blue dwarf) তারাটির তাপমাত্রা 85000 ডিগ্রির মতো—সূর্যের প্রায় চোদ্দোগুণ।

8 Crab Nebula বা কর্কট নীহারিকা (M1 or NGC 1952)। এর প্রকৃতি ওপরের চিত্রের নীহারিকাটির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৃষরাশিতে অবস্থিত এই দ্রুতপ্রসারমান গ্যাসপুঞ্জটি একটি প্রাচীন সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষ। 1056 সালে চীনা জ্যোতির্বিদরা এই বিস্ফোরণশীল তারাটির আবির্ভাবের এক রোমাঞ্চকর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। কেন্দ্রস্থ pulsar বা neutron star-টিকে নীহারিকার ঠিক মাঝখানে দেখা যাচ্ছে। দূরত্ব 6000 আলোকবর্ষের মতো।

9 North America Nebula (NGC 7000): Cygnus বা রাজহংস মণ্ডলে মহাদানব নক্ষত্র Deneb-এর একটু পূর্বদিকে অবস্থিত নক্ষত্রালোকিত উজ্জ্বল গ্যাস ও কৃষ্ণ ধূলিপুঞ্জ সম্বলিত বিপুলকায় নীহারিকা। তরুণ তারাদের অতিবেগুনি রশ্মিতে উত্তেজিত হয়ে নীহারিকার হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি লাল আলো বিকিরণ করছে।

10 যুক্তরাষ্ট্রে Arizona-র নির্জন পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত Kitt Peak Observatory। প্রতিটি ঘূর্ণনযোগ্য গম্বুজের ভিতরে একটি বিশেষ ধরনের দূরবীন ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি আছে। বৃহত্তম দূরবীনটির ব্যাস চার মিটার (158 ইঞ্চি)। পৃথিবীর সবচেয়ে অগ্রবর্তী মানমন্দিরগুলির অন্যতম।

11 Centaurus মণ্ডলের ভিতর দিয়ে দেখা বিপুলকায় অদ্ভুতদর্শন গ্যালাক্সি NGC 5128। ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে তীব্র রেডিও তরঙ্গ-উৎস হিসাবে অন্য নাম Centaurus A। Elliptical ও spiral-এর মাঝামাঝি গঠনের গ্যালাক্সিটির নিরক্ষাঞ্চল বিদীর্ণ করে যেন এক বিপুল কৃষ্ণাভ মেঘপুঞ্জ বেরিয়ে আসছে। যে গ্যালাক্সিদের কেন্দ্রস্থল প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত তাদের বলা হয় active galaxy। এটি সেই দলের। দূরত্ব দু কোটি আলোকবর্ষের মতো। লাল ও নীল-সবুজ আলো যথাক্রমে আয়নিত হাইড্রোজেন (HII) ও দ্বি-আয়নিত অক্সিজেন (OIII) থেকে বিকীর্ণ।

সাদা-কালো প্লেট

1 কালপুরুষ (Orion) মণ্ডলের বিখ্যাত অশ্বমুণ্ড নীহারিকা (Horsehead Nebula)। অতীত সুপারনোভাদের বিস্ফোরণজাত বিপুল অন্ধকার ধূলিমেঘ ও উজ্জ্বলতর গ্যাসপুঞ্জের বিজড়িত রূপের এক চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত। প্রচণ্ড দীপ্তিমান তরুণ তারাগুলির তীব্র অতিবেগুনি রশ্মির অভিঘাতে সমস্ত নীহারিকা প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত। এই আলোড়নে মাধ্যাকর্ষণের আবর্ত সৃষ্টি হচ্ছে এবং ক্রমসংহত গ্যাস ও ধূলিপুঞ্জ থেকে নতুন তারার সৃষ্টি হচ্ছে।

2 Orion বা কালপুরুষের নক্ষত্র-নীহারিকা-সমৃদ্ধ চোখ-ধাঁধানো মধ্যাঞ্চল। বাইনকিউলারে দেখেই এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে হয়। ওপরে তিনটি প্রচণ্ড দীপ্তিময় তরুণ নীল নক্ষত্রে গঠিত কালপুরুষের কোমরবন্ধ। আশেপাশে অসংখ্য তারার ঝিকিমিকি—প্রত্যেকটিই সূর্যের বহুগুণ উজ্জ্বল। নিচে ঝুলছে তরবারি (Sword of Orion)। তার উজ্জ্বল কেন্দ্রটি হচ্ছে the Great Orion Nebula, যার অভ্যন্তরে আজও নতুন তারার সৃষ্টি হচ্ছে। (রঙিন প্লেট 6 দেখুন।)

3 1934-এর Nova Herculis—হঠাৎ সাময়িকভাবে প্রচণ্ড উজ্জ্বল হয়ে-ওঠা তারাদের একটি। দুটি অবস্থায় ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য লক্ষ্য করুন। কয়েকদিনের মধ্যে উজ্জ্বলতা চার লক্ষ গুণ বেড়ে ওঠে। তারপরে ধীরে ধীরে আবার ক্ষীণ হয়ে যায়।

4 কালপুরুষের পূর্বে Monoceros মণ্ডলে অবস্থিত শঙ্কু নীহারিকা (Cone Nebula NGC 2264। দূরত্ব 2600 আলোকবর্ষের মতো। নক্ষত্র-আলোকিত গ্যাসপুঞ্জ ও কৃষ্ণবর্ণ ধূলিমেঘের বিজড়িত উপস্থিতি এক অপার্থিব রহস্যলোক সৃষ্টি করেছে।

5 Perseus মণ্ডলের সুপরিচিত Double Cluster বা যুগ্ম নক্ষত্রগুচ্ছ (NGC 869 ও 884 বা H and Chi Perseii)। বাইনকিউলারে মনোরম দৃশ্য রচনা করে। সবই নবীন নীলাভ তারা। মধ্যে তিন-চারটি লাল মহাদানব তারা বিপুল ভরের চাপে দ্রুত-বিবর্তিত হয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। দূরত্ব 7500 আলোকবর্ষের মতো।

6 ছায়াপথের আপাতবৃত্তের জুন থেকে সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যাকাশে দৃশ্যমান অর্ধাংশ। অর্থাৎ এটি দেখার সময় আমরা Milky Way Disc-এর প্রান্তদেশ থেকে ভিতরের দিকে তাকাচ্ছি। Sagittarius-এ অবস্থিত মধ্যাঞ্চলটি সবচেয়ে নক্ষত্রসমৃদ্ধ। ঐ দিকেই আমাদের গ্যালাক্সির রহস্যময় কেন্দ্রস্থলটি প্রচ্ছন্ন আছে।

7 Globular Cluster বা গোলকাকার নক্ষত্রপুঞ্জগুলি ছায়াপথ-চক্রতলের বাইরে থেকে ছায়াপথ-কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে। এটি তাদের মধ্যে বিপুলতম ও উজ্জ্বলতম —Omega Centauri। Centaurus মণ্ডলে 17000 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এই ঘন-সন্নিবিষ্ট পুঞ্জের নক্ষত্রসংখ্যা অকল্পনীয়—প্রায় দশ লক্ষ। একটি অভিকেন্দ্রের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান।

8 কয়েকটি বিভিন্ন আকার ও শ্রেণীর গ্যালাক্সি। 1 এবং 2 দুটিই উপবৃত্তাকার (elliptical) শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু 1 ডিম্বাকৃতি (E6) আর 2 প্রায় গোলকাকৃতি (EO)। 3 হচ্ছে আমাদের ছায়াপথের মতো চক্রাকার ও কুণ্ডলিত, অর্থাৎ Spiral (Sc)। 4-এর মাঝখানে একটি দণ্ড থেকে দুদিকে দুটি বাহু নির্গত। এটি barred spiral শ্রেণীর (SBb)। 5 elliptical ও spiral-এর মাঝামাঝি। বিশাল কালো ধূলোর পটিটি লক্ষনীয়। 6-এর বিশেষ কোনো ছাঁদ নেই। Irregular শ্রেণীতে পড়ে।

9 Canes Venatici বা Hunting Dogs মণ্ডলের ভিতর দিয়ে দৃশ্যমান Spiral গ্যালাক্সি (M51 বা NGC 5194)। সবচেয়ে রোমাঞ্চকর চেহারার গ্যালাক্সিগুলির একটি—চলিত নাম ঘূর্ণি গ্যালাক্সি (Whirlpool Galaxy)। নিচের অনুচর গ্যালাক্সিটি (NGC 5195) যেন একটি শুঁড় দিয়ে মূল গ্যালাক্সিটির সঙ্গে জড়ানো। ছায়াপথের চেয়ে ভর, আয়তন ও উজ্জ্বলতা সবই বেশি। দূরত্ব আনুমানিক এক কোটি কুড়ি লক্ষ আলোকবর্ষ।

10 অপূর্ব-সুষমাময় গঠনের Spiral galaxy M81 (NGC 3031)। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ভিতর দিয়ে দেখা যায়। দূরত্ব 70 লক্ষ আলোকবর্ষের মতো। প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 77 কি·মি· বেগে আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে।

11 M87 (NGC 4486): হাজারখানেক গ্যালাক্সির পুঞ্জ Virgo Cluster-এর মাঝখানে অবস্থিত EO-জাতীয় দানব-গ্যালাক্সি। ব্যাস ছায়াপথের দশগুণ অর্থাৎ দশ লক্ষ আলোকবর্ষ হতে পারে। মূল গোলকটিকে ঘিরে আছে—সাদা বিন্দুর মতো—কয়েক হাজার globular cluster। কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসছে (এখানে অদৃশ্য) একটি নীলাভ স্রোত (jet)—যা থেকে মনে হয় এই গ্যালাক্সির কেন্দ্রেও একটা প্রচণ্ড আলোড়ন চলেছে। আনুমানিক দূরত্ব পাঁচ কোটি আলোকবর্ষ।

12 Large Magellanic Cloud (LMC): দক্ষিণ আকাশে ছায়াপথের নিকটতম অনুচর-গ্যালাক্সি। "মাত্র" এক লক্ষ সত্তর হাজার আলোকবর্ষ দূরে। Irregular শ্রেণীতে পড়ে। এর মধ্যে বিপুল সব নীহারিকা ও প্রচণ্ড-দীপ্তিময় সব নক্ষত্রগুচ্ছ আছে। এই "ছোটো" গ্যালাক্সিটিতেই আছে আমাদের জানা বিশালতম উজ্জ্বল গ্যাসপুঞ্জ ঊর্ণনাভ নীহারিকা (Tarantula Nebula) এবং আমাদের জানা উজ্জ্বলতম নক্ষত্র রহস্যময় S Doradus—যার গড় দীপ্তি পাঁচ লক্ষ সূর্যের দীপ্তির মতো। এই গ্যালাক্সিতেই 1987 সালে নতুন Supernova-টির আবির্ভাব হয়েছিল।

13 Virgo, অর্থাৎ কন্যারাশির মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান অপূর্বগঠন Sombrero Galaxy (M104 বা NGC 4594)। এর কিনারার দিকটা আমাদের দিকে ফেরানো। ধূলিমেঘের নিরক্ষীয় পটিটি লক্ষনীয়। Spiral a বা b শ্রেণীর। চওড়া কানাওয়ালা টুপির মতো দেখতে বলে চলতি নাম Sombrero Hat। আমাদের জানা বিপুলতম ও উজ্জ্বলতম গ্যালাক্সিগুলির অন্যতম।

14 Quasar 3C 273 : প্রায় তিনশো কোটি আলোকবর্ষ দূরের এই নক্ষত্রসদৃশ (quasi-stellar) বস্তুটির বর্ণালি-ছক সর্বপ্রথম সঠিকভাবে বিশ্লেষিত হয়, এবং জানা যায় যে কোয়েসাররা সত্যিই দূরবিশ্বের বস্তু এবং তাদের ঔজ্জ্বল্য এবং শক্তি-বিকিরণ সত্যিই অসাধারণ—বৃহত্তম গ্যালাক্সিদের 100 গুণেরও বেশি। 3C 273 সেকেন্ডে প্রায় 18000 কি·মি· বেগে আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে।

15 The Seyfert Sextet: অতিবৃহৎ ও অত্যুজ্জ্বল কেন্দ্রবিশিষ্ট পাঁচটি অদ্ভুত চেহারার গ্যালাক্সি ও (উত্তর-পূর্বে) একটি বিপুল গ্যাসপুঞ্জ। এদের মধ্যে চারটি পারস্পরিক অভিকর্ষে আবদ্ধ। দূরত্ব 27 কোটি (270 million) আলোকবর্ষের মতো। মাঝখানের চারকোণা গ্যালাক্সিটি কিন্তু আছে এদের পাঁচগুণ দূরে, এবং এটির অপসরণ-গতিবেগ (receding velocity) সেকেন্ডে প্রায় 20000 কি·মি·।

সূচিপত্র

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে—

রবীন্দ্রনাথ

Yon myriad-worlded way,
The vast sun-cluster's gathered blaze
World-isles in lonely skies,
Whole heavens within themselves, amaze
Our brief humanities—

Tennyson



এক

আজকের বিশ্বচিত্রের রূপরেখা ও আধুনিক বিশ্বতত্ত্বের পটভূমি

এই যে অকল্পনীয় রকমের বিশাল মহাবিশ্বে আমরা বাস করি—এর প্রকৃতি, পরিসর বা গঠন কী ধরনের? এর বিবর্তন কীভাবে, কোন পথে চলেছে? কীভাবে এর সৃষ্টি হয়েছিল? নাকি কোনদিনই এর সৃষ্টি হয়নি : চিরদিনই এই বিশ্ব ছিল? জীবজগতের, এবং আমাদের ধারণায় তার যে শ্রেষ্ঠ পরিণতি—মানুষ—তার এই মহাবিশ্বে কোথায় স্থান? জীবনের, প্রাণচেতনার, এই উপস্থিতির কোনো বিশেষ তাৎপর্য কি আমরা এই বিশ্বলোকের সংগঠনের মধ্যে দেখতে পাই?

এই সব প্রশ্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানের (astronomy-র), জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের (astro-physics-এর) এবং বহু-বিজ্ঞান-সমন্বিত বিশ্বতত্ত্বের (cosmology-র) গভীরতম অনুসন্ধানের বিষয়। তাছাড়া এর সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলির অনুধাবন উচ্চতম গাণিতিক চিন্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে (যাদের মধ্যে আমিও পড়ি) এই সব দুরূহ বিষয়গুলিকে সূক্ষ্মভাবে বা খুব স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব নয়। এখানে আমি এই গভীর ও জটিল বিষয়টি সম্বন্ধে খুব সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করতে চাই—বিশেষত তরুণ শিক্ষার্থীদের আর আমার মতো জিজ্ঞাসু বয়স্কদের কিছুটা কৌতূহল মেটানোর জন্যে।

আর একটি কথা। আমি এখানে বিশ্বতাত্ত্বিক চিন্তার দীর্ঘ অতীত ইতিহাস আলোচনা করবো না। শুধু এই শতাব্দীতে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও তত্ত্বচিন্তার মাধ্যমে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে পর্যায়ে পর্যায়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা যে-সব ধারণায় উপনীত হয়েছেন তার একটা প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

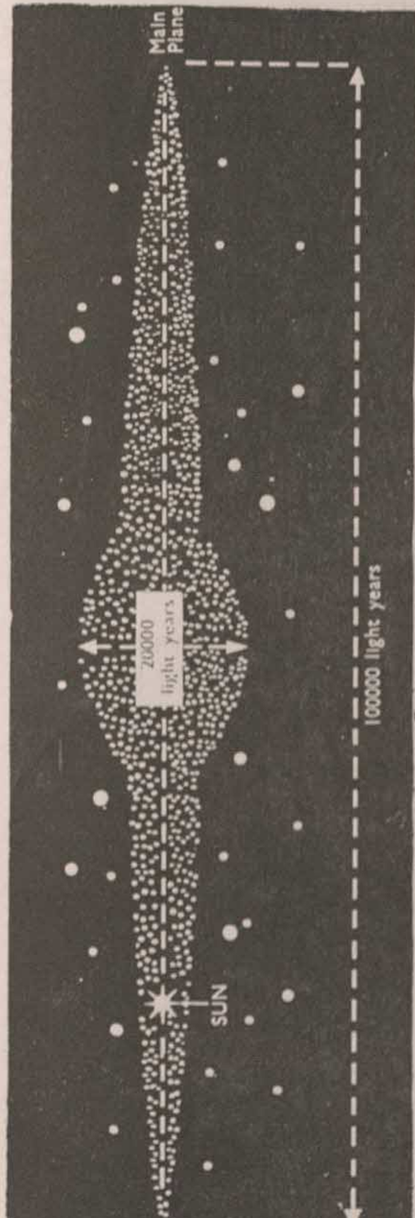
জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বিশ্বচিত্র

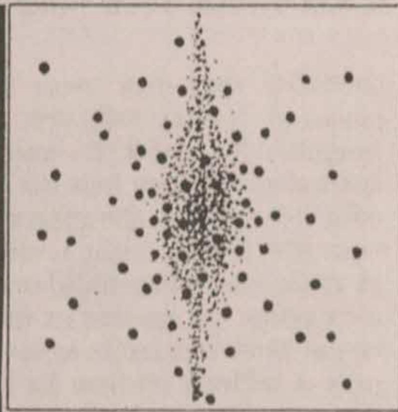
এ-যুগের প্রচণ্ড শক্তিমান এবং অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তিসম্পন্ন যন্ত্রগুলির (telescope, spectrograph, interferometer ইত্যাদির) সাহায্যে মহাবিশ্বের যে সামগ্রিক চিত্রটি পাওয়া গেছে তা অনেকটা এই রকম :

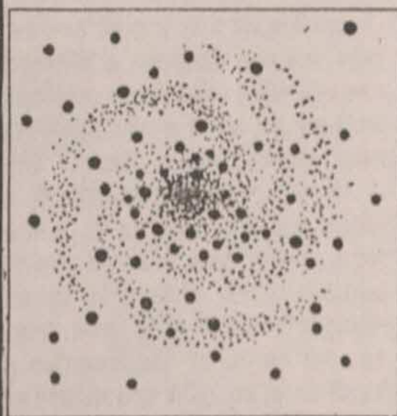
বিশ্বের অধিকাংশই হচ্ছে অতিশীতল (−273° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি), অন্ধকার, শূন্য পরিসর (empty space)। তার মাঝে মাঝে অনেক দূরে দূরে ভাসছে অসংখ্য—বহু কোটি—গ্যালাক্সি (galaxy), যাদের মধ্যে আমাদের ছায়াপথ (the Milky Way) একটি। প্রত্যেকটি গ্যালাক্সি হচ্ছে বিপুলসংখ্যক (সূর্যের মতো) জ্বলন্ত তারা, গ্যাসের পুঞ্জ ও ধূলোর মেঘের এক-একটি চক্রাকার, গোলকাকার বা অনিশ্চিত আকারের সমাবেশ। এই বিশাল পুঞ্জটি তার কেন্দ্রের প্রচণ্ড (ও রহস্যময়) অভিকর্ষবলে সারাক্ষণ নিজের চারদিকে পাক খেয়ে চলেছে। এক-একটি গ্যালাক্সিতে একশো কোটি থেকে পঞ্চাশ হাজার কোটিরও (500,000 million) বেশি তারা থাকতে পারে। এই গ্যালাক্সিগুলিকে বিশ্বসৌধরচনার এক-একটি একক—ইট বা প্রস্তরখণ্ড—বলা যেতে পারে (building blocks of the universe)। গ্যালাক্সির ঘূর্ণন কিন্তু চাকার ঘূর্ণনের মতো অখণ্ড নয়। এই ঘূর্ণন বিষম প্রকৃতির (differential rotation)। যে বস্তু গ্যালাক্সি-কেন্দ্রের যত কাছে তার কক্ষপথের গতি তত দ্রুত। সুতরাং প্রান্তবর্তী বস্তুগুলির যাত্রাবেগ হচ্ছে মন্থরতম। সূর্যের অবস্থান গ্যালাক্সি-কেন্দ্র থেকে 30000 আলোকবর্ষ দূরে। এই কক্ষপথে সূর্য তার গ্রহমণ্ডলীকে নিয়ে সেকেণ্ডে 250 কিলোমিটার বেগে ধাবিত, এবং ছায়াপথ-কেন্দ্রকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে তার লাগে 25 কোটি বছরের মতো (about 250 million years)।

প্রসঙ্গত, ছায়াপথ-গ্যালাক্সির সঠিক মানচিত্র রচনায় এবং সৌরজগতের এই প্রান্তবর্তী অবস্থান নির্ণয়ে অগ্রণী ছিলেন Mt. Wilson ও Harvard-এর প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ শ্যাপলি (Harlow Shapley)। মহাশূন্যের বিপুল তিমিরগর্ভে ক্ষীণ আলোকবর্তিকার মতো এই গ্যালাক্সিগুলি কিন্তু রয়েছে পুঞ্জে পুঞ্জে, এবং প্রত্যেকটি পুঞ্জের অন্তর্গত গ্যালাক্সিগুলি আবার পারস্পরিক অভিকর্ষের টানে বাঁধা। এইরকম অনেকগুলি "স্থানীয়" গ্যালাক্সিপুঞ্জ দিয়ে আবার গঠিত এক-একটি মহাগ্যালাক্সিপুঞ্জ। অনেক বিজ্ঞানীর ধারণায় আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সি ও তার স্থানীয় সঙ্গীগুলি হচ্ছে Virgo Supercluster নামক এক মহাগ্যালাক্সিপুঞ্জের মাঝারি আকারের সদস্য। এক-একটি গ্যালাক্সির ব্যাস পঁচিশ হাজার থেকে দশ লক্ষ আলোক-বৎসর হতে পারে। অর্থাৎ একটি খুব বড় গ্যালাক্সি পার হতে আলোরও লাগবে দশ লক্ষ বছর। একই পুঞ্জের দুটি গ্যালাক্সির মধ্যে আনুমানিক গড় দূরত্ব দশ-পনেরো লক্ষ আলোকবর্ষের মতো। আর এক পুঞ্জ থেকে আর-এক পুঞ্জের দূরত্ব কোটি আলোক-বৎসরের পর্যায়ে পড়ে। 1936 সালেই প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাবল্ (Edwin Hubble) বলেছিলেন : টেলিস্কোপের দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত গ্যালাক্সিগুলিকে একইভাবে ছড়ানো দেখা যাচ্ছে। আজ 1000 কোটি আলোকবর্ষেরও বেশি দূর পর্যন্ত আমাদের বৃহত্তম দূরবীনের দৃষ্টি প্রসারিত; কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে, মহাশূন্য একইভাবে গ্যালাক্সি-পরিকীর্ণ। সুদূর প্রত্যন্তপ্রদেশেও এই গ্যালাক্সি-সমাবেশের সমাপ্তির বা ক্ষীণায়নের কোনোরকম আভাস পাওয়া যায়নি।

আরো মনে হয়, মহাশূন্যে গ্যালাক্সিগুলি বা তাদের পুঞ্জগুলি মোটের ওপর সর্বত্রই সমান দূরত্বে অবস্থিত। অর্থাৎ, যতদূর জানা গেছে, মহাবিশ্বের সামগ্রিক চেহারা ও গঠন সব জায়গাতেই এবং সবদিকেই একই—সমসত্ব ও সর্বত্রসম (homogeneous and isotropic)।







চিত্র :

আমাদের ছায়াপথ - গ্যালাক্সির তিনটি পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক কল্পচিত্র। বাঁদিকের এবং ওপরের ছবিতে বিশাল নক্ষত্রনগরীটিকে পাশ থেকে দেখা হচ্ছে (edge-on view)। মূল তলের ব্যাস এক লক্ষ এবং কেন্দ্রের ব্যাস কুড়ি হাজার আলোকবর্ষ। Globular cluster-গুলি মূলতলকে ঘিরে আছে। ডানদিকের নিচের চিত্রটিতে ছায়াপথকে মুখোমুখি (face-on) দেখা যাচ্ছে। সর্পিল বাহুযুক্ত চক্রাকার আকৃতিটি সুস্পষ্ট। সূর্যের অবস্থান কেন্দ্র থেকে ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে।

গ্যালাক্সি ও নক্ষত্রের উৎপত্তি : নক্ষত্র-বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

গ্যালাক্সিগুলির আকার কয়েক রকমের হতে পারে : যেমন গোলকাকার বা উপবৃত্তাকার (elliptical), কুণ্ডলিত, অর্থাৎ চ্যাপ্টা ও পাক-খাওয়া (spiral), এবং বিষমাকার (irregular)। কিন্তু সবগুলিই গঠিত অজস্র তারা দিয়ে। এ ছাড়াও spiral এবং irregular গ্যালাক্সিগুলিতে আছে বিশাল বিশাল গ্যাস ও ধূলোর মেঘ। Gas cloud-গুলির উপাদানের বেশির ভাগই হচ্ছে লঘুতম মৌল হাইড্রোজেন (hydrogen); তার সঙ্গে আছে কিছু (দ্বিতীয় লঘুতম মৌল) হিলিআম (helium)। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা, সৃষ্টির মূল উপাদান হচ্ছে এই মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত হাইড্রোজেন-হিলিআম।এবং এই উপাদানই কোনো রহস্যময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘূর্ণায়মান পুঞ্জে পুঞ্জে সংহত হয়ে গ্যালাক্সিগুলির আকার ধারণ করে। বিশ্বলোকে প্রথম বস্তুপুঞ্জের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরের কয়েকটি পরিচ্ছেদে আছে। (সাদা-কালো প্লেট 8-এ শ্রেণীবিভক্ত গ্যালাক্সিদের চিত্র দেখুন। এছাড়া 11 নং রঙিন প্লেটে ও কয়েকটি সাদা-কালো প্লেটে আলাদা আলাদা গ্যালাক্সির ছবি আছে।)

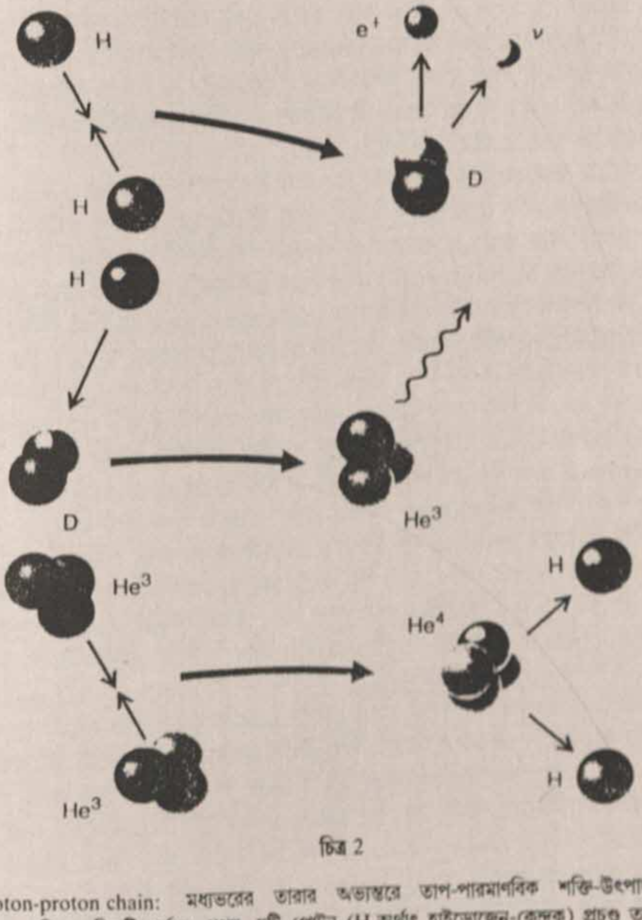
গ্যালাক্সিগুলির মধ্যে তারাদের উৎপত্তিও ঘটেছে এবং ঘটছে মূলত এই আদিম গ্যাসপুঞ্জ থেকে, যার মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিআমের পরিমাণ যথাক্রমে 75 ও 25 শতাংশের মতো। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির বিচিত্র লীলায় দোলায়িত হয়ে এই গ্যাসের বিপুল পুঞ্জগুলি ক্রমসংকুচিত, ক্রমবিভক্ত এবং ক্রমশই দ্রুততর বেগে ঘূর্ণায়মাণ হয়ে বিভিন্ন ধরনের নক্ষত্রপুঞ্জ, বিশেষ বিশেষ নক্ষত্র, গ্রহমণ্ডল, ধূমকেতু উল্কারাজি ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে।

এইরকম এক-একটি নক্ষত্র-গঠনকারী গ্যাসপুঞ্জ বহুযুগ ধরে তার নিজস্ব অভিকর্ষবলে ঘনীভূত হতে হতে প্রাক-নক্ষত্র বা protostar-এর পর্যায় পার হয়ে বিকিরণকারী নক্ষত্রের পর্যায়ে পৌঁছায়। অর্থাৎ অভিকর্ষের প্রচণ্ড চাপে কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা যখন এক কোটি (10 million) ডিগ্রিতে পৌঁছায় তখন তার প্রভাবে (মোটের ওপর) চারটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু-কেন্দ্রক, অর্থাৎ চারটি প্রোটন, জুড়ে গিয়ে একটি করে হিলিআম পরমাণু-কেন্দ্রক সৃষ্টি হয়। আর প্রধানত এই তাপ-পারমাণবিক (thermonuclear) প্রক্রিয়ায় যে আলো, তাপ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, সেটাই হচ্ছে আমাদের সূর্যের মতো মাঝারি ভরের তারার কিরণ-বিকিরণের উৎস। এই প্রক্রিয়ার নাম proton-proton chain। কিন্তু যে-সব তারার ভর আরো অনেক বেশি তাদের কেন্দ্রের উচ্চতর তাপমাত্রায় প্রধানত carbon cycle বা carbon-nitrogen cycle নামক অন্য একটি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চারটি করে হাইড্রোজেন কেন্দ্রক একটি করে হিলিআম কেন্দ্রকে পরিণত হয়ে আরো দ্রুত হারে শক্তি উৎপাদন করে।

যে-কোনো তারার অস্তিত্ব বা সুস্থিতি (stability) নির্ভর করে তার নিজস্ব অভিকেন্দ্রিক চাপ ও তার কেন্দ্রজাত তাপশক্তির বহির্মুখী চাপের ভারসাম্যের ওপরে। সূর্যের মতো ভরের তারা তার জীবনের সুদীর্ঘ যৌবনকাল ধরে তার কেন্দ্রস্থ হাইড্রোজেন-জ্বালানি পুড়িয়ে শক্তি উৎপাদন করতে থাকে। কয়েকশো কোটি বছরব্যাপী এই পর্যায়ে তার ভারসাম্য মোটামুটি ঠিক থাকে। ঐ সুদীর্ঘ হাইড্রোজেন-জ্বলনপর্বে তাকে বলা হয় মুখ্যপর্বের তারা বা main sequence star (H. R. Diagram-এর চিত্র দেখুন)।

কালক্রমে তারার কেন্দ্রে হাইড্রোজেন-জ্বালানি হিলিআমে পরিণত হয়ে নিঃশেষিত হয়ে আসে, এবং শক্তি-উৎপাদনের হার কমে যায়। তাপশক্তির বহির্মুখী চাপ কমে আসার ফলে

তখন কেন্দ্রমুখী মহাকর্ষশক্তি প্রবল হয়ে ওঠে, এবং তারাটির বাইরের স্তরগুলি ভিতরের দিকে ঠেলে নেমে আসে। এই সংকোচনের ফলে আবার তাপমাত্রা বেড়ে ওঠে, এবং তার প্রভাবে



চিত্র 2

Proton-proton chain: মধ্যভরের তারার অভ্যন্তরে তাপ-পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদনের প্রধান প্রক্রিয়া। তিনটি পর্যায়। প্রথম: দুটি প্রোটন (H অর্থাৎ হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক) প্রচণ্ড তাপের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে বা আটকে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে জোড় থেকে একটি পজিটিভ ইলেকট্রন (positron) ও একটি নিউট্রিনো বেরিয়ে যাচ্ছে। ফলে জোড়ের একটি proton neutron-এ পরিণত হচ্ছে, এবং জোটটি হয়ে দাঁড়াচ্ছে একটি heavy hydrogen কেন্দ্রক বা deuteron (D)। দ্বিতীয়: D-এর সঙ্গে আর একটি প্রোটন (H) জুড়ে তৈরি হচ্ছে হালকা হিলিয়াম (He^3), এবং ঐ ত্রিজোট থেকে একটি প্রচণ্ড-শক্তিসম্পন্ন gamma ray photon নির্গত হচ্ছে। তৃতীয়: দুটি হালকা হিলিয়াম-এর সংঘর্ষ। দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন-বিশিষ্ট ভারি হিলিয়াম-কেন্দ্রক (alpha particle) সৃষ্টি। বাড়তি দুটি প্রোটন ছটকে বেরিয়ে যায়। প্রতি পর্যায়েই কিছু-পরিমাণ শক্তি সৃষ্টি হচ্ছে।

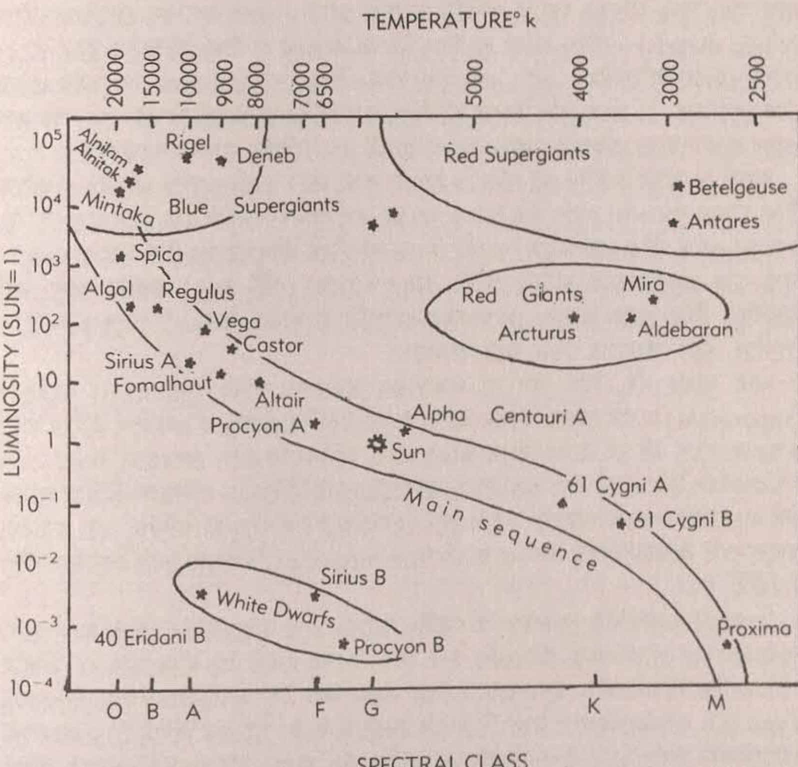
হিলিআম-গঠিত কেন্দ্রকের চতুর্দিকে অবস্থিত হাইড্রোজেন আবার হিলিআমে পরিণত হয়ে শক্তি উৎপাদন করতে থাকে। আর সেই বহির্মুখী শক্তির চাপে তারাটির বাইরের স্তরগুলি ফুলে ওঠে, এবং তারাটি একটি স্ফীত লালদানব বা red giant star-এ পরিণত হয়। লক্ষ্য করুন, তারাটি H. R. Diagram-এ main sequence থেকে একটু ওপর-ঘেঁসা ডানদিকে সরে যাচ্ছে। ওপরে যাওয়া মানে সামগ্রিক দীপ্তি (luminosity) বাড়া। আর ডানদিকে যাওয়া মানে হচ্ছে উপরিতলের তাপমাত্রা কমে যাওয়া অর্থাৎ সাদা থেকে হলদে বা লালচে হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ সামগ্রিক বিকিরণ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও ঐ বিকিরণ এক বিপুলতর উপরিতলে ছড়িয়ে পড়ার ফলে তারাটিকে লালচে অর্থাৎ ক্ষীণতর দেখায়।

এই পর্যায়ে উত্তরোত্তর সংকোচনের ফলে তারাটির কেন্দ্রে এক সময় দশ কোটি (100 million) ডিগ্রির মতো উত্তাপের সৃষ্টি হয়, এবং ঐ অবস্থায় কেন্দ্রের জমাট হিলিআমের তালটিই জ্বালানি হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড তাপের তাড়নায় প্রতি তিনটি 4-ভরের হিলিআম-কেন্দ্রক (যার আর এক নাম alpha particle) জুড়ে গিয়ে এক-একটি 12-ভরের কার্বন-কেন্দ্রক সৃষ্টি হয়। এই তাপ-পারমাণবিক প্রক্রিয়াটিকে বলে triple alpha process। এই হিলিআম-জ্বলন (helium flash) কিন্তু খুবই স্বল্পস্থায়ী, এবং এই প্রক্রিয়া আগেকার হাইড্রোজেন-জ্বলনের চেয়ে অনেক কম শক্তি বিকীর্ণ করে। ফলে তারার বাইরের স্তরগুলি বারবার ভিতরের দিকে ধসে পড়তে থাকে, এবং ঐ সংকোচনজনিত তাপবৃদ্ধির ফলে বার বার তারাটি ফুলে উঠতে থাকে। অর্থাৎ helium flash-এর আকস্মিক প্রকোপে তারাটির ভারসাম্য বারবার বিপর্যস্ত হয়। H. R. Diagram-এ দেখা যায় এই পর্যায়ে তারাটি বাঁ দিক, অর্থাৎ main sequence-এর দিক এবং ডানদিক অর্থাৎ লালদানবত্বের দিকের মধ্যে বারবার দোলায়িত হয়।

মধ্যভরের তারাদের জ্বলনের ইতিহাস কার্যত এখানেই শেষ। কারণ কার্বনগঠিত কেন্দ্রককে আবার জ্বালানিতে পরিণত করার জন্য যে তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় তা সৃষ্টি করার মতো অভিকর্ষশক্তি এই জাতীয় মধ্যভরের তারার থাকে না। (কোনো কোনো বিজ্ঞানীর অবশ্য ধারণা এই thermonuclear প্রক্রিয়াটি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে, অর্থাৎ কার্বন-কেন্দ্রকের অক্সিজেনে আংশিক রূপান্তর ঘটিয়ে শেষ হয়।) তাপশক্তি বা thermal energy-র উৎসটি প্রায়-নিঃশেষ হওয়ার ফলে অভিকর্ষের চাপে তারাটি ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। তখন সমস্ত শক্তি একটা ক্ষুদ্রতর উপরিতলের ভিতর দিয়ে বিকীর্ণ হওয়ার ফলে তারাটি উত্তপ্ততর হয়ে ওঠে, এবং এবার তার রং বদলাতে থাকে উল্টো দিকে। অর্থাৎ লোহিতাভ থেকে পীতাভ, তারপরে সাদা বা নীলাভ। অর্থাৎ H. R. Diagram-এ তারাটি ডানদিকের red giant অবস্থান থেকে বাঁদিকে main sequence পর্যায়ের দিকে দ্রুত সরতে থাকে। আরো সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে তারাটি main sequence-এর লাইন পার হয়ে বাঁ দিকে গিয়ে তার পরে নিচের দিকে নামতে থাকে। অর্থাৎ ছোট্টো হয়ে গিয়ে প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু শক্তি-উৎসহীনতার দরুণ এবং অবিরত বিকিরণের ফলে ধীরে ধীরে ক্ষীণদীপ্তি হয়ে যায়।

Main sequence-এর ডানদিক থেকে বাঁদিকে চলে আসার পর্যায়টিতে তারাটির দুটি গুরুতর আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে। সংকোচমান তারাটির কেন্দ্র ঘিরে থেকে থেকে নিবন্ত তাপ-পারমাণবিক চুল্লির শেষ অগ্ন্যুচ্ছ্বাসগুলি জেগে উঠে আকস্মিক বহির্মুখী চাপের সৃষ্টি করে, এবং সেই চাপজনিত বিস্ফোরণে প্রতিবারই তারাটির বহিরাংশের কিছুটা মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়। এই উদগীর্ণ গ্যাসস্রোত তারাটির চারিদিকে একটি বলয় রচনা করে। পরিবেষ্টনকারী এই

অঙ্গুরীসদৃশ বহুবর্ণ বাষ্পপুঞ্জটি গ্রহবৎ নীহারিকা বা planetary nebula নামে পরিচিত (রঙিন প্লেট 7 দেখুন।) অন্যদিকে অন্তিম অগ্ন্যুচ্ছ্বাসগুলির তাড়নায় যখন তারাটির বাইরের



চিত্র 3

ডেনিশ বিজ্ঞানী E. Hertzsprung কর্তৃক 1911 সালে এবং মার্কিন বিজ্ঞানী H. N. Russel কর্তৃক 1913 সালে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভাবিত পরম-গুরুত্বপূর্ণ H-R Diagram। তারাদের উজ্জ্বলতা (যা সাধারণত তাদের ভরের ওপর নির্ভরশীল) এবং তাদের উপরিতলের তাপমাত্রা (যা তাদের রং এবং বর্ণালিগত চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত)-এই দুটি লক্ষণ অনুযায়ী তারাগুলি এই ছকে স্থান পেয়েছে। যে তারার অবস্থান যত ওপরদিকে সেটি তত বেশি দীপ্তিমান। (ওপরের বাঁ-কোণে নীলাভ মহাদানব Rigel ও Deneb-এর তাপমাত্রা সূর্যের 10^5 অর্থাৎ লক্ষগুণের কিছু কম। সূর্য মাঝামাঝি অবস্থানের; তার তাপমাত্রাকে একক ধরা হয়েছে।) যে-তারা যত বাঁদিকে তার তাপমাত্রা তত বেশি এবং রং সাদা পেরিয়ে নীলের দিকে। যত ডানদিকে, তাপমাত্রা তত কম এবং রং ক্রমশ হলদে হয়ে লালের দিকে। এ ব্যাপারেও সূর্য মাঝামাঝি জায়গায়: তাপমাত্রা 6000K আর রং হলদে-ছোঁয়া সাদা। (চিত্র 4 দেখুন)

স্তরগুলি মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তখন তার কার্বন-কেন্দ্রকটি উত্তরোত্তর সংকুচিত হয়ে 12-ভরের কার্বন-কেন্দ্রক ও কেন্দ্রক-বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রনদের একটি অভাবনীয় রকমের ঘন জমাট তালে পরিণত হচ্ছে। কালক্রমে বহুক্ষেত্রেই বিসর্জিত গ্যাসের আবেষ্টনীটি মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। অবশিষ্ট থাকে শুধু ধসে-পড়া কেন্দ্রকটি (collapsed core), যার ভর সূর্যের হয়তো কাছাকাছি, কিন্তু আয়তন হয়তো পৃথিবীর চেয়েও ছোটো। এদের বলা হয় শ্বেতবামন তারা (white dwarfs)—যদিও এদের রং ঈষৎ নীলাভ বা সাদা বা ঈষৎ হরিদ্রাভও হতে পারে। এদের কোনো শক্তি-উৎস নেই। এরা মৃত তারা। কিন্তু শেষ collapse-এর সময় এদের কেন্দ্রকের মধ্যে যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়েছিল, তার বিকিরণই তারাটিকে বহু লক্ষ বছর ধরে ভাস্বর করে রাখবে। তারপরে একদিন অবশ্য তারাটি এক দীপ্তিহীন কৃষ্ণবস্তুপিণ্ডে পরিণত হবে।

আমাদের সূর্যের একদিন এই পরিণতি হওয়ার কথা। তবে ততদিন পর্যন্ত মানুষের পৃথিবীতে টিকে থাকার কথা নয়। কারণ তার অনেক আগেই, সূর্য যখন লালদানব হয়ে উঠে প্রায় পৃথিবীর কক্ষপথ পর্যন্ত স্ফীত হয়ে উঠবে, তখনই নিশ্চয় পৃথিবীতে জীবনের সব চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তার এখন অনেক অনেক দেরি—অন্তত পাঁচশো কোটি বছর। ততদিন মানুষ যদি পৃথিবীতে টিকে থাকে তাহলে সে সম্ভবত বৃহস্পতি বা শনির কোনো উপগ্রহে চলে গিয়ে সেখানে নতুন সভ্যতার পত্তন করে ফেলবে।

আর সূর্যের দুই, পাঁচ, দশ বা পঞ্চাশগুণ ভরসম্পন্ন দানব (giant) বা মহাদানব (supergiant) তারার ক্ষেত্রে বিবর্তন আরো বহুদূর এবং আরো অনেক দ্রুতছন্দে এগিয়ে যায়। দ্রুততার কারণ এই যে এদের বিপুল ভরের প্রচণ্ড অভিকর্ষের চাপে কেন্দ্রস্থলে অনেক বেশি পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় এবং তার প্রভাবে হাইড্রোজেনের হিলিআমে রূপান্তরণ-প্রক্রিয়া অনেক দ্রুত হারে ঘটতে থাকে। প্রসঙ্গত, এই কারণে বৃহৎ তারাদের জীবনকাল সংক্ষিপ্ত, এবং অল্পভর, অর্থাৎ দুর্বল অভিকর্ষসম্পন্ন নক্ষত্ররা তাদের 'thermonuclear' জ্বলনপ্রক্রিয়ার মন্থরতার দরুণ দীর্ঘজীবী হয়।

বিপুলভর-তারাগুলির কেন্দ্রস্থলে অকল্পনীয় তাপের মধ্যে হাইড্রোজেন থেকে ধাপে ধাপে 56-ভরসম্পন্ন লোহা পর্যন্ত মৌলগুলি সৃষ্টি হয়। তারপর একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাদানবটির জীবনাবসান হয়। এই পর্যায়ে একে বলা হয় সুপারনোভা (Supernova Type-II)। এই বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে (i) একদিকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই 238-ভরসম্পন্ন ইউরেনিআম পর্যন্ত ভারি উপাদানগুলি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সৃষ্টি হয়ে মহাশূন্যের আদিম হাইড্রোজেন-হিলিআম সাগরে নতুন উপাদানের সঞ্চার করে। আর (ii) অন্যদিকে কয়েকটি সূর্যের ভরবিশিষ্ট লৌহকেন্দ্রকটি ভয়াবহভাবে collapse করে একটি অতিক্ষুদ্র—কয়েক মাইল মাত্র ব্যাসের—নিউট্রনপিণ্ড সৃষ্টি করে। অথবা আরো প্রচণ্ডভাবে ধসে গিয়ে এক পরমরহস্যময় বিন্দুবৎ কৃষ্ণগহ্বর (black hole) সৃষ্টি করে। এ সম্বন্ধে পরে আরো বিস্তারিত আলোচনা আছে। (সপ্তম পরিচ্ছেদে supernova-র চিত্র দেখুন।)

আর এক ধরনের নক্ষত্র-বিস্ফোরণ ঘটে—একটি white dwarf জাতীয় তারার ওপর এক প্রতিবেশী স্ফীত তারা থেকে অভিকর্ষস্রোতে-ভেসে-আসা হাইড্রোজেনের ক্রমিক সমাবেশের ফলে। কালক্রমে সাদা বামনের পিঠে জমে-ওঠা ঐ হাইড্রোজেন তাপবৃদ্ধির ফলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে হিলিআমে পরিণত হয়ে শূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়। Dwarf-টির ওপর আবার একই ভাবে হাইড্রোজেন জমে উঠলে আবার ঐ বিস্ফোরণ ঘটে। এই জাতীয় বিস্ফোরণকে বলে nova, এবং এর দীপ্তি সাময়িকভাবে সূর্যের লক্ষগুণও হতে পারে। আর দুর্লভ ক্ষেত্রে white

dwarf বা neutron star-এর ওপর দীর্ঘদিন-ধরে জমে-ওঠা হাইড্রোজেনের বিস্ফোরণটি এতই প্রচণ্ড হয় যে তার ধাক্কায় গোটা তারাটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। এ হচ্ছে আর এক ধরনের supernova (Type-I)।

তারাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীবিভাগটি হয় তাদের উপরিতলের তাপমাত্রার ও তাদের বর্ণালির বিশেষত্বের ভিত্তিতে। অতিবেগুনি (ultraviolet) থেকে অবলোহিত প্রান্ত (infrared end) পর্যন্ত বিস্তৃত বর্ণালির ওপর খাড়াভাবে বিন্যস্ত উজ্জ্বল ও কালো রেখাগুলি বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় কোন তারার বর্ণমণ্ডলে (chromosphere-এ) কোন কোন মৌল উপাদান (বা অণু) কী পরিমাণে এবং কতটা আয়নিত অবস্থায় আছে। এ বিষয়ে বহু জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীর মধ্যে মেঘনাদ সাহার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 1920 সালে *Philosophical Magazine*-এ প্রকাশিত তাঁর গবেষণাপত্র On the Ionization of the Solar Chromosphere-এ সন্নিবিষ্ট বিখ্যাত Saha Ionization Equation-টি কোনো বিশেষ তাপমাত্রাসম্পন্ন তারার বর্ণমণ্ডলে লক্ষিত বিভিন্ন মৌলের ইলেকট্রনযুক্ত, আয়নিত ও দ্বি-আয়নিত (neutral, singly ionized and doubly ionized) রূপগুলির পারস্পরিক অনুপাত সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করে তারাদের গঠন সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞানের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

প্রবীণ ও নবীন তারা : গ্যালাক্সির গঠন

Spiral অর্থাৎ চক্রবৎ বা কুণ্ডলিত আকারের গ্যালাক্সিগুলিতে মোটের ওপর দুরকম চেহারার ও বয়সের তারা দেখা যায়। কেন্দ্র থেকে যে সর্পিল বাহুগুলি গোল হয়ে বেরিয়ে এসেছে তাতে অবস্থিত অধিকাংশ তারাই সাদা বা নীলাভ রঙের। অর্থাৎ এগুলি অপেক্ষাকৃত তরুণ তারা; বয়স হয়তো দুশো থেকে তিনশো কোটি বছরের বেশি নয় (Population I stars)। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, এগুলিকে ঘিরে আছে আদিম গ্যাসপুঞ্জ আর সুপারনোভা-বিস্ফোরণপ্রসূত বিরাট বিরাট ধূলোর মেঘ—যার থেকে এখনও নতুন তারার উদ্ভব হচ্ছে। (সাদা-কালো প্লেট 1 এবং 4 দেখুন।) পক্ষান্তরে, গ্যালাক্সির বিপুল নক্ষত্রঘন কেন্দ্রটির দিকে দেখা যায় বেশির ভাগই পুরোনো লালচে তারার ভিড় (Population II stars)। আমাদের নিজেদের ছায়াপথ-গ্যালাক্সির রহস্যময় কেন্দ্রস্থলে (Sagittarius বা ধনুরাশি যেদিকে আছে সেই দিকে) কী আছে তা জানার পথে বিরাট বাধা ঐদিকে পরিব্যাপ্ত বহুশত আলোকবর্ষব্যাপী এক মহাজাগতিক ধূলিপুঞ্জ। এ-ছাড়াও চক্রাকার ও উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিগুলিকে ঘিরে থাকে কতকগুলি গোলকাকার নক্ষত্রপুঞ্জ (globular clusters)-যাদের এক-একটির মধ্যে 25,000 থেকে দশ লক্ষ পর্যন্ত তারা অত্যন্ত ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে। আমাদের ছায়াপথের মূল চক্রাকার তলের দুদিকে বিন্যস্ত এইরকম globular cluster পাওয়া গেছে দুশোটির মতো। এদের তারাগুলিও কিন্তু গ্যালাক্সির কেন্দ্র-ঘেঁসা তারাগুলির মতো লালচে। অর্থাৎ এরাও পুরোনো তারা; ছায়াপথের শৈশবকালে এদের উৎপত্তি। (সাদা-কালো প্লেট 7 এবং 11 দেখুন।)

ডিম্বাকার বা উপবৃত্তাকার (elliptical) গ্যালাক্সিদের গঠন কিন্তু একেবারে ভিন্ন। (EO নামে অভিহিত elliptical গ্যালাক্সিগুলি সম্পূর্ণ গোলকাকার)। প্রথমত এদের মধ্যে নতুন নীলাভ-শুভ্র তারা নেই বললেই হয়। প্রায় সব তারাগুলিই পুরোনো, Population-II শ্রেণীর,

অর্থাৎ পীতাভ বা লালচে রঙের। দ্বিতীয়ত এদের মধ্যে ধূলিমেঘ (dust clouds) নেই বললেই চলে। এ ছাড়া spiral গ্যালাক্সিদের মতো কেন্দ্রনির্গত সর্পিল বাহু বা কুণ্ডলী এদের নেই; কোনো চক্রাকার মূল তলও নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরা প্রায় গোলকাকৃতি ও বিশালকায়। Virgo cluster-এর পরম-বিস্ময়কর M-87 নামক elliptical galaxyটি আমাদের বিশাল ছায়াপথ-গ্যালাক্সির চেয়ে পাচ-ছ গুণ বড় বলে মনে হয়।(সাদা-কালো প্লেট 8 দেখুন।)

খুব সম্প্রতি কয়েকজন বিজ্ঞানী বলেছেন গোলকাকার elliptical galaxy-গুলি সম্ভবত দুটি চ্যাপটা spiral galaxy-র সংঘাতের ফলে উৎপন্ন হয়। অনুমানটি সম্ভবত ঠিক নয়, কারণ ঐ রকম সংঘর্ষ হলে globular cluster গুলি নিঃসন্দেহে স্থানচ্যুত হতো। কিন্তু সেরকম দেখা যায় না। M-87-এর চারিদিক ঘিরে সহস্রাধিক globular cluster-এর সুষম সন্নিবেশ দেখা যায়। (সাদা-কালো প্লেট 11)

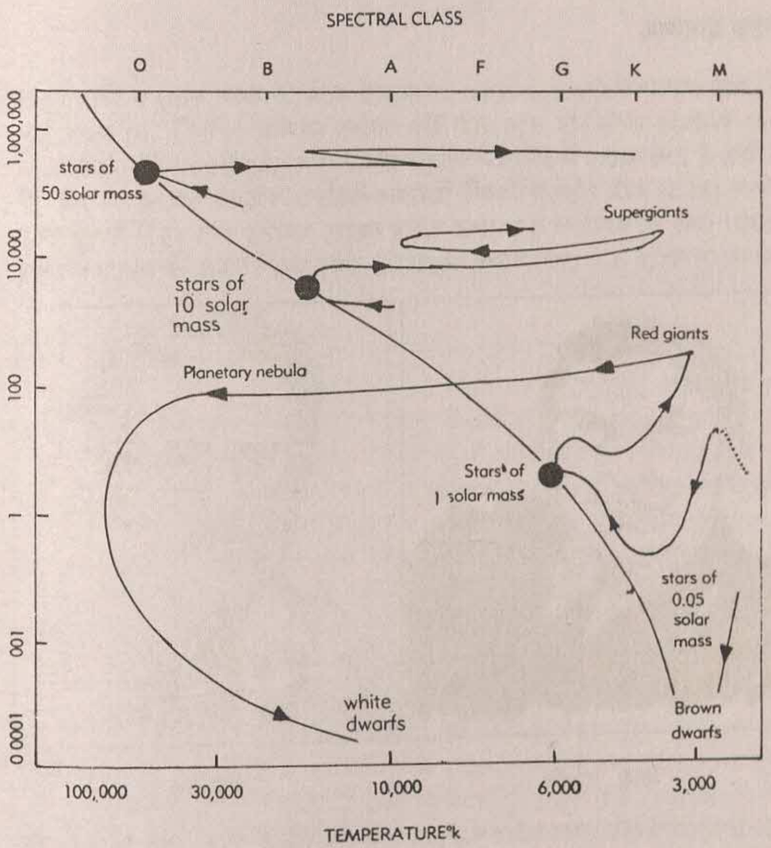
আরো কি গ্রহমণ্ডল আছে?

আমাদের সৌরজগতের মতো আর একটিও গ্রহমণ্ডলের নিশ্চিত সন্ধান আমরা পাইনি, যদিও বেশ কয়েকটির অস্তিত্বের আভাস পাওয়া গেছে। অন্য তারাদের গ্রহ থাকলেও তাদের (বড় টেলিস্কোপ দিয়েও) দেখতে পাওয়া দুরূহ। কারণ গ্রহরা আসলে খুবই অনুজ্জ্বল, তাদের নিজেদের কোন আলো নেই বলে। তবে, গ্যাসের বা ধূলোমেশানো গ্যাসের নীহারিকা থেকে যদি সূর্য ও গ্রহদের সৃষ্টি হয়ে থাকে (এখন বিজ্ঞানীদের যা ধারণা) তাহলে বিশ্বের অগণ্য তারার অধিকাংশেরই গ্রহমণ্ডল না থাকার কোন কারণ নেই। সম্প্রতিকালে অবশ্য উত্তরাকাশে 27 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত Vega বা অভিজিৎ নক্ষত্রের সান্নিধ্যে এবং দক্ষিণ আকাশে প্রায় 50 আলোকবর্ষ দূরের Beta Pictoris নক্ষত্রের চারিদিকে জ্যোতির্বিদরা এমন কিছু কিছু বস্তুপুঞ্জের সন্ধান পেয়েছেন যাকে গ্রহমণ্ডল গঠনের আদি পর্যায় বলে মনে করা যেতে পারে। এ-ছাড়াও, মাত্র ছ' আলোকবর্ষ দূরের লালবামন তারা Barnard's Star-এর ঈষৎ-তরঙ্গিত গতি দেখে অনুমান করা যায় তার এক বা একাধিক (মোট বৃহস্পতির মতো ভরসম্পন্ন) গ্রহ আছে।

বিশ্বতত্ত্বের পটভূমির বিকাশ

সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হয় নিউটনের মহাকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব। আবার এই সময় থেকেই মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য ক্রমশই বেশিবেশি বেড়ের টেলিস্কোপ তৈরি হতে লাগলো। এই দ্রুত-প্রসারিত পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে নিউটনের মহাকর্ষতত্ত্বকে প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের কাছাকাছি অঞ্চলগুলির গঠন সম্পর্কে ক্রমশই স্পষ্টতর ধারণায় পৌছতে লাগলেন। কিন্তু বিশ্বের সামগ্রিক গঠন সম্পর্কে নিউটন কোন স্পষ্ট ধারণায় উপনীত হতে পারেননি। তবে তাঁর মনে হয়েছিল অসীম বিশ্ব-পরিসরে নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জগুলি সমান-সমান দূরত্বে অবস্থিত থেকে একটা স্থায়ী গঠন-সামঞ্জস্য বজায় রাখছে। কিন্তু আঠারো

শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বৃহৎ টেলিস্কোপগুলি দিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন কতকগুলি "নীহারিকা" লক্ষ্য করেন যাদের প্রকৃতি ও অবস্থান সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ দেখা দেয়। ব্রিটিশ



চিত্র 4

H. R Diagram: বিভিন্ন ভরের তারাদের বিবর্তনের লেখ (graph)। সূর্যের মতো মধ্যভরের তারার বিবর্তনের চিত্রটি বিশেষভাবে লক্ষনীয়।

যন্ত্র-নির্মাতা রাইট (J. Wright), বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্ট্ (Immanuel Kant) ও ফরাসী বিজ্ঞানী লাপ্লাস্ (Pierre Laplace) বলেন, ওগুলো সম্ভবত আমাদের এই নক্ষত্রজগতের বাইরে দূরশূন্যে ভাসমান এক-একটি স্বতন্ত্র নক্ষত্রনগরী। কান্ট্ (যিনি কোন টেলিস্কোপের ধারেকাছে কখনো ঘেঁসেননি) নিছক চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে এই রহস্যময়

"নীহারিকা"-গুলিকে এক-একটি island universe নামে অভিহিত করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিশ্ব শুধু আমাদের এই ছায়াপথ নক্ষত্রলোক দিয়েই গঠিত—এই ভ্রান্ত ধারণা 1920 সালের আগে পুরোপুরি দূর হয়নি।

লক্ষ লক্ষ ছায়াপথ

1920 নাগাদ (অধ্যাপক George Hale-এর অক্লান্ত প্রচেষ্টাকে সফল করে) ক্যালিফোর্ণিয়ায় Mount Wilson মানমন্দিরে নতুন 100 ইঞ্চি ব্যাসের মহাকায় দূরবীনটি চালু করার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ঐ 250 বছরের নিউটনীয় বিশ্বচিত্রটি পালটে গেল। Andromeda নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে (M 31 নামে পরিচিত) একটি ডিম্বাকার নীহারিকা সবচেয়ে গুরুতর বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলো। সেটি যে আমাদের ছায়াপথের বাইরে বহুদূরে অবস্থিত আর একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নক্ষত্রজগৎ সে-সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইলো না। ক্রমশ প্রমাণিত হল, ঐ জাতীয় শত শত



চিত্র 5

হার্লো শ্যাপলি



চিত্র 6

জর্জ হেল্

মহাকায় নক্ষত্রলোক ছায়াপথের বাইরে মহাশূন্যে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত এগুলির নাম দাঁড়ালো এক-একটি galaxy। 100 ইঞ্চি টেলিস্কোপ দিয়ে Hubble প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখলেন, টেলিস্কোপের দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত এই গ্যালাক্সিগুলি মহাশূন্যে সমানভাবে ছড়ানো—শেষ হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। এক লাফে দৃশ্য-বিশ্বের পরিধি লক্ষ গুণ বেড়ে গেল। মোটের ওপর, এই সময় থেকেই এ যুগের বিশ্বতত্ত্ব-চিন্তার শুরু।

(প্রসঙ্গত, এই রচনায় "বিশ্ব" ও "মহাবিশ্ব" দুটি কথাই universe অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—যদিও কোনো কোনো লেখক এক-একটি galaxy-কে কোথাও কোথাও এক-একটি "বিশ্ব" বা "ব্রহ্মাণ্ড" বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু "ব্রহ্মাণ্ড" কথাটি একমাত্র "বিশ্ব", "বিশ্বলোক", "মহাবিশ্ব" ইত্যাদিরই সমার্থক হতে পারে। বলা বাহুল্য, "তারা" ও "নক্ষত্র" কথাদুটি সমার্থক।)

দুই

বিশ্বরূপচিন্তা : প্রথম পর্যায়

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের আলোকে প্রথম তিনটি বিশ্বমডেলের আবির্ভাব

আইনস্টাইনের (Albert Einstein) সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব (General Theory of Relativity) প্রকাশিত হয় 1915 থেকে 1916-র মধ্যে। তার আগে 1905 সালে বেরিয়েছিল আইনস্টাইনেরই বিশেষ বা সীমিত আপেক্ষিকবাদ (Special or Restricted Theory of Relativity), আর তারও একটু আগে (1900) থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে ম্যাক্স প্লাঙ্ক (Max Planck)-প্রবর্তিত কোআন্টামতত্ত্ব (Quantum Theory)। এই তত্ত্বগুলি আমাদের আগেকার বস্তুজগৎ-সম্পর্কিত চিন্তায় কতকগুলি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। শূন্য পরিসরে (in empty space) আলোকের গতি সব অবস্থাতেই এক মনে হবে : সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটারের মতো। বস্তু, ভর, সময় সবই আপেক্ষিক। আলোর কাছাকাছি বেগে দৌড়োলে (গতিশক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে) বস্তুর ভর যাবে বেড়ে, লাঠির দৈর্ঘ্য যাবে কমে, ঘড়ির চলন আস্তে হয়ে যাবে, মানুষের বয়স বাড়বে মন্থরতর গতিতে। বস্তু ও শক্তি (matter and energy) মূলত একই জিনিসের দুটি ভিন্ন রূপ এবং বিশেষ অবস্থায় একটির আর একটিতে রূপান্তরণ সম্ভব। আলো তরঙ্গ-প্রকৃতির ঠিকই, কিন্তু তার বিকিরণ ঘটে শক্তির অতিক্ষুদ্র কণাপুঞ্জ হিসাবে : এই কণার নাম দেওয়া হল photon। আর যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য (wave-length) যত কম অর্থাৎ কম্পাঙ্ক (frequency) যত বেশি, তার photon-এর শক্তি তত বেশি। আইনস্টাইন দেখালেন, অতিক্ষুদ্র বস্তুকণা electron ও শক্তিকণা photon-এর মধ্যে সংঘর্ষ দুটো বিলিয়ার্ড-বল বা দুটো মার্বেলের মধ্যেকার সংঘর্ষের মতো। 1913 নাগাদ রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford) ও বোর-এর (Niels Bohr-এর) গবেষণা ও চিন্তাসূত্র থেকে জানা গেল যে, কোনো মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রকটিতে একটি পজিটিভ ইলেকট্রিক চার্জের পুঞ্জ থাকে এবং তার চারদিকে কতকগুলি (হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে একটি) নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেকট্রন বিশেষ বিশেষ কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। আর কোনো ইলেকট্রন এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে সরে গেলেই ঐ পরমাণু এক কোআন্টাম্ শক্তি আহরণ বা বিকিরণ করে।

Special Relativity ও Quantum Theory-র আলোকে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু বিশ্বের (এমন কি সৌরজগতের) সামগ্রিক গঠন বা আকার তো তড়িৎ-চুম্বকীয় (eletromagnetic) শক্তির ওপর নির্ভর করে

না। তা নির্ভর করে মূলত মহাকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যাকে নিউটন বলেছিলেন universal gravitation, তার ওপর। বিশ্বে মোটের ওপর যতগুলো পজিটিভ চার্জ ততগুলোই নেগেটিভ চার্জ আছে। সুতরাং শেষ বিচারে বিশ্ববস্তু চার্জ নিরপেক্ষ : আকর্ষণও নেই, বিকর্ষণও নেই।



চিত্র 7

গ্যালিলিও

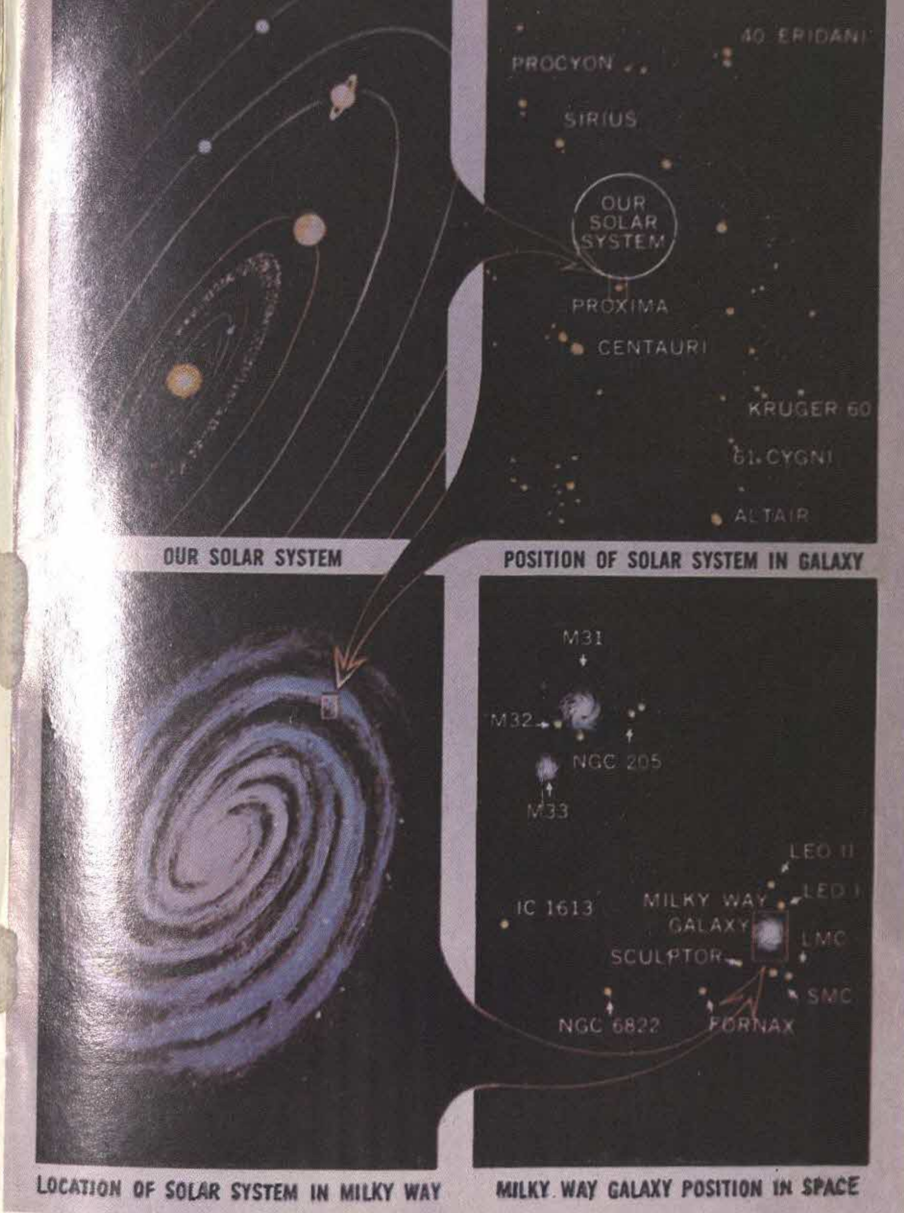


চিত্র 8

আইজাক নিউটন

কিন্তু বিশ্বের যে-কোনো দুটো বস্তুকণার মধ্যে অভিকর্ষের টান রয়েছে—তাদের চার্জ নেগেটিভ, পজিটিভ, নিউট্রাল যাই হোক না কেন। বিভিন্ন বস্তুকণা বা বস্তুপিণ্ডের ভর যত বেশি এবং তাদের মাঝের দূরত্ব যত কম, তাদের মধ্যে অভিকর্ষের টান হবে তত বেশি। (অভিকর্ষ— gravity —হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণজনিত আকর্ষণ বা তার ক্রিয়া, পরিমাণ ইত্যাদি। শব্দদুটি বহুক্ষেত্রেই প্রায় সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।)

এই যে বিশ্বশক্তি—মাধ্যাকর্ষণ—এর এক বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা পরিবেশন করলেন আইনস্টাইন তাঁর 1915-16 সালে প্রকাশিত সাধারণ বা পরিবর্ধিত আপেক্ষিকতাবাদের (General or Extended Theory of Relativity-র) মাধ্যমে। ঐ তত্ত্বসূচক সমীকরণগুলির ভিতর দিয়ে তিনি দেখালেন যে মাধ্যাকর্ষণকে নিছক পারস্পরিক আকর্ষণশক্তি হিসাবে দেখলে বিশ্বের পুরোপুরি সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে না। আর নিউটনের যে ধারণা—অভিকর্ষ হচ্ছে দুটি বিচ্ছিন্ন বস্তুপিণ্ডের মধ্যেকার তাৎক্ষণিক আকর্ষণ (action at a distance)—তাও ঠিক নয়। বিশ্বলোক হচ্ছে স্থানকালের একটি চতুর্মাত্রিক ব্যাপ্তি—4-dimensional space-time continuum—(যার মধ্যে জড়িত আছে স্থানের তিনটি আর সময়ের একটি মাত্রা)। বস্তুর (এবং শক্তিরও) উপস্থিতি এই চতুর্মাত্রিক ক্ষেত্রে বিকৃতির সৃষ্টি করে। অর্থাৎ যেখানে বস্তুপিণ্ড আছে তার চারদিকের পরিসরের ("আকাশের") আকৃতি, অর্থাৎ জ্যামিতিক গঠনই বদলে যায়। তারই ফলে, এই "বাঁকা", "ঘোরানো" বা "তোবড়ানো" শূন্যক্ষেত্র বেয়ে গ্রহরা তারাদের চারিদিকে, যুগ্ম বা বহু-সমন্বিত তারারা (double or multiple stars) পরস্পরের চারিদিকে, এবং গ্যালাক্সির কোটি কোটি তারা গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারিদিকে উপবৃত্তাকার (elliptical)



প্লেট 2

মহাবিশ্ব-পরিসরের একটি অণুকণা: সৌরজগৎ, সৌরলোকের আশপাশের তারাগুলি, আমাদের কুণ্ডলিত ছায়াপথ-গ্যালাক্সির প্রান্তদেশে সূর্যের অবস্থান, এবং ছায়াপথ-গ্যালাক্সি-সমন্বিত "স্থানীয়" গ্যালাক্সি পুঞ্জ (Local Galaxy Cluster)—এই চারটি ক্রম-বৃহৎ এককের আপেক্ষিক চিত্র। (Finley's Holiday Films-এর সৌজন্যে)

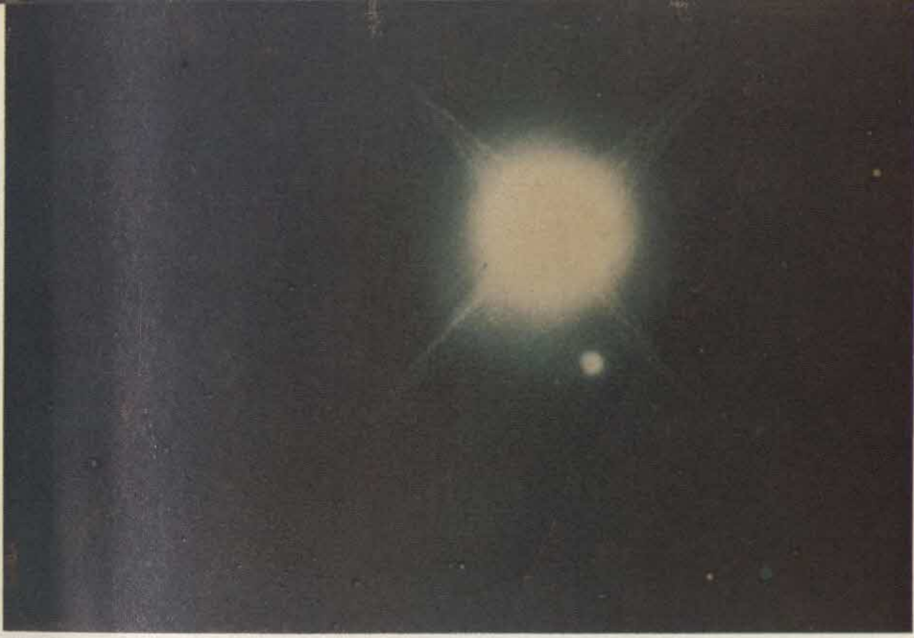


প্লেট 3



প্লেট 4

উপরে : উত্তর আকাশের সুন্দরতম নক্ষত্রগুচ্ছ কৃত্তিকা বা Pleiades
নিচে : Carina মণ্ডলের নক্ষত্রগুচ্ছ NGC 3293



প্লেট 5



প্লেট 6

উপরে : লুব্ধক (Sirius) ও তার প্রচণ্ড ঘনত্বসম্পন্ন সাদা বামন (white dwarf) সঙ্গী

নিচে : কালপুরুষ নীহারিকার প্রচণ্ড-দ্যুতিময় নক্ষত্র-চতুষ্টয়— Theta Orionis বা the Trapezium



প্লেট 7



প্লেট 8

উপরে : মধ্য আকাশের অপূর্বদর্শন গ্রহবৎ নীহারিকা Dumb-bell Nebula
নিচে : প্রাচীন সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষ—Crab Nebula



প্লেট 9

মহাকায় উজ্জ্বল নীহারিকা North America Nebula



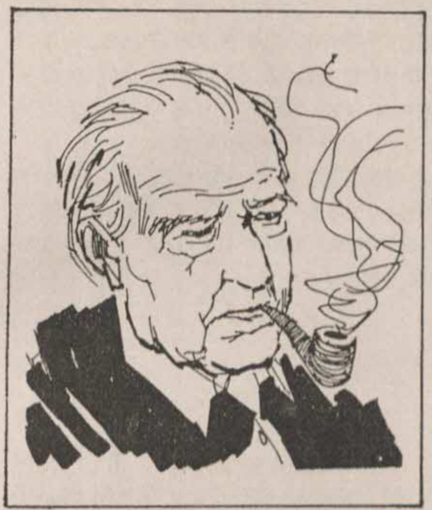
প্লেট 10



প্লেট 11

উপরে : যুক্তরাষ্ট্রের Kitt Peak Observatory
নিচে : Centaurus মণ্ডলের ভিতর দিয়ে দৃশ্যমান অদ্ভুতদর্শন "বিস্ফোরণশীল" গ্যালাক্সি NGC 5128 বা Centaurus A

পথে ঘুরতে থাকে। কয়েকটি সূক্ষ্ম পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে সাধারণ অবস্থায় নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব প্রযোজ্য হলেও তার পরিমাপগুলিতে কিছুটা ভুল থেকে যায়। কিন্তু (যতদূর বিচার করা গেছে) আইনস্টাইনের নতুন মহাকর্ষতত্ত্ব সমস্ত ক্ষেত্রেই নির্ভুল ফল দেয়।



চিত্র 9

নীল্‌স বোর



চিত্র 10

আর্নেস্ট্ রাদারফোর্ড

তা যদি হয়, অর্থাৎ বস্তুর (এবং সামান্য পরিমাণে শক্তিরও) উপস্থিতি যদি space-time ক্ষেত্রের মধ্যে বাঁকের সৃষ্টি করে, অর্থাৎ সোজা শূন্যলোককে বেঁকিয়ে দেয়, (তার euclidean জ্যামিতিক গঠনকে non-euclidean করে তোলে), তাহলে বিশ্বপরিসরের সামগ্রিক আকার কিসের ওপর নির্ভর করবে? সমস্ত বিশ্বপরিসরে কতটা বস্তু কতটা জায়গার মধ্যে রয়েছে তার ওপর। সমস্ত আধুনিক বিশ্বতত্ত্বঘটিত চিন্তা আইনস্টাইনের এই মূল ধারণাটিকে ভিত্তি করে এগিয়ে গেছে। এই ধারণা অনুযায়ী মাধ্যাকর্ষণ (gravitation) হচ্ছে space, time ও matter-energy-র আন্তঃক্রিয়ায় সৃষ্ট বিশ্বক্ষেত্রের একটি গুণ বা ধর্ম।

নিউটন, আইনস্টাইন ও ডি-সিটার

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মহাবিশ্বের সংগঠনকে বোঝার এই যে চেষ্টার শুরু হলো, একে কিন্তু নিউটনের 250 বছর আগেকার বিশ্বতত্ত্বচিন্তার উত্তরাধিকারী হিসাবেই দেখা প্রয়োজন।

নিউটনের বিশ্বতাত্ত্বিক চিন্তা ছিল দ্বন্দ্ব-কন্টকিত। বিখ্যাত গ্রীক-ল্যাটিনবিদ রিচার্ড বেন্টলিকে (R. Bentley-কে) 1692 ও 1693-সালে লেখা দুটি চিঠিতে তাঁর চিন্তার এই সংশয়িত

চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে তাঁর মনে হয়, কোনো সীমিত পরিসরের মধ্যে যদি বিশ্বের সমস্ত বস্তু সমানভাবে ছড়ানো থাকে তাহলে সেই ব্যবস্থা (system) স্থায়ী হতে পারে না। কারণ আত্ম-অভিকর্ষের (self-gravity-র) বলে ঐ system-এর প্রান্তদেশের বস্তুপিণ্ডগুলি ক্রমশই কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়ে শেষে কেন্দ্রস্থলে একটিমাত্র বিরাট বস্তুপুঞ্জ সৃষ্টি করবে। কিন্তু বস্তুপিণ্ডগুলি যদি কোন অসীম পরিসরে সমভাবে পরিব্যাপ্ত থাকে তাহলে ঐ system স্থায়ী হতে পারে। কারণ অসীম বিশ্বের একটি মাত্র অভিকেন্দ্র (centre of gravity) থাকতে পারে না। সেখানে অভিকেন্দ্র থাকলে সেগুলির সংখ্যাও হবে অসীম। সেখানে বস্তুগুলি সবদিক থেকে সমানভাবে আকৃষ্ট হবে এবং সে কারণে একই জায়গায় থাকবে।

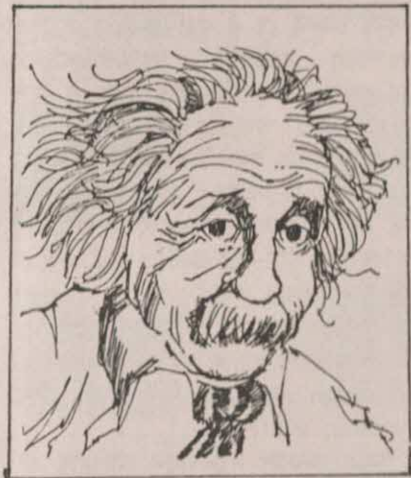
কিন্তু দ্বিতীয় চিঠিতে তিনি ঐ রকম বিশ্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন যে অসীম পরিসরেও বস্তুগুলির পক্ষে নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব; এবং ভারসাম্যের একটু এদিক-ওদিক হলেই বস্তুপিণ্ডগুলি ডেলা বাঁধতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের অভিকেন্দ্রিক পতন ঘটবে। সুতরাং সমস্যাটা রয়েই গেল।

আইনস্টাইনের সুস্থিত সসীম বিশ্ব

1915-16 সালে আইনস্টাইন তাঁর General Relativity Theory (GRT) প্রকাশ করার বছরখানেকের মধ্যেই ঐ তত্ত্বকে প্রয়োগ করে মহাবিশ্বের আকৃতি ও গঠনের পর-পর দুটি model বিশ্বের বিজ্ঞানীদের সামনে তুলে ধরেন.। প্রথমে তিনি বিশ্বক্ষেত্র সম্বন্ধে তাঁর 1915-র সমীকরণগুলির ((field-equation-সমূহের) সাহায্যে এমন একটি সসীম বিশ্বচিত্র রচনা করেন যার মধ্যে বস্তুপুঞ্জগুলির (i) পারস্পরিক অভিকর্ষ এবং (ii) পারস্পরিক দূরত্ব—এই দুটি factor-এর আন্তঃক্রিয়ায় বিশ্বের গঠন হবে স্থায়ীভাবে গোলাকৃতি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নিজের ঐ মডেলকে তাঁর ভ্রান্ত মনে হলো। অনেকটা নিউটনের বিশ্বের মতোই তাঁর ঐ বিশ্বে অভিকর্ষশক্তির একটা আপেক্ষিক প্রাবল্য থেকে যাবে, যার ফলে বিশ্ব ঐ সাময়িক স্থায়ী অবস্থা থেকে ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকবে। এই অসামঞ্জস্য আইনস্টাইনের পছন্দ হলো না। তাছাড়া জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও এই ধরনের কোন সংকোচনের নিশানা পাওয়া যায়নি।

আইনস্টাইনের সামঞ্জস্য-সন্ধানী ঃ . তাঁর বিশ্ব-মডেলের এই সংকোচন-প্রবণতায় সন্তুষ্ট হতে পারলো না। বিশ্বের অস্থায়িত্বের, অর্থাৎ তার সংকোচনের কারণ হচ্ছে মহাকর্ষশক্তির প্রাবল্য। এই আকর্ষণশক্তির আধিক্যকে খারিজ করে বিশ্ব-মডেলকে একটা স্থিতিশীল অবস্থায় আনার জন্য আইনস্টাইন কল্পনা করলেন একটি বিশ্ব-বিকর্ষণশক্তির (cosmical repulsion force)। নিউটন-বর্ণিত আকর্ষণশক্তির বল বস্তুগুলি যত কাছে আসে, ততো বেড়ে যায়। এই শক্তির ধ্রুবক (constant) হচ্ছে G। আইনস্টাইনের নবকল্পিত বিশ্ব-বিকর্ষণশক্তির ক্রিয়া ঠিক উল্টো। অর্থাৎ দুটো বস্তুপিণ্ড পরস্পরের থেকে যত বেশি দূরে থাকবে, তাদের মধ্যেকার বিকর্ষণশক্তিও হবে ততই বেশি। এই শক্তির ধ্রুবকের সূচক হলো গ্রীক অক্ষর λ ল্যামডা (lambda)। আইনস্টাইন তাঁর 1915-র সমীকরণগুলিকে পরিবর্তিত করে সেগুলির মধ্যে এই নতুন lambda factor-টিকে অভিযোজিত করে নিয়ে মহাবিশ্বের একটি দ্বিতীয় মডেল বিজ্ঞান-জগতের সামনে হাজির করলেন। এই বিশ্বে G আকর্ষণশক্তি এবং lambda বিকর্ষণশক্তির বিপরীত ক্রিয়ার ফলে বিশ্বের সামগ্রিক গঠন হবে স্থির, অচঞ্চল (stable)। কিন্তু

এই বিশ্ব অসীম হবে না, হবে সসীম কিন্তু অবাধ (finite but unbounded)। অর্থাৎ বস্তুর উপস্থিতি বিশ্বের (চতুর্মাত্রিক) স্থান-কাল ক্ষেত্রকে এমনভাবে বাঁকিয়ে দেবে যে ঐ বিশ্বপরিসর বেঁকে গোল হয়ে যাবে—কিছুটা পৃথিবীপৃষ্ঠের মতো। পৃথিবীপৃষ্ঠ সসীম, কিন্তু অবাধ। অর্থাৎ তার ওপর দিয়ে সোজা হাঁটতে শুরু করলে কোথাও পথ শেষ হয়ে যাবে না; যাত্রা যেখান থেকে শুরু, ঘুরে ঘুরে আবার সেখানেই ফিরে আসতে হবে। তেমনি আইনস্টাইনের দ্বিতীয়



চিত্র 11

আলবার্ট আইনস্টাইন



চিত্র 12

ভিলেম ডি সিটার

মডেলের বিশ্বে কোন আলোকরশ্মি কোন এক বিন্দু থেকে নির্গত হয়ে সমস্ত বিশ্বের গোলাকার ক্ষেত্র ঘুরে আবার সেই বিন্দুতে ফিরে আসবে। তফাৎ এই যে পৃথিবীপৃষ্ঠ দ্বিমাত্রিক (two-dimensional), আর বিশ্বের ক্ষেত্র ত্রিমাত্রিক (সময়-মাত্রা ধরলে চতুর্মাত্রিক)—যার ফলে এই বিশ্বছবিটি কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু গণিতের সমীকরণগুলির মাধ্যমে এই বিশ্ব-মডেলটি বিজ্ঞানীদের কাছে সম্পূর্ণভাবে বোধগম্য।

ডি-সিটার : একই তত্ত্ব কিন্তু ভিন্ন ফল

আইনস্টাইনের এই দুটি মডেল প্রবর্তনের প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই বিশ্বতত্ত্বচিন্তার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন হল্যান্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডি-সিটার (Willem de Sitter)। আইনস্টাইনের দ্বিতীয় পর্যায়ের (lambda factor-সমন্বিত) সমীকরণগুলির ভিত্তিতেই তিনি অন্য এক ধরনের একটি বিশ্ব-মডেল বিজ্ঞানীদের সামনে তুলে ধরলেন। প্রথমদিকে তাঁর এই মডেলটিকেও একটি স্থিতিশীল (stable) মডেল বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু খুব শীঘ্রই ধরা পড়লো যে তাঁর চিত্রের এই বিশ্বের গঠন অস্থিত (unstable) এবং প্রসারণশীল (expanding)। কারণ তাঁর

মডেলে এই ইঙ্গিত ছিল যে মহাকাশের দূরের বস্তুগুলি থেকে আসা আলোতে লোহিতায়ন বা red-shift দেখা যাবে। অর্থাৎ ঐ আলোকে তার প্রত্যাশিত রঙের চেয়ে একটু বেশি লালচে মনে হবে, এবং যে জ্যোতিষ্ক যত দূরে তার আলো ততো লালচে মনে হবে। এই চিন্তার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আমরা এই আলোচনা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবো।

একই সমীকরণগুচ্ছের ভিত্তিতে রচিত আইনস্টাইনের আর ডি-সিটারের এই দুটি বিশ্বছবির মধ্যে পার্থক্যের কারণ কী? এর মূলে ছিল বিশ্বপরিসরে বস্তুর গড় ঘনত্ব সম্পর্কে দুজনের ভিন্ন ধারণা। আইনস্টাইনের ধারণায়, বিশ্বে বস্তুর ঘনত্ব এমনই যে ঐ বস্তুপিণ্ডগুলির সামগ্রিক অভিকর্ষশক্তি (G-factor) তাদের পারস্পরিক দূরত্বজনিত মহাবিকর্ষণশক্তিকে (lambda factor-কে) নাকচ করে দেওয়ার পক্ষে ঠিক যথেষ্ট—যার ফলে ঐ বিশ্বে সামগ্রিকভাবে সংকোচনের বা প্রসারণের কোন গতিই নেই। পক্ষান্তরে ডি-সিটারের ধারণায়, বিশ্বে বস্তুর ঘনত্ব আইনস্টাইন যা ধরেছেন তার চেয়ে অনেক কম—এত কম যে মহাশূন্যের বিপুলতার তুলনায় তাকে নগণ্যই বলা যায়। সুতরাং ডি-সিটারের এই বস্তুবিরল বিশ্বে আকর্ষণশক্তির চেয়ে বিকর্ষণশক্তি বেশি প্রবল এবং তার ফলে বিশ্বের বস্তুগুলি ক্রমশই পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বলোক ধীরে-ধীরে প্রসারিত হচ্ছে, এবং সে কারণেই দূরগামী বস্তুগুলির আলোকে লালচে মনে হওয়ার কথা।

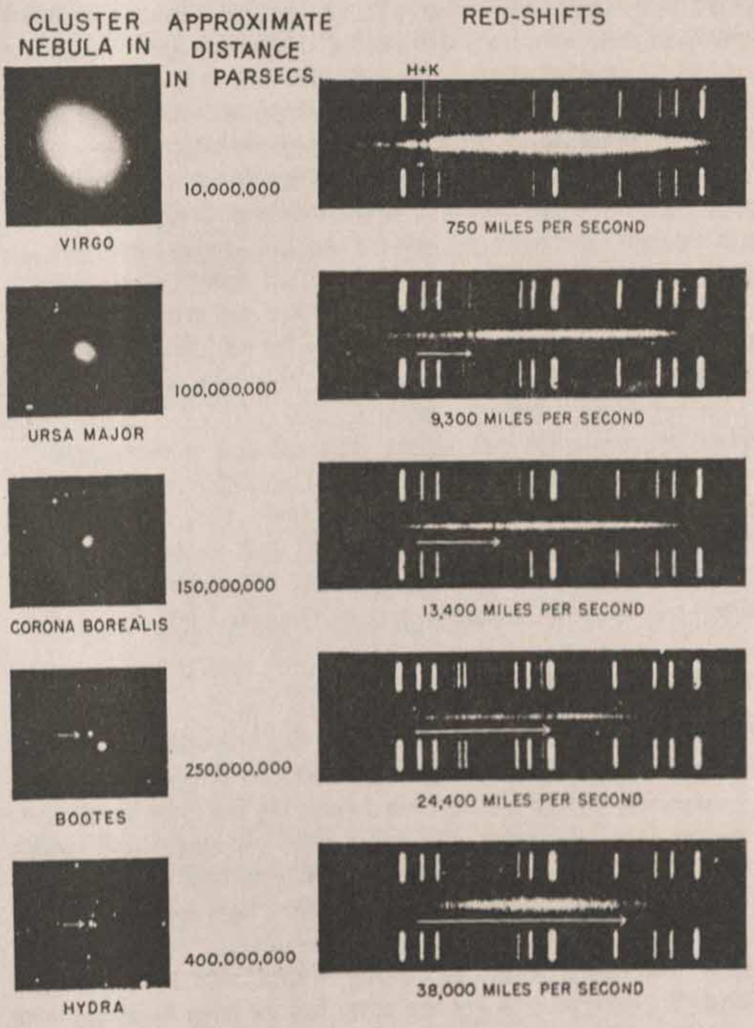
তাহলে দেখা যাচ্ছে, আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের দ্বিতীয় সমীকরণগুচ্ছের ভিত্তিতে দুটি ভিন্ন বিশ্বচিত্র রচিত হলো—চলতি ভাষায় যাদের বলা হয়েছে (i) আইনস্টাইনের স্থির বিশ্ব, যাতে আছে "matter without motion", আর (ii) ডি-সিটারের অস্থির, প্রসারণশীল বিশ্ব, যাতে আছে "motion without matter"।

আমরা দেখতে পাবো, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চমকপ্রদ নতুন-নতুন আবিষ্কার এবং বিশ্বতত্ত্বের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারার উদ্ভবের ফলে উল্লিখিত দুটি বিশ্ব-মডেলই কালক্রমে পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু ডি-সিটারের চিন্তাধারা পরবর্তীকালে বিশ্বচিন্তাকে প্রভাবিত করে।

হাব্‌ল-এর আবিষ্কার : পলাতক গ্যালাক্সির বিশ্বমেলা

আগেই বলা হয়েছে 1920 সালে ক্যালিফোর্নিয়ার Mount Wilson মানমন্দিরে নতুন 100 ইঞ্চি ব্যাসের দর্পণযুক্ত টেলিস্কোপটি দিয়ে পর্যবেক্ষণ শুরু হয়। তার ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের Milky Way নক্ষত্র-মহানগরীর চারিদিকে মহাশূন্যে ভাসমান ঐরকম আরো অনেক গ্যালাক্সি আবিষ্কৃত হয়, এবং মানুষ প্রথম বুঝতে পারে যে বিশ্বের মহাপরিসরে নক্ষত্রগুলি সমান-সমান দূরত্বে নেই, আছে অসংখ্য বিপুল পুঞ্জে, অর্থাৎ galaxy-তে, সমাবিষ্ট হয়ে।

এই নতুন আকাশ পর্যবেক্ষণের নায়ক ছিলেন মাউন্ট উইলসন-এর Edwin Hubble ও তাঁর ঐতিহাসিক সহকারী Milton Humason, যিনি একজন মালবাহী খচ্চর-চালকের অবস্থান থেকে তাঁর অভাবনীয় মনীষাবলে একজন প্রথম শ্রেণীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন। 1929 সালে Hubble তাঁর পর্যবেক্ষণভিত্তিক গবেষণার এক চমকপ্রদ বিবরণ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, (i) বহুদূরের গ্যালাক্সিগুলি থেকে আসা ঐ আলোকে তার প্রত্যাশিত রঙের চেয়ে কিছুটা লালচে দেখাচ্ছে এবং (ii) মনে হচ্ছে, যে-গ্যালাক্সি যতদূরে তার আলো তত বেশি লালচে।



চিত্র 13

দ্রুত-প্রসারমান বিশ্ব পরিসরের ছবি ফুটে উঠেছে অপসৃয়মান গ্যালাক্সিদের এই বর্ণালিচিত্রগুলিতে। যে গ্যালাক্সি যত দূরে তার (H এবং K রেখা দুটির অপসরণের পরিমাণ দ্বারা চিহ্নিত) red-shift বা লোহিতাপসারণ তত বেশি, এবং সৌরজগৎ থেকে সেটি তত দ্রুত বেগে সরে যাচ্ছে। সব চেয়ে নিচের গ্যালাক্সিটির red-shift সব চেয়ে বেশি এবং ওটির অপসরণবেগও সর্বাধিক।

ব্যাপারটি আসলে আরো সূক্ষ্ম। আমরা জানি, সূর্য থেকে যে দৃশ্য আলো আসে তার বর্ণালিতে থাকে মোটের ওপর সাতটি রং। একপ্রান্তে আছে সবচেয়ে বেশি শক্তিমান আর সবচেয়ে ছোট তরঙ্গের বেগুনি আলো (বেগুনি, ঘননীল আর নীল, এই তিনটিকে অনেক সময় স্থূলভাবে নীল রং বলে ধরা হয়) আর অন্যপ্রান্তে আছে সবচেয়ে কম শক্তিমান আর সবচেয়ে বড় ঢেউয়ের লাল আলো। সুতরাং আলো সমগ্রভাবে লালচে বা red-shifted হয়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে তার কম্পাঙ্ক (frequency) অর্থাৎ তার শক্তি কমে যাওয়া, আর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়া। শুধু তাই নয়, বর্ণালির মাঝে-মাঝে বিশেষ বিশেষ জায়গায় খাড়াভাবে কতকগুলি উজ্জ্বল ও কতকগুলি কালো-কালো রেখা দেখা যায় (bright emission lines and dark absorption lines)। আলো যদি তার প্রত্যাশিত রং থেকে লালচে হয়ে যায় তাহলে ঐ রেখাগুলিও তাদের প্রত্যাশিত জায়গা থেকে লাল-প্রান্তের দিকে একটু বা অনেকটা সরে যাবে।

Hubble দেখালেন যে দূরের গ্যালাক্সিগুলির আলোতে ঠিক এই জিনিস দেখা যাচ্ছে, এবং ব্যাপারটি ঘটার কারণ গ্যালাক্সিগুলি আমাদের Milky Way থেকে ক্রমাগতই দূরে সরে যাচ্ছে। (এ সম্পর্কে আরো কথা পরে আসবে।)

(প্রসঙ্গত, দ্রুত-অপসরণশীল বস্তুর আলোতে যেমন red-shift বা আপাত-লোহিতায়ন ধরা পড়ে, দ্রুত-আগমনশীল উৎসের আলোতে তেমনি blue-shift বা আপাত-নীলায়ন লক্ষিত হয়। যেমন, আমাদের "local cluster"-এর সদস্য Andromeda Galaxy-র আলোয় কিছু blue-shift দেখা যায়। এ বিষয়ে মূলসূত্রটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আবিষ্কার করেন অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ডপ্‌লার (C. Doppler)। তাই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বা কম্পাঙ্কের এই আপাত-পরিবর্তন মূলত Doppler effect বা Doppler shift নামেই পরিচিত।

ফ্রিডমানের বৈপ্লবিক বিশ্বচিত্র

গ্যালাক্সিগুলো দূরে সরে যাচ্ছে, অর্থাৎ বিশ্বপরিসর ক্রমশই স্ফীত হচ্ছে—হাব্‌ল-এর এই বক্তব্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় 1929-30 সালে, যদিও 1923 থেকেই Mt Wilson মানমন্দির থেকে দূরের গ্যালাক্সিগুলোর আলোতে red shift লক্ষিত হওয়ার কিছু কিছু বিবরণ আসতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তার অনেক আগে, 1922 সালে, রুশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রিডমান (Aleksandr A. Friedmann) তাঁর নতুন বিশ্বতাত্ত্বিক চিন্তায় হাব্‌ল-এর ঐ আবিষ্কারের এক চমকপ্রদ পূর্বাভাস দেন—যদিও তাঁর এই মত বিজ্ঞানীদের মহলে প্রকাশিত ও বিবেচিত হয় অনেক পরে।

ফ্রিডমান এমন একটি বিশ্বের চিত্র উপস্থিত করলেন যাতে গ্যালাক্সিগুলি (বা গ্যালাক্সিপুঞ্জগুলি) পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু এর ব্যাখ্যা ডি-সিটারের ব্যাখ্যা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মনে রাখা দরকার, ডি-সিটারের বিশ্ব-মডেল আইনস্টাইনের দ্বিতীয় পর্যায়ের (1917-র) সমীকরণগুলির ভিত্তিতে রচিত। সে বিশ্বে বস্তুর গড় ঘনত্ব অত্যন্ত কম (প্রায় শূন্য)—যার ফলে সেখানে আকর্ষণশক্তির (G-factor)-এর চেয়ে বিকর্ষণশক্তির (lambda factor-এর) প্রাবল্য বেশি, এবং ফলত সমস্ত বিশ্বলোক নিরন্তর স্ফীত হয়ে উঠছে। ফ্রিডমান কিন্তু চিন্তা করলেন অন্যভাবে। তিনি আইনস্টাইন-কল্পিত বিশ্ববিকর্ষণশক্তিকে একেবারে বাদ দিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর মডেল রচনা করলেন আইনস্টাইনের (সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের) প্রথমবারের, অর্থাৎ 1915-র সমীকরণগুলির ভিত্তিতে। এখন কথা হচ্ছে, তা যদি হয় তাহলে

সংকোচনের বা স্থিতির বদলে তিনি প্রসারণের কল্পনা করলেন কী ভাবে?

ফ্রিডমান বললেন: গ্যালাক্সিগুলি যে পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তার কারণ বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছিল এক প্রচণ্ড কেন্দ্রীয় বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে। জন্মমুহূর্তের সেই বিস্ফোরণজনিত গতি আজও লক্ষিত হয় গ্যালাক্সিগুলির উৎকেন্দ্রিক গতিবেগের মধ্যে। বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে যে বিখ্যাত তত্ত্ব—Big Bang Theory—আজ বিশ্বতাত্ত্বিকদের চিন্তার কেন্দ্রস্থল অধিকার করে আছে, তার প্রথম আবির্ভাব ফ্রিডমানের 1922-এর এই চমকপ্রদ মৌলিক চিন্তায়। ফ্রিডমানের এই তত্ত্বের ব্যাপকতর তাৎপর্যের কথা আমরা একটু পরে আলোচনা করবো।

আইনস্টাইন ও ডি-সিটারের অবদান

এ-যুগের সমস্ত বিশ্বতত্ত্বচিন্তার মূলে আছে আইনস্টাইনের নতুন অভিকর্ষতত্ত্ব অর্থাৎ সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। প্রায় সমস্ত বিশ্বতত্ত্বচিন্তাই এর সূত্রগুলির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। সে হিসাবে বিশ্বতত্ত্বের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের অবদান অতুলনীয় এবং অনন্য। কিন্তু কার্যত, বিশ্বচিত্র রচনার ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের চিন্তা খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। তাঁর "সসীম কিন্তু অবাধ" (finite but unbounded) স্থিতিশীল বিশ্বের চিত্র বহুদিন আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর ধারণা, সার্থক বিশ্বচিত্র রচনার ক্ষেত্রে ডি-সিটার এবং ফ্রিডমানের প্রতিভা অসাধারণ স্বাক্ষর রেখে গেছে। ডি-সিটারের বিশ্বচিত্রটিও আজ পরিত্যক্ত। কিন্তু একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে প্রসারণশীল বিশ্বের কল্পনা তিনিই প্রথম করেন। আইনস্টাইন-কল্পিত মহাবিকর্ষণশক্তির প্রাবল্যের দরুন বিশ্বলোক প্রসারিত হচ্ছে, এ ধারণা প্রায় কোন বিজ্ঞানীই আজ ঠিক মনে করেন না। কিন্তু বহু মনীষীর মতে, বিশ্বের স্ফীতিশীল প্রকৃতি সম্বন্ধে ডি-সিটারের এই প্রথম ধারণা প্রতিভাধর মনের এক গভীর বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির (scientific intuition-এর) পরিচয় বহন করে। আরো মনে রাখা দরকার, 100 ইঞ্চি টেলিস্কোপের চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারগুলি শুরু হওয়ার তিন-চার বছর আগেই ডি-সিটারের ঐ বিশ্ব-মডেল প্রকাশিত হয়। তার চেয়েও বড় কথা, ফ্রিডমান নিজেই পরবর্তীকালে বলেন যে ডি-সিটারের চিন্তাধারা তাঁকে তাঁর নিজের চিন্তার পথে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

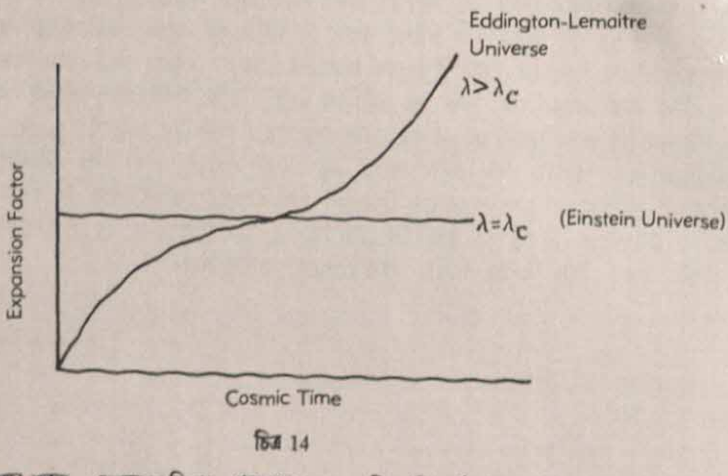


তিন

বিশ্বরূপচিন্তার দ্বিতীয় পর্ব : বিস্ফোরণস্ফীত বিশ্বচিত্রের প্রাধান্য

লেমেতার-এর আদিম অগ্নিগোলক

1922 সালে *Zeitschrift fur Physic* নামক অপেক্ষাকৃত অখ্যাত জার্মান পত্রিকায় প্রকাশিত ফ্রিডমানের নতুন এই তত্ত্বচিন্তাটি অধিকাংশ বিশ্বতাত্ত্বিকের নজর এড়িয়ে যায়। তাই পাঁচ বছর পরে বেলজিয়ান বিজ্ঞানী লেমেতার (Georges Lemaitre) ফ্রিডমানের তত্ত্বের কথা আদৌ না জেনে অনেকটা ঐরকমই একটি বিশ্ব-মডেল 1927 সালে ব্রুসেলস্-এর



চিত্র 14

লক্ষ্য করুন, লেমেতার-বিশ্বের প্রসারণের curveটি অভিকর্ষের টানে মাঝপথে থেমে যেতে যেতে কোনরকমে সামলে নিয়ে আবার প্রসারণের পথে ধাবমান। এখানে বিকর্ষণ শক্তি (λ) বেশি প্রবল। আইনস্টাইনের বিশ্বে λ তার বিপরীতশক্তির ঠিক সমপর্যায়ের।

Annales de la société Scientifique পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই তত্ত্ব রচনায় লেমেতার-এর ভূমিকাই প্রধান ছিল, এবং প্রখ্যাত ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডিংটন (Arthur

Eddington) এই তত্ত্বকে সমর্থন করেন বলে এটি Eddington–Lemaitre তত্ত্ব নামেও পরিচিত। এতে বলা হল, বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছিল একটি বিপুলকায় আদিম পরমাণুর (the primeval atom-এর) বিস্ফোরণের ফলে। এই বিস্ফোরণে সৃষ্ট আদিম অগ্নিগোলক (primeval fireball) প্রচণ্ডবেগে স্ফীত হতে থাকে। এই তত্ত্ব প্রকাশের কয়েক বছর আগে থেকেই অবশ্য মাউন্ট উইলসন থেকে গ্যালাক্সিদের আলোর red-shift সম্বন্ধে হাব্‌ল ও তাঁর সহকারীদের উত্তরোত্তর চমকপ্রদ বিবরণ আসতে শুরু করে।

এই পর্যন্ত ফ্রিডমানের তত্ত্বের সঙ্গে অনেকটাই মিল। কিন্তু বিশ্বের পরবর্তী পর্যায়ের বিবর্তনের ব্যাপারে এঁদের ধারণাটি একটু অন্যরকম। ফ্রিডমানের মতো আইনস্টাইন-কল্পিত বিশ্ববিকর্ষণশক্তিকে (lambda force)-কে একেবারে বাদ দিয়ে চিন্তা করার মতো মৌলিকতা লেমেতার বা এডিংটন দেখাতে পারেননি। তাঁদের ধারণায় ব্যাপারটা দাঁড়ালো এইরকম: আদি বিস্ফোরণের ফলে বিশ্বের উপাদানগুলি (বস্তুপুঞ্জ ও শক্তিপুঞ্জ, বা 'কণা'-সমূহ) প্রচণ্ড বেগে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলির পারস্পরিক অভিকর্ষশক্তির দরুন এই ছড়িয়ে যাওয়ার হার ক্রমশই কমে গিয়ে বিশ্ব একটা স্থিরতার কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছায়। এই প্রায়-স্থির পর্বটির মেয়াদ অবশ্য বহু কোটি বছর। এই পর্বেই অভিকর্ষশক্তির আপেক্ষিক প্রাবল্যের দরুন নীহারিকা, নক্ষত্র ও গ্যালাক্সিগুলির সৃষ্টি হয়—যে ছবি আমরা এখন আমাদের চারিদিকের আকাশে দেখতে পাচ্ছি।



চিত্র 15

এডউইন হাব্‌ল



চিত্র 16

জর্জ লেমেতার

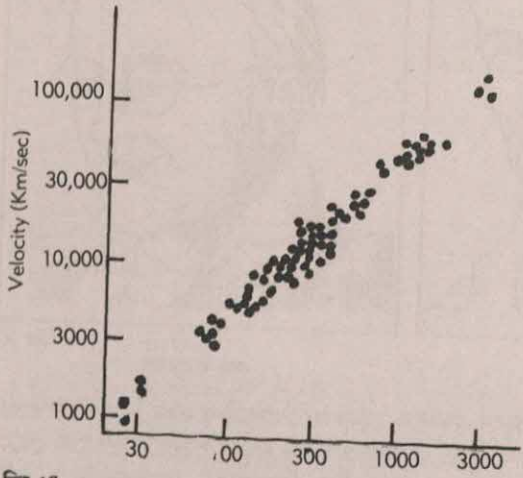
কিন্তু এই অবস্থা স্থায়ী নয়। কারণ একদিকে যেমন অভিকর্ষশক্তির দরুন বিশ্বের প্রসারণের হার কমে যাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে বিশ্বের উপাদানগুলি যত ছড়িয়ে পড়ছে, পরস্পরের থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছে, তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক বিকর্ষণশক্তি (আইনস্টাইনের সেই lambda force) ততই বেড়ে যাচ্ছে। লেমেতারের মতে বিশ্বের বিপুল প্রসারণের ফলে ঐ বিকর্ষণশক্তি এখন এতই প্রবল হয়ে উঠেছে যে তা অভিকর্ষশক্তিকে পরাজিত করে

বিশ্বলোককে শেষ পর্যন্ত এক অসীম প্রসারণের পথে নিয়ে যাচ্ছে। অভিকর্ষশক্তির আপেক্ষিক প্রাবল্যের পর্যায়ে বিশ্বের যে আপাত-স্থিরতা, তারই চিত্র পাওয়া যায় আইনস্টাইনের finite but unbounded universe-এর মডেলটিতে। আইনস্টাইনের বিশ্বের ঐ আপাত-স্থিরতা কিন্তু সাময়িক এবং অস্থায়ী। কালক্রমে lambda force-এর ক্রমিক প্রাবল্যের ফলে বিশ্বের প্রসারণ আবার স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। তারই নিশানা পাওয়া যায় দূরের গ্যালাক্সিগুলির আলোর red-shift-এর মধ্যে।

অখ্যাত ফ্রিডমান-তত্ত্বের অভ্যুত্থান : Big Bang মডেলের বিবর্তন : হাব্‌ল-এর যুগান্তকারী পর্যবেক্ষণ

ফ্রিডমানের 1922 সালের তত্ত্ব (যাতে আইনস্টাইনের lambda force-কে অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছিল) বহু বিজ্ঞানীর নজর এড়িয়ে গেলেও স্বয়ং আইনস্টাইনের চোখ এড়ায়নি। 1923 সালে তিনি ফ্রিডমানের ঐ তত্ত্বচিন্তার কিছু ভুল ধরেন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর ঐ আপত্তি প্রত্যাহার করে নেন। তার অনেকদিন পর পর্যন্ত ফ্রিডমানের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বচিন্তাটি বিজ্ঞানীমহলে অবহেলিত হয়ে থাকে, এবং লেমেতার-এডিংটনের primeval fireball মডেলটিই ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত 1929-30 নাগাদ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো বহু বছর আগে (1922-এ) প্রকাশিত ফ্রিডমানের চমকপ্রদ তত্ত্বচিন্তার দিকে। ঠিক তখনই মাউন্ট উইলসন থেকে এডউইন হাব্‌ল গ্যালাক্সিসমূহের দূরাপসরণ (recession of the galaxies) সম্বন্ধে তাঁর যুগান্তকারী পর্যবেক্ষণগুলিকে একটি পূর্ণ তত্ত্বের আকারে পরিবেশন করেন। দূরের সমস্ত গ্যালাক্সিগুলি যে



Hubble Diagram: দূরবিশ্বের গ্যালাক্সিদের দূরত্ব ও অপসারণ-বেগের মধ্যে হাবল্-আবিষ্কৃত সম্পর্ক। যত বেশি দূরত্ব তত বেশি অপসরণ-বেগ। আধুনিক হিসাব অনুযায়ী এই গতিবেগ হচ্ছে প্রতি megaparsec (অর্থাৎ প্রতি 33 লক্ষ আলোক-বর্ষ) দূরত্ব পিছু প্রতি সেকেন্ড 55 কিলোমিটার। ছবিতে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে দূরের গ্যালাক্সিগুলি সেকেন্ডে এক লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি বেগে দূরে সরে যাচ্ছে।

চিত্র 17

আমাদের গ্যালাক্সি থেকে সরে যাচ্ছে, শুধু তাই নয়। যে গ্যালাক্সিটি যত বেশি দূরে, সেটি তত

বেশি দ্রুতবেগে আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। হাব্‌ল আরো গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে শুধু আমাদের কাছ থেকেই যে অন্য-সব গ্যালাক্সি সরে যাচ্ছে তা নয়, প্রত্যেকটি গ্যালাক্সিই (গ্যালাক্সিপুঞ্জই) অন্য সমস্ত গ্যালাক্সি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এবং প্রতি মুহূর্তেই যে-কোনো দুটি গ্যালাক্সির (গ্যালাক্সিপুঞ্জের) মাঝের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বের মহাশূন্য (স্থান-কাল ক্ষেত্র) ক্রমশই স্ফীত অর্থাৎ প্রসারিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত গ্যালাক্সিগুলির আলোর লোহিতায়নের বা লোহিতাপসরণের (red-shift-এর) তারতম্য বিচার করে হাব্‌ল যে-কোনো গ্যালাক্সির আলোর red-shift-এর মাত্রা এবং তার গতিবেগের মধ্যে একটি অনুপাত বার করে ফেললেন। কোনো গ্যালাক্সির দূরত্ব আর তার অপসারণের বেগের এই অনুপাতটিই বিশ্বতত্ত্বের জগতে হাব্‌লের ধ্রুবক (Hubble's constant) H বা H_o নামে পরিচিত। এ সম্বন্ধে পরে আমাদের আরো আলোচনা করতে হবে।

তখন বিশ্বতাত্ত্বিকদের খেয়াল হলো, গ্যালাক্সিগুলির এই যে দূরত্ব-অনুসারী অপসরণবেগ, অর্থাৎ বিশ্ব-পরিসরের এই যে প্রসারণ, এটারই তো ছবি ফুটে উঠেছিল সাত-আট বছর আগে প্রকাশিত ফ্রিডমানের চিন্তায়। দেখা গেল, সেখানে ফ্রিডমান বিশ্বের আদি বিস্ফোরণ এবং তার ক্রমিক প্রসারণের চিত্রটি রচনা করতে আইনস্টাইনের সমীকরণগুলির যে সমাধান করেছিলেন তাতে lambda force-এর মূল্য ছিল শূন্য। অর্থাৎ ঐ শক্তির কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। সুতরাং এখন থেকে বিশ্বমডেল রচনার ঐ মহাবিকর্ষণশক্তি প্রায় পরিত্যক্তই হল। স্বয়ং আইনস্টাইন এবং ডি-সিটার 1932 সালে যুক্তভাবে lambda force বা cosmical constant-এর ধারণাটি প্রত্যাহার করে নিলেন। এখন থেকে অধিকাংশ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীই ফ্রিডমানের মডেলকেই ভবিষ্যৎ বিশ্বতত্ত্বচিন্তার ভিত্তিভূমি হিসাবে গ্রহণ করলেন।

অবশ্য লেমেতার-এডিংটন কিছুটা একই ধরনের যে তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন তার অনেক চিন্তাসূত্রও ফ্রিডমানীয় তত্ত্বচিন্তার পরবর্তী বিকাশে প্রভূত সাহায্য করেছিল। দুটি ব্যাপারে লেমেতারের চিন্তার বিশেষ অবদান আছে মনে হয়। প্রথমত, বিশ্বের আদিম বিস্ফোরণের আগেকার অবস্থাকে তিনি সৃষ্টির সমস্ত-বস্তু-সমন্বিত একটিমাত্র তেজস্ক্রিয় পরমাণবিক কেন্দ্রক (radioactive nucleus) বলে কল্পনা করেন—যার উপাদান ছিলো অকল্পনীয় রকমের ঘন nuclear fluid, যার প্রতি ঘন সেন্টিমিটারের ওজন ছিলো 25 কোটি টনের মতো, আর যার ব্যাস ছিলো 50 কোটি কিলোমিটারের কাছাকাছি। অর্থাৎ ঐ বিশ্বডিম্ব-পরমাণুটির আয়তন ছিল মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথটির ব্যাসের একটি গোলকের মতো। দ্বিতীয়ত, তাঁর ধারণায় এই ব্রহ্মাণ্ড-পরমাণু ছিল একান্তই ভারসাম্যহীন—কিছুটা আমাদের পরিচিত তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির (radioactive element-গুলির) মতো—এবং তার ফলে সেটি আপনা থেকেই বিস্ফোরিত হয়। এর থেকে প্রথম এই ধরনের আভাস পাওয়া যায় যে হয়তো আগেকার এক স্ফীত অবস্থা থেকে ক্রমিক সংকোচনের ফলেই এই বিপুল পরমাণুটির সৃষ্টি হয়, এবং চরম সংকোচনের মুহূর্তেই সেটি বিস্ফোরিত হয়ে আবার এক নতুন প্রসারণ-প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

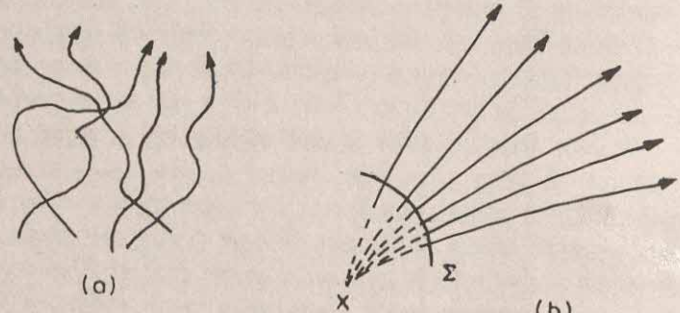
ফ্রিডমান তত্ত্বের বিচিত্র সম্ভাবনার বিকাশ

বিশ্ববিজ্ঞানীরা দেখলেন, ফ্রিডমান আইনস্টাইনের মূল সমীকরণগুলির যে-ধরনের সমাধানে প্রয়াসী হয়েছেন তার ভিত্তিতে বিশ্বলোকের কয়েক রকমের আকৃতি, গঠন ও বিবর্তনধারা কল্পনা

করা সম্ভব। বিশ্ব সসীম হতে পারে, অসীম-ও হতে পারে, চিরপ্রসারণশীল হতে পারে, আবার একবার স্ফীত একবার সংকুচিত (oscillating universe)—এমনও হতে পারে।

ঠিক গঠনটি কীরকম হবে তা মূলত নির্ভর করবে মহাশূন্যে বস্তুর গড় ঘনত্ব কত তার ওপরে। কারণ বিশ্বলোকে পরিব্যপ্ত মহাকর্ষশক্তির সামগ্রিক পরিমাণটি এই ঘনত্বের ওপরেই নির্ভরশীল। আর এই ঘনত্বজনিত মহাকর্ষশক্তি (গ্যালাক্সিগুলির পারস্পরিক আকর্ষণের দরুন) যত প্রবল হয়ে উঠবে, বিশ্বের প্রসারণের হারও তত কম হবে।

বিশ্বের যে-সব সম্ভাব্য মডেলের কথা আমরা এবার আলোচনা করবো তাদের সবগুলিই কিন্তু রচিত হয়েছে দুটি স্বতঃসিদ্ধ বা সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে। একটিকে বলা হয় Weyl-এর স্বতঃসিদ্ধ (Weyl's postulate—প্রবর্তক H. Weyl-এর নামে)। এই ধারণা অনুযায়ী গ্যালাক্সিগুলির গতি আঁকাবাঁকা বা এলোমেলো নয়; তাদের গতিপথগুলি (অনেকটা) একটি বৃত্ত



চিত্র 18

বাঁদিকে, গ্যালাক্সিদের এলোমেলো গতি হলে কীরকম হোত তার একটি নকশা। ডানদিকে, Weyl Postulate অনুযায়ী গ্যালাক্সিদের নিয়মিত গতিপথের ছক। Σ (sigma) surface-এর ওপর অবস্থিত সব গ্যালাক্সিতে মহাজাগতিক সময় একই হবে। X থেকে বিভিন্ন দূরত্বে এইরকম অসংখ্য তলের কল্পনা করা যেতে পারে।

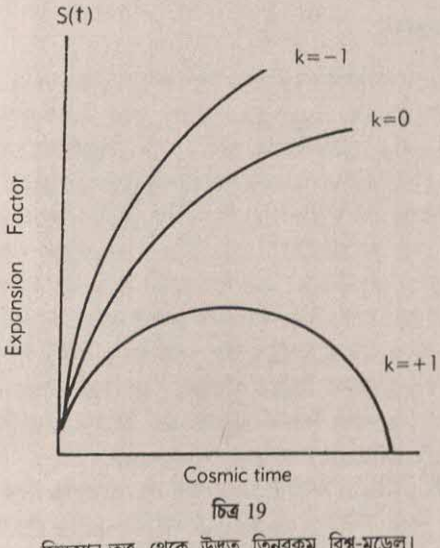
বা গোলকের কেন্দ্র থেকে নির্গত ব্যাসার্ধসমূহের মতো। (মহাকর্ষশক্তির জন্য অবশ্য লাইনগুলি একটু বাঁকা।) গতিগুলি এমন, যে চিত্রের sigma (Σ) তলের মতো যে-কোনো দূরত্বে আঁকা তলের ওপর সব জায়গাতেই মহাজাগতিক সময় একই হবে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হচ্ছে হাব্‌ল-এর আবিষ্কারের ভিত্তিতে গঠিত cosmological principle। এই সূত্র অনুযায়ী যে-কোনো একটি বিশেষ সময়ে (এখন, বা দুশো কোটি, বা চারশো কোটি বছর আগে) বিশ্বের যে কোনো দিক থেকে অন্য যে-কোন দিকে তাকালে সবদিককে একই রকম মনে হবে। এই দুটি ধারণা বিশ্বচিত্রটিকে অনেকটা সরল করে দেয়।

তিনটি বিশ্ব-ছাঁদের উদ্ভব

এ-সবের ভিত্তিতে আইনস্টাইন-ফ্রিডমান তত্ত্ব থেকে মোটের ওপর তিন রকম বিশ্ব-মডেল

বেরিয়ে আসে। (চিত্র 19 দেখুন।) সেগুলির চরিত্র নির্ভর করে বিশ্বে বস্তুর গড় ঘনত্ব এবং তার ফলস্বরূপ বিশ্বপরিসরের (space-time-এর) জ্যামিতিক গঠনের ওপর। গড় ঘনত্বের একটা বিশেষ পরিমাণকে বলা হয় নির্ণায়ক ঘনত্ব (critical density)। বিশ্বে ঘনত্ব যদি এই critical পরিমাণের চেয়ে বেশি হয় তাহলে (অভিকর্ষের সামগ্রিক প্রবলতার ফলে) space বা বিশ্বপরিসর হবে বদ্ধ (closed) ও গোলকাকার (spherical), আর বিশ্বলোকের আকার হবে সসীম। অর্থাৎ বিশ্বের প্রসারণবেগ ক্রমশ মন্থর হতে হতে শেষে থেমে যাবে, এবং সেই মুহূর্ত থেকে সংকোচনের বিপরীত প্রক্রিয়া শুরু হবে। তারপর কয়েক হাজার কোটি বছর পরে বিশ্বের সমস্ত বস্তুপুঞ্জ আবার প্রারম্ভের সেই Big Bang মুহূর্তের চরম ঘনত্বের অবস্থায় ফিরে যাবে।

এই ধারণারই পরিণতি হিসাবে এসেছে স্ফীত-সংকুচিত (বা স্পন্দনশীল বা দোলনশীল) বিশ্বের রোমাঞ্চকর মডেলটি (pulsating or oscillating model)। এই মডেল অনুযায়ী critical মাত্রার অধিক ঘনত্ব বিশিষ্ট মহাবিশ্ব চিরকালই ক্রমান্বয়ে প্রসারিত ও সংকুচিত হয়ে চলেছে। যেন একটা ছোট্টো বেলুন অনন্তকাল ধরে একবার প্রকাণ্ড হয়ে ফুলে উঠছে এবং তারপরেই আবার সংকুচিত হয়ে আগেকার সেই কণাবৎ অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। ধরা যাক বিশ্বে বস্তুর ঘনত্ব critical density-র দ্বিগুণ, এবং Hubble's constant-এর যে মূল্য, অর্থাৎ



চিত্র 19

ফ্রিডমান-তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত তিনরকম বিশ্ব-মডেল।

বিশ্বপরিসরের প্রসারণের যে হারটি বর্তমানে প্রচলিত, সেটি সঠিক। তাহলে হিসাব এইরকম দাঁড়াবে যে বিশ্বের এ-দফার প্রসারণপর্ব প্রাক-Big Bang-মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় 1000 কোটি (10000 million) বছর ধরে চলেছে এবং আরো 5000 কোটি বছর ধরে ক্রম-মন্থর গতিতে চলতে থাকবে। তারপরে Big Bang-জনিত অপকেন্দ্রিক শক্তি (centrifugal force) নিঃশেষিত হবে, এবং শুরু হবে মাধ্যাকর্ষণজনিত (ক্রম - ত্বরান্বিত)

সংকোচন-প্রক্রিয়া—যার ফলে আরো 5000 কোটি বছর পরে আবার বিশ্বলোক আজকের আয়তনে ফিরে আসবে। তারপরে ক্রমশই দ্রুততর গতিতে সংকুচিত হতে হতে আরো 1000 কোটি বছর পরে আবার সেই প্রাক-Big Bang-মুহূর্তের চরম ঘনত্বে ফিরে যাবে এক মহাকুঞ্চন বা Big Crunch-এর মাধ্যমে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঐ প্রচণ্ড অভিকেন্দ্রিক ধাক্কার প্রতিক্রিয়ায়, অর্থাৎ rebound করে, আবার প্রসারিত হতে শুরু করবে। এই প্রসারণ-সংকোচনের পর্যাবৃত্তি (alternation) চলতে থাকবে অনন্তকাল ধরে।

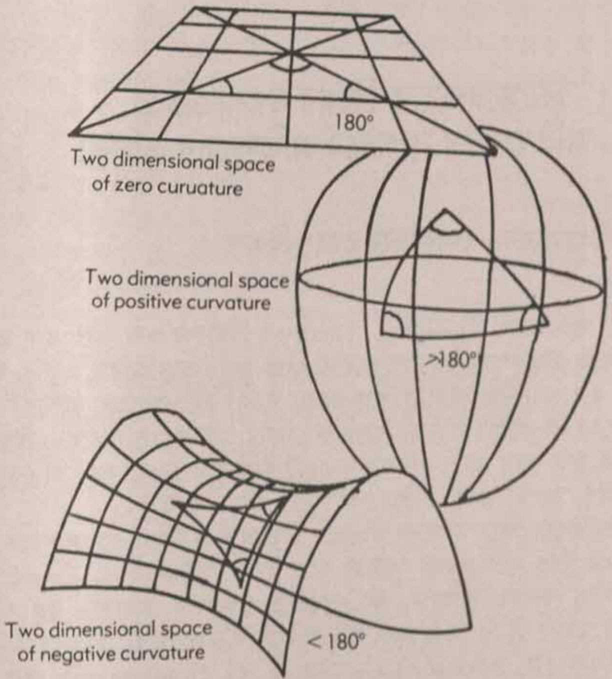
এই বিশ্বচিত্রটি দুটি দুশ্চিন্তা থেকে আপাত-মুক্তি দেয়। প্রথমত এই মডেলে বিশ্বের বা বিশ্ব-উপাদানগুলির সৃষ্টির ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়া যায়—কারণ ধরে নেওয়া হয় যে বিশ্ব চিরদিনই এই স্ফীত-সংবৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয়ত, Big Bang-এর পূর্বমুহূর্তে যে শূন্য আয়তন ও অসীম ঘনত্বের অবস্থা (zero volume and infinite density) ছিল বলে ধরে নিতে হয়, সেই পরম-রহস্যময় নিয়ম-বহির্ভূত অনন্যতা (singularity) থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। কারণ oscillating model-এর ক্ষেত্রে বলা যায় : যে-অবস্থা থেকে প্রসারণের শুরু বা যে অবস্থায় সংকোচনের শেষ হয় সেটা কোন অসীম ঘনত্বের অবস্থা নয়, সেটা এক অতিবিপুল কিন্তু সসীম ঘনত্বের অবস্থা– লেমেতার-এর সেই কয়েক কোটি কিলোমিটার ব্যাসের বিশ্বডিম্ব-পরমাণুর ঘনত্বের মতো। বলা বাহুল্য, এ-সবই এখনও তত্ত্বচিন্তার পর্যায়েই আছে।

অসীম বিশ্ব : দুরকম গঠন

কিন্তু ঘনত্ব যদি critical পর্যায়ের হয় বা তার চেয়ে কম হয়, তাহলে space-এর গঠন হবে খোলা (open) এবং অগোলকীয় (non-spherical), আর বিশ্বের সামগ্রিক আকার হবে অসীম। এ বিষয়ে মূলত দুরকম মডেলের কথা ভাবা হয়েছে। বিশ্বপরিসরে বস্তুর গড় ঘনত্ব যদি ঠিক critical পর্যায়ের হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত মহাকর্ষশক্তি প্রসারণবেগের কাছে একটুর জন্য হেরে যাবে, এবং বিশ্বপরিসর অত্যন্ত ধীর গতিতে প্রসারিত হতেই থাকবে। এটা বোঝা খুব শক্ত নয়। পৃথিবীর অভিকর্ষক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যেতে হলে কোন বস্তুকে সেকেন্ডে অন্তত সাত মাইল (11.2 কি·মি·) বেগে চলতে হবে। ঠিক সাত মাইল বেগে কোন বস্তু পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উঠলে কী হবে? পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে তার গতি ক্রমশই কমতে থাকবে, কিন্তু দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিকর্ষের বলও কমতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত বস্তুটি পৃথিবীর অভিকর্ষক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যাবে—যদিও অনেক স্তিমিত গতিতে। 19 চিত্রটি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, এই ঠিক critical density-বিশিষ্ট বিশ্বের space-এর আকার বাঁকা (non-euclidean) থেকে ক্রমশ সমতল (euclidean) অবস্থার দিকে যাবে।

বস্তুর গড় ঘনত্ব যদি critical অবস্থার চেয়ে কম হয় তাহলেও বিশ্ব হবে অসীম। তার space-ও হবে খোলা, কিন্তু সোজা বা euclidean নয়। ঐ space হবে বাঁকা অথচ অসীম। কিন্তু তা কী করে হয়? বাঁকতে বাঁকতে তো গোল অর্থাৎ closed এবং সসীম হয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন—না, বাঁকা অথচ অসীম এমন কয়েক রকমের space হওয়া সম্ভব। যেমন ঘোড়ার পিঠে যে জিন লাগানো হয় তার বক্রতা। ঐ বক্রতার গঠনই অসীম; যতই বাড়ানো যাক অসীমই থেকে যাবে; কখনই বৃত্তের পরিধির মত গোল হয়ে ঘুরে মিলে যাবে না। Critical-এর চেয়ে কম ঘনত্ববিশিষ্ট বিশ্বের space-এর এইরকম ঋণাত্মক বক্রতা (negative curvature) থাকবে।

20 নং চিত্রে সমতল euclidean পরিসরের এবং (পজিটিভ্ ও নেগেটিভ বক্রতাবিশিষ্ট) দুরকম non-euclidean পরিসরের আকার সম্বন্ধে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হল। (14নং ও 19নং চিত্র দুটি মিলিয়ে দেখুন।) Super-critical ঘনত্বের সসীম বিশ্বের space হবে non-euclidean ও গোলাকার, এবং তার বক্রতা হবে positive (k=+1)। ঠিক critical ঘনত্বের বিশ্বে ধাবমান বস্তুগুলি মহাকর্ষকে কোন রকমে হারিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সোজা পথে চলতে থাকবে। সুতরাং তার space হবে অসীম এবং সমতল (flat) অর্থাৎ



চিত্র 20

বিশ্বের তিনরকম পরিসরের (Space-এর) দ্বিমাত্রিক চিত্র। ওপরেরটি আমাদের পরিচিত সমতল euclidian space-যাতে ত্রিভুজ আঁকলে তার তিন কোণের সমষ্টি হয় 180 ডিগ্রি। মাঝে রয়েছে বাঁকা, গোলাকার (এক ধরনের non-euclidian) Space-যেখানে তিনকোণের সমষ্টি হবে 180 ডিগ্রির বেশি। নিচে দেখানো হয়েছে আর এক ধরনের বাঁকা non-euclidian space ("ঘোড়ার জিনের মতো বক্রতাবিশিষ্ট")—যেখানে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180 ডিগ্রির কম। তিনটি Friedmann মডেল এই তিনরকম গঠনের Space-এর সঙ্গে যুক্ত।

euclidean, এবং তার বক্রতা দাঁড়াবে শূন্য (k=0)। আর যে বিশ্বে বস্তুর ঘনত্ব sub-critical তার পরিসর হবে অসীম কিন্তু বক্র, আর তার বক্রতা হবে negative প্রকৃতির (k=-1)।



চার

বিস্ফোরণজাত বিশ্বের উৎপত্তিচিন্তা : অতিবৃহত্তের সংগঠনে অতিক্ষুদ্রের ভূমিকা

নক্ষত্রশক্তির উৎসসন্ধান : কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিকাশ

Relativity-র সঙ্গে সঙ্গে Quantum Theory-র বিকাশের কথা আগে বলা হয়েছে। বিশের দশক থেকে মৌলকণাসমূহের (যার মধ্যে আলোক-কণাও পড়ে) অস্তিত্ব, প্রকৃতি, আচরণ ও শ্রেণীবিভাগ এক অভাবনীয় সূক্ষ্মতার দিকে এগুতে থাকে। এই ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার রহস্যকে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন। বিশ্বতত্ত্বের পরের পর্যায়টির কথা বলার আগে এবিষয়ে দু-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। (কথাগুলি খুবই সহজ করে, হয়তো একটু বেশি সরল করে বলতে হচ্ছে।)

জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তারাদের অভ্যন্তরে কীভাবে শক্তি উৎপন্ন হয় সে সম্বন্ধে ধারণা বিশের ও ত্রিশের দশক ধরে ক্রমশই স্পষ্টতর হতে থাকে। আইনস্টাইনের $E=mc^2$ সূত্র অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা ভাবতে লাগলেন, কী পদ্ধতিতে নক্ষত্রদের অভ্যন্তরে বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে তাদের ঐ বিপুল-পরিমাণ শক্তিবিকিরণ ঘটাতে পারে। ক্রমান্বয়ে এডিংটন, গ্যামো, অ্যাটকিনসন্ (R. Atkinson), হটারম্যানস্ (F. G. Houtermans), বেথে (H. Bethe), ভাইৎসাকের (C. F. von Weizsacker) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বোঝা গেল যে নক্ষত্রকেন্দ্রের প্রচণ্ড চাপ ও তাপের মধ্যে চারটি করে হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক (প্রোটন) এক-একটি হিলিয়াম্ কেন্দ্রকে পরিণত হচ্ছে, এবং ঐ সম্মিলনপ্রক্রিয়ায় একটু যে বাড়তি বস্তু থাকছে (4টি প্রোটনের ভর একটি হিলিয়াম্-কেন্দ্রকের ভরের চেয়ে একটু বেশি) সেটি শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

কিন্তু হিলিয়াম্ কেন্দ্রকে তো দুটি প্রোটন ও দুটি (প্রায় একই ভরের কিন্তু চার্জহীন) নিউট্রন থাকে। তাহলে হিলিয়াম্ গঠনকালে নিশ্চয়ই চারটি প্রোটনের মধ্যে দুটি প্রোটন নিউট্রনে পরিণত হয়। কীভাবে তা হয়? ঐ রূপান্তরকালে প্রতিটি প্রোটন পরিণত হয় একটি নিউট্রন ও একটি পজিট্রনে (Positron), অর্থাৎ আমাদের পরিচিত ঋণাত্মক ইলেকট্রনের বিপরীত-কণা

বা antiparticle-এ। 1928 সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডিরাক (P. A. M. Dirac) এই Positron-কণার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং 1932 সালে অ্যান্ডারসন (C. F. Anderson) মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার সময়ে ঐ কণার অস্তিত্বের প্রমাণ পান। ঐ সময় থেকে বিজ্ঞানীমহলে ক্রমশই এই ধারণা প্রবলতর হতে থাকে যে প্রকৃতির জগতে (দু-একটি বাদে) প্রত্যেক ধরনের মৌল কণার (যেমন প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন-এর) বিপরীতকণা থাকার কথা। পরবর্তীকালে এ ধারণা ঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আরো উল্লেখযোগ্য, নিউট্রিনো (neutrino) নামক একটি অবিশ্বাস্য প্রকৃতির কণা আর তার বিপরীত-কণা antineutrino আবিষ্কৃত হল। এদের সাংকেতিক যথাক্রমে ν এবং $\bar{\nu}$। (নিউট্রিনোরও আবার রকমফের আছে; কিন্তু ঐ জটিলতার মধ্যে আমরা আর যাচ্ছি না।) এই কণার কোনো স্থিতি-ভর নেই (rest mass= 0), কোনো চার্জ নেই, আর এ নাকি সর্বদাই আলোর গতিতে চলে। এই সৃষ্টিছাড়া কণাটির (কণা ভূতের/ অশরীর) আবিষ্কার quantum mechanics-এর এবং যন্ত্রপ্রয়োগের অবিশ্বাস্য সূক্ষ্মতার পরিচয় বহন করে। বিশেষ অবস্থায় একটি প্রোটন রূপান্তরিত হতে পারে একটি নিউট্রন ও একটি পজিট্রনে ($P \rightarrow N + e^{+}$) আর নিউট্রন রূপান্তরিত হতে পারে প্রোটন ও ইলেকট্রনে ($N \rightarrow P + e^{-}$)। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই খুব সামান্য পরিমাণ শক্তি যেন কোথায় হারিয়ে যায়। এই হারানো শক্তিটুকুকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল ঐ আলোককণাবৎ "বস্তুকণা" neutrino বা antineutrino রূপে। এই কণা কার্যত অবিনশ্বর, এবং পৃথিবীর মতো বিশাল বস্তুপিণ্ডকেও অনায়াসে ভেদ করে চলে যেতে পারে।

যে-কোনো কণা তার বিপরীত কণার সংস্পর্শে আসামাত্রই কিন্তু দুটি কণাই লোপ হয়ে যায়, এবং তাদের জায়গায় দুটি বা তিনটি প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন গামা রশ্মিকণার (যার চিহ্ন γ) সৃষ্টি হয়। তেমনি বিশেষ অবস্থায় দুই বা ততোধিক গামা photon-এর সংঘর্ষ থেকে একজোড়া ইলেকট্রন-পজিট্রন বস্তুকণার সৃষ্টি হতে পারে (pair production)। মহাকাশের সমস্ত দিক থেকে এক প্রচণ্ড-শক্তিসম্পন্ন (গামা রশ্মির চেয়েও প্রবল) রশ্মি—মহাজাগতিক রশ্মি বা cosmic radiation—সর্বদাই আসছে। পরীক্ষা করে জানা গেছে এগুলি প্রায় আলোর বেগে ধাবমান উচ্চশক্তিসম্পন্ন বস্তুকণা—অধিকাংশই প্রোটন। কোন মহাজাগতিক উৎস থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে এরা আসছে তা আজও সঠিকভাবে জানা যায়নি। কিন্তু এগুলির নিজেদের মধ্যে এবং এদের সঙ্গে আলোককণাদের সর্বদাই যে সংঘর্ষ হচ্ছে তার থেকে আমরা বস্তু ও শক্তির এই পারস্পরিক রূপান্তর সম্বন্ধে অনেক সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছি।

Quantum mechanics-এর অগ্রগতি থেকে আরো উদ্ঘাটিত হল যে আলোকে যেমন এক হিসাবে কণা (photon) মনে করা যায়, তেমনি প্রতিটি বস্তুকণারও (প্রোটন, ইলেকট্রন ইত্যাদিরও) আবার এক ধরনের তরঙ্গপ্রকৃতি আছে। এই অবপারমাণবিক বস্তুকণাগুলিকে পরমাণু বা অণু বা বস্তুপুঞ্জে একত্রিত অবস্থায় দেখলে তাদের চেহারা, চরিত্র, আচরণ ইত্যাদিকে বেশ নিয়মিত মনে হয়। কিন্তু একটি বিশেষ ইলেকট্রন বা প্রোটন বা নিউট্রনের অস্তিত্ব বা গতিবিধি বড় রহস্যময়। এদের ভর, অবস্থান, গতি একই মুহূর্তে নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব নয়। এগুলো হচ্ছে সম্ভাব্যতার (probability-র) ব্যাপার, নিশ্চিতির ব্যাপার নয়। বিশের দশকের মাঝামাঝি এ বিষয়ে ফ্রান্সের ডি-ব্রগলি (Louis de Broglie) এবং পরে wave mechanics-এর জনক অস্ট্রিয়ার শ্রডিংগার (Erwin Schrodinger) এবং অনিশ্চয়তাবাদ বা uncertainty principle-এর আবিষ্কর্তা জার্মান বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ (Werner

Heisenberg) অবপারমাণবিক কণাদের কণা-তরঙ্গ-সমন্বিত যুগ্মপ্রকৃতি এবং তাদের একক আচরণের অভিনব ও অনির্দেশ্য বৈচিত্র্য উদ্ঘাটিত করে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জগতে আর একটি নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করলেন।

চল্লিশের দশকের গোড়ায় বিজ্ঞানীদের ধারণা এই দাঁড়ালো যে তারাদের প্রধান উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং (এক কথায় বলতে গেলে) এদের উত্তপ্ত কেন্দ্রস্থলে হাইড্রোজেন পরমাণু জুড়ে জুড়েই উচ্চতর ভরের মৌল উপাদানগুলির সৃষ্টি হয়।

বিশ্বজগতের জন্মমুহূর্তের রহস্যসন্ধান ঃ গ্যামো প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নতুন আলোকপাত

1948-এর কাছাকাছি বিশ্বতাত্ত্বিক চিন্তাধারা মূলত দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। তাদের মধ্যে যেটি এখনও পর্যন্ত প্রধান বলে পরিচিত সেটি মূলত Big Bang তত্ত্বেরই ক্রমিক সম্প্রসারণ। আমরা প্রথমে এই চিন্তাধারাটি সম্বন্ধে আলোচনা করবো।



চিত্র 21

জর্জ গ্যামো



চিত্র 22

ফ্রেড হইল

Weyl postulate-এর চিত্রটিতে দেখা যায় গ্যালাক্সিদের গতিপথগুলি মিশে গেছে x বিন্দুতে। অথবা বলা যায়, সব পথগুলি বেরিয়েছে x বিন্দু থেকে। মার্কিন বিজ্ঞানী গ্যামো (George Gamow) ত্রিশের দশক থেকেই বলতে চাইছিলেন যে সমস্ত বিশ্ববস্তু একটি বিন্দুবৎ অবস্থা (x) থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এই x বিন্দুটিতে এই বিপুল বিশ্বের সমস্ত বস্তু কীভাবে সংহত ছিল? উত্তর হচ্ছে: তা কেউ জানে না। পদার্থবিদ্যার কোন নিয়ম একে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এই অবস্থায় প্রসারণ বা আয়তন ছিল শূন্য ($s=0$); বস্তু ও শক্তির ঘনত্ব ছিল অসীম; আর সময়—time—তখনও শুরু হয়নি ($t=0$)। একে বলে singularity, অর্থাৎ এক অজানা, অবর্ণনীয় অবস্থা।

কিন্তু তাহলে এই উদ্ভট, অসম্ভব অবস্থার ধারণাটা এলো কোথা থেকে? এসেছিলো খোদ

General Relativity-র সূত্রগুলির থেকেই। আইনস্টাইনের সমীকরণগুলি থেকে এইরকম একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কোনো অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণশক্তি (অভিকর্ষ) যদি আর সমস্ত শক্তিকে অতিক্রম করে যায় তাহলে অভিকর্ষপিষ্ট বস্তুপিণ্ড সংকুচিত হতে হতে একটি বিন্দুতে পরিণত হবে যার আয়তন শূন্য (zero volume) এবং ঘনত্ব অসীম (infinite density)। এটিকে নিছক কল্পনার পর্যায়েই ফেলা হোতো। তা সত্ত্বেও একটা সুদূর সম্ভাবনা হিসাবে এটা তরুণ বিজ্ঞানীদের মনে মাঝে মাঝে উঁকি মারতো।

1946 সালে প্রকাশিত গ্যামোর গবেষণাপত্র *The Evolution of the Universe*, 1948-এ প্রকাশিত গ্যামো, আলফার (R. A. Alpher) ও বেথে-র (H. Bethe-র) *The Origin of the Elements*, একই বছরে প্রকাশিত আলফার ও হার্মান-এর (R. C. Herman-এর) *Evolution of the Universe*, জাপানী বিজ্ঞানী হায়াশির (C. Hayashi-র) 1950 সালের *Progress in Theoretical Physics* এবং 1956 সালে প্রকাশিত গ্যামোর *The Physics of the Expanding Universe*—এই গবেষণাপত্রগুলির মধ্য দিয়ে আদিম বিস্ফোরণের ফলে সদ্যসৃষ্ট বিশ্বের যে ছবিটি পাওয়া যায় তার একটা সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি।

আদিম বিস্ফোরণের সেই রহস্যাবৃত মুহূর্তটিতেই জগতের এবং সময়ের শুরু বলে মনে করা হয়েছে। আদি বিশ্বের সমস্ত উপাদান প্রচণ্ড বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু একই সঙ্গে ঐ উপাদানগুলির (বস্তুকণা ও রশ্মিকণা দুয়েরই) পারস্পরিক অভিকর্ষশক্তি খানিকটা ব্রেকের মতো কাজ করে উৎক্ষেপণের ঐ প্রচণ্ড বেগকে খুব ধীরে ধীরে কমিয়ে আনে।

গরম খিচুড়ি দিয়ে শুরু

ঠিক বিস্ফোরণের নিমেষটিতে ক্ষুদ্রায়তন বিশ্বের উপাদান কী ছিল? বলা সম্ভব নয়। তার অন্যতম কারণ ঐ মুহূর্তে বিশ্বের তাপমাত্রা কত ছিল তা আমরা জানি না। কোআন্টাম তত্ত্বের সমস্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা হিসাব শুরু করেছেন জন্মমুহূর্তের এক সেকেণ্ডের এক শতাংশ পর থেকে—যখন বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল 10^{11}°K অর্থাৎ "মাত্র" 10,000 কোটি ডিগ্রি কেল্‌ভিন্ ("a mere hundred thousand million degrees Kelvin")। এই অবস্থায় বিশ্বের গঠন ছিল একেবারে সরল; কারণ তখন বিশ্ব ছিল বস্তুকণা আর রশ্মিকণার এক অবিমিশ্র ঝোলের (বা খিচুড়ির বা তড়কার) মতো—Weinberg যাকে বলেছেন "an undifferentiated soup of matter and radiation"। এই ঘন-সন্নিবিষ্ট কণাগুলি ছিল (দারুণ তাপের তাড়নায়) নিরন্তর এবং অভাবনীয় রকমের দ্রুত সংঘর্ষে লিপ্ত, এবং তার ফলে দ্রুত-প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের সর্বত্র একই তাপমাত্রা (thermal equilibrium) বজায় ছিল।

আমরা জানি, বিশেষ অবস্থায় বস্তুকণা রশ্মিকণায় (আলোক-জাতীয় বিকিরণে) এবং রশ্মিকণা বস্তুকণায় পরিণত হতে পারে। বিশ্বের এই নিদারুণ উষ্ণ ও ঘন অবস্থায় সারাক্ষণই এই রূপ-বিনিময়ের প্রক্রিয়া ঘটে চলেছিলো। কী ধরনের বস্তুকণা এই অবস্থার মধ্যে উপস্থিত ছিলো? যে-সব বস্তুকণা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম তাপমাত্রা (threshold temperature) 10^{11}°K-এর চেয়ে কম। এখানে বিপুল পরিমাণে উপস্থিত ছিলো (রশ্মিকণা

বা photon ছাড়া) ইলেকট্রন (e^-) ও তার বিপরীতকণা পজিট্রন (e^+) আর সেই 'ভৌতিক' ভরহীন কণা নিউট্রিনো ও তার বিপরীতকণা অ্যান্টিনিউট্রিনো। এই তিনজাতীয় কণা প্রায় সমান সংখ্যায় উপস্থিত ছিলো। আমরা জানি, এই নিউট্রিনো অনায়াসে পৃথিবীকে ভেদ করে চলে যেতে পারে (যা গামারশ্মিও পারে না)। কিন্তু এই পর্যায়ে বিশ্ব এত অসম্ভব ঘন ছিলো যে নিউট্রিনোরাও এই photon-electron-positron-এর জমাট জালে আটকে পড়ে সারাক্ষণ তাদের সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যে ধাক্কা খেতে থাকে। এই অবস্থায় বস্তুকণাদের আচরণ হয় প্রায় আলোকরশ্মিরই মতো। এই পর্যায়ে বিশ্বের ঘনত্ব ছিলো জলের প্রায় 400 কোটি গুণ।

আদিম অগ্নিকুণ্ডটির এই পর্যায়ে তার মধ্যে "অল্পসংখ্যক" (আসলে অগণ্য কোটি) nuclear particle, অর্থাৎ প্রোটন ও নিউট্রনও, উপস্থিত ছিলো। এগুলি আরো আগে, বিশ্বের আরো অনেক বেশি উত্তপ্ত অবস্থায়, বিপুল পরিমাণে উপস্থিত ছিলো। বর্তমানে অনুপাত দাঁড়িয়েছে : প্রতি 100 কোটি ফোটন বা ইলেকট্রন-পজিট্রন বা নিউট্রিনো-অ্যান্টিনিউট্রিনো পিছু একটি করে proton বা neutron। আর ঐ চার ধরনের হাল্কা কণার সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষের ফলে প্রোটনগুলি অনবরত নিউট্রনে এবং নিউট্রনগুলি প্রোটনে রূপান্তরিত হতে লাগলো—প্রায় একই হারে। এই অবস্থায় কোনো পরমাণু-কেন্দ্রক (যেমন deuterium বা heavy hydrogen) আকস্মিকভাবে গঠিত হলেও তা তখনই প্রচণ্ড তাপ ও চাপের ফলে ভেঙে যেতে লাগলো।

মনে রাখা দরকার, এই প্রচণ্ড ঘনত্ব সত্ত্বেও বিস্ফোরণের বেগের তাড়নায় বিশ্বের আয়তন বেড়ে চলতে লাগলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই হারে বিশ্বের তাপমাত্রা কমতে লাগলো।

প্রোটনদের ক্রমিক প্রাধান্য শুরু : নিউট্রিনোদের পলায়ন

জন্মের 0.11 সেকেন্ড পরেও বিশ্বের অবস্থা প্রায় সেই একই : সর্বত্র সমান-উত্তপ্ত এক অবিমিশ্র cosmic soup। তবে তাপমাত্রা 3000 কোটি ডিগ্রিতে (K) নেমে আসায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন শুরু হল। নিউট্রন প্রোটনের চেয়ে সামান্য একটু বেশি ভারি। তাই এই একটু-নিচু তাপমাত্রায় নিউট্রনগুলি একটু বেশি তাড়াতাড়ি প্রোটন হয়ে যেতে লাগলো। ফলে নিউট্রন ও প্রোটনের আপেক্ষিক পরিমাণ মোটের ওপর দাঁড়ালো যথাক্রমে (50 ও 50 থেকে) 38 ও 62 শতাংশ।

বিস্ফোরণের 1.09 সেকেন্ড পরে তাপমাত্রা নেমে এলো 1,000 কোটি ডিগ্রিতে। সাধারণভাবে এখনো সর্বত্রই তাপমাত্রার সমতা। শুধু এইটুকু তাপহ্রাসের ফলে নিউট্রিনোরা সেই জমাট ঝোলে জড়ানো অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে মুক্তকণার (free particleএর) মতো ছটকে বেরিয়ে যেতে লাগলো। মনে রাখতে হবে তাদের গতিবেগ আলোর বেগের সমান বা প্রায় সমান। তাদের অভিকর্ষের প্রভাবটুকু বাদে বিশ্বচিত্র-বিবর্তনে এখন থেকে আর তাদের কোন ভূমিকা রইলো না। এছাড়াও, নিম্নতর তাপমাত্রায় নিউট্রনগুলি প্রোটনগুলির চেয়ে আরো দ্রুতবেগে রূপান্তরিত হওয়ায় তাদের অনুপাত দাঁড়ালো নিউট্রন 24 ও প্রোটন 76 শতাংশ। কিন্তু তাপ এখনো এত বেশি যে এ পর্যায়েও কণায় কণায় জুড়ে গিয়ে পরমাণু-কেন্দ্রক গঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

13.82 সেকেন্ড পরে তাপমাত্রা দাঁড়িয়েছে 300 কোটি ডিগ্রি (3×10^9k) এই তাপ কিন্তু আর ইলেকট্রন-পজিট্রন সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ এই তাপমাত্রা ইলেকট্রন-পজিট্রনের threshold temperature-এর চেয়ে কম। আগেকার বেশি-তাপের পর্যায়েও ইলেকট্রন-পজিট্রনের নিরন্তর সংঘর্ষের ফলে দুরকম কণাই ধ্বংস হয়ে রশ্মিকণায় (photon-এ) পরিণত হচ্ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে রশ্মিগুলি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়ের সৃষ্টি হচ্ছিলো। এখন কিন্তু এই কণাগুলি আর সৃষ্ট হচ্ছে না; অথচ যে ইলেকট্রন(e^-)ও পজিট্রন (e^+)-গুলি রয়েছে সে গুলি সারাক্ষণ পরস্পরকে ধ্বংস করে চলেছে। তাই এখন থেকে ইলেকট্রন-পজিট্রনরা আর বিশ্বের প্রধান উপাদান গুলির মধ্যে গণ্য রইলো না। আর neutrino-রা তো আগেই ছটকে বেরিয়ে গেছে। সুতরাং এখন থেকে আমরা বিশ্বের তাপমাত্রা বলতে বোঝাবো রশ্মিকণাদের তাপমাত্রা।

এই পর্যায়ের অবস্থাটির মধ্যে একটি অদ্ভুত পরস্পরবিরোধিতা ছিলো। ঐ 300 কোটি ডিগ্রি তাপে He^4 অর্থাৎ হিলিআম nucleus দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন দিয়ে গঠিত alpha particle) টিকে থাকা সম্ভব, কারণ ঐ পরিমাণ তাপ He^4-এর সুদৃঢ় বাঁধুনিকে ভেঙে দিতে পারে না। অথচ এই পর্যায়ে হিলিআম তৈরি হয়নি। কারণ হিলিআম তৈরি হয় পর্যায়ে পর্যায়ে, আর তার প্রথম ধাপ হচ্ছে একটি প্রোটন আর একটি নিউট্রন জুড়ে গিয়ে heavy hydrogen বা deuterium তৈরি হওয়া। কিন্তু ঝামেলা এই যে, এই deuterium-এর গঠনটি বড় দুর্বল; তাই ঐ যুগ্মকণাটি গঠিত হওয়ামাত্র ঐ 300 কোটি ডিগ্রি তাপ আবার তাকে ভেঙে দিচ্ছিলো। সুতরাং ঐ deuterium আরো একটি প্রোটন ও আরো একটি নিউট্রনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হিলিআম-4 কেন্দ্রক গঠন করবার মতো সময়ই পাচ্ছিলো না। এই বাধাটিকে বলা হয় deuterium bottleneck।

এই আর-একটু-কম তাপে নিউট্রন-রূপান্তরণের হার আর একটু বেড়ে গিয়ে নিউট্রন ও প্রোটনের পরিমাণ দাঁড়ালো যথাক্রমে 17 আর 83 শতাংশের মতো।

নিউট্রনদের অস্তিত্ব-সংকট : কোনোরকমে শেষ রক্ষা : হিলিআমের উৎপত্তি

আরম্ভের তিন মিনিট দু সেকেন্ড পরে, তাপমাত্রা যখন 100 কোটি ডিগ্রিতে নেমেছে তখন অধিকাংশ ইলেকট্রন ও পজিট্রন(সব নয়) পারস্পরিক ধ্বংসলীলার মাধ্যমে রশ্মিতে পরিণত হয়েছে। ফলে বিশ্বের সামগ্রিক তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে গেছে—অর্থাৎ যতটা কমার কথা ছিলো ততটা কমেনি। Photon-দের তাপমাত্রা তখন বেরিয়ে-যাওয়া neutrino-দের চেয়ে প্রায় 35 শতাংশ বেশি।

এখনও কিন্তু সেই deuterium bottleneck হিলিআম গঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। অথচ পরিস্থিতি এমনই সংকটময় যে আর কিছুক্ষণ পরে হিলিআম গঠনের জন্য কোন নিউট্রনই আর বিশ্বে অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ মুক্ত অবস্থায় (পরমাণুর বাইরে) নিউট্রন মাত্র 15 মিনিটের মতো টিকে থাকে। তার পরেই ভেঙে যায়। এর আগে পর্যন্ত বিশ্বের দারুণ ঘনত্বের চাপই নিউট্রনকে টিকিয়ে রেখেছিলো। এখন ঘনত্ব ও তাপ কমায় নিউট্রনগুলি অনেকটা সময় ধরে সংঘর্ষমুক্ত থাকতে লাগলো (—ইলেকট্রন-পজিট্রন তো প্রায় নেই—) এবং 15 মিনিট পরেই

প্রোটনে পরিণত হয়ে যেতে লাগলো।

কিন্তু আর একটু পরেই পরিস্থিতির এক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটলো। তাপমাত্রা আর একটু নামামাত্রই (পরিমাণটি একটু অনিশ্চিত) আর deuterium bottleneckটি রইলো না। দ্রুতগতিতে প্রথমে ডিউটেরিআম গড়ে উঠতে লাগলো। তার সঙ্গে কোথাও একটি নিউট্রন জুড়ে তিনগুণ ভরসম্পন্ন হাইড্রোজেন বা tritium (H^3) তৈরি হতে লাগলো, আর তার পরে আর একটি নিউট্রন জুড়ে পাকা হিলিআম-কেন্দ্রক (He^4 বা alpha particle) গড়ে উঠতে লাগলো। অথবা, ডিউটেরিঅমের সঙ্গে প্রথমে একটি প্রোটন জুড়ে তৈরি হলো হালকা হিলিআম (He^3), আর তাতে আবার একটি নিউট্রন জুড়ে কড়াপাকের হিলিআম He^4 গড়ে উঠতে লাগলো। তার মানে, এই অনুকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই cosmic soup-এর মধ্যে অবশিষ্ট সমস্ত নিউট্রনগুলিই thermonuclear প্রক্রিয়ায় হিলিআম কেন্দ্রকে পরিণত হয়ে গেলো।এই সময় তাপমাত্রা ছিলো 90 কোটি ডিগ্রির মতো। নিউট্রন ছিলো প্রায় 13 শতাংশ আর প্রোটন প্রায় 87 শতাংশ। এক একটি হিলিআম-কেন্দ্রকে থাকে দুটি নিউট্রন আর দুটি প্রোটন। সুতরাং ঐ 13 শতাংশ নিউট্রনের সবগুলিই যদি হিলিআমে পরিণত হয় তাহলে ওজন হিসাবে চারকণা-বিশিষ্ট হিলিআমের পরিমাণ হবে $13 \times 2 = 26$ শতাংশ, এবং এক-কণা-বিশিষ্ট হাইড্রোজেন হবে 74 শতাংশ। ঐ পর্যায়ে কণাদের ঘনত্ব যদি আর একটু বেশি থেকে থাকে, তাহলে হিলিআম গঠন প্রক্রিয়া আর একটু আগে শুরু হয়ে থাকবে। তখন নিশ্চয়ই নিউট্রনদের সংখ্যা একটু বেশি ছিলো, এবং ফলত উৎপন্ন হিলিআমের পরিমাণ হয়ে থাকবে 26 শতাংশের কিছু বেশি।

হিলিআমেই সৃষ্টির আদি পর্ব শেষ

কিন্তু হিলিআমের চেয়ে বেশি ভরের কোন উপাদান (যথা কার্বন বা অক্সিজেন) আর সৃষ্টির এই পর্যায়ে গঠিত হলো না। কী করে হবে? সমস্ত নিউট্রন তো হিলিআমে গাঁথা হয়ে গেছে। মুক্ত নিউট্রন আর একটিও নেই। আর হিলিঅমের সঙ্গে শুধু প্রোটনের পর প্রোটন জুড়ে তো আর নতুন উপাদান হতে পারে না। প্রকৃতিতে তেমন কোন উপাদানই নেই। হয়তো দুটি করে হিলিআম-কেন্দ্রক জুড়ে এক-একটি আট-কণার কেন্দ্রক সৃষ্টি করতে পারতো। কিন্তু প্রকৃতির জগতে আট-কণার কোন স্থায়ী পরমাণু-কেন্দ্রক হয় না।

সৃষ্টির এই নিদারুণ অগ্নিময় প্রত্যুষে তাই nucleosynthesis বা পরমাণু-কেন্দ্রকগঠন এই deuterium, He^3 আর He^4 রচনা পর্যন্তই অগ্রসর হতে পেরেছিলো। তাই মূলত হাইড্রোজেন আর হিলিআমই আমাদের বর্তমান তারকাময় বিশ্বলোকের সৃষ্টির আদি উপাদান।

কালক্রমে বিশ্বের তাপমাত্রা আরো নেমে আসার পর ইলেকট্রন-পজিট্রন ধ্বংসযজ্ঞ পেরিয়ে টিকে-থাকা "অল্পসংখ্যক" (আসলে অগণ্য কোটি) ইলেকট্রন হাইড্রোজেন ও হিলিআম কেন্দ্রকগুলির সঙ্গে জুড়ে neutral atom সৃষ্টি করতে লাগলো। সেই হলো cosmic soup-এর অবসানের পর্যায়। কারণ এখন থেকে বস্তুকণাগুলি রশ্মিকণাগুলি থেকে, অর্থাৎ matter radiation থেকে, বিযুক্ত (decoupled) হয়ে গেলো। দ্রুতপ্রসারী আলোকরশ্মিরা আর আগের মতন পদে পদে বস্তুকণাদের প্রকৃতি ও গতিকে প্রভাবিত করতে পারলো না। বিশ্বের ইতিহাসে রশ্মিপ্রধান (radiation-dominated) পর্বের অবসান হয়ে বস্তুপ্রধান (matter-dominated) পর্বের শুরু হল। Radiation-এর প্রভাবমুক্ত বস্তুকণাদের বিশেষ

গুণ—অভিকর্ষশক্তি—এবার ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠে ক্রমে ক্রমে ঘন থেকে ঘনতর গ্যাসগোলক, গ্যালাক্সি ও নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করতে লাগলো। এই নক্ষত্রদের কেন্দ্রগুলি আবার নিদারুণ তাপ ও চাপের অগ্নিকুণ্ড হয়ে 4-ভরের হিলিআম থেকে শুরু করে 238-ভরের ইউরেনিআম পর্যন্ত সমস্ত জটিল উপাদানগুলির সংশ্লেষ (synthesis) ঘটাতে লাগলো।

বিকিরণ-প্রধান পর্বের অবসান

রশ্মিপ্রধান থেকে বস্তুপ্রধান অবস্থায় উত্তরণের ব্যাপারটা একটু স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার। প্রশ্ন হচ্ছে, একটি বিশেষ পর্যায়ে বস্তুকণাদের মধ্যে না শক্তিকণাদের মধ্যে বিশ্বের অধিকাংশ শক্তি (energy) নিহিত রয়েছে? মোটের ওপর ধরা যায়, বিশ্বে 100 কোটি রশ্মিকণা পিছু একটি করে বস্তুকণা আছে। কিন্তু আইনস্টাইনের $E=mc^2$ সূত্রটি থেকে আমরা বুঝতে পারি, একটি প্রোটন বা নিউট্রনের ভরের মধ্যে বহু সহস্র গামারশ্মিকণার শক্তি জমাট বেঁধে আছে। সুতরাং রশ্মিকণারা (photons) সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও তাদের সামগ্রিক energy বেশি না হতেও পারে। মনে রাখতে হবে প্রোটন বা নিউট্রনের ভর, অর্থাৎ অন্তর্নিহিত শক্তি মোটের ওপর একই থাকে; কিন্তু বিভিন্ন অবস্থায় রশ্মিকণাদের শক্তির মধ্যে বিরাট তফাৎ হতে পারে।(Inverse Square law অনুযায়ী যে-কোনো বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের শক্তি শক্তি-উৎস থেকে এক মিটার দূরে যতটা থাকবে, তিন মিটার দূরে তার ন-ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে।)

বিশ্বতাত্ত্বিকদের অনুমান, আদি পর্যায়ে বিশ্বের তাপমাত্রা দশহাজার কোটি ডিগ্রি (100 billion degrees) কেলভিন থেকে শুরু করে আনুমানিক সাত লক্ষ বছর ধরে 4000 ডিগ্রিতে নেমে আসে। স্বভাবতই এই হিসাবের কিছুটা হেরফের দেখা যায়। কোনো কোনো আধুনিক পরিমাপমতে তাপমাত্রা তিন লক্ষ বছর ধরে 3000 ডিগ্রিতে এসে দাঁড়ায়—যে পরিমাপ অনুযায়ী বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল 1000 থেকে 2000 কোটি বছর আগে। আদিপর্বের এই নিদারুণ তাপমাত্রায় রশ্মিকণাগুলির energy ছিল বহু বহু গুণ বেশি। তার ফলে বিশ্বের অধিকাংশ শক্তিই রশ্মিজগতের মধ্যেই নিহিত ছিল; বস্তুকণাদের শক্তিভাগ ছিল নগণ্য। কিন্তু বিশ্ব যতই স্ফীত হতে লাগলো, তাপমাত্রা ততই কমতে লাগলো এবং রশ্মিদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ততই বেড়ে যেতে লাগলো—অর্থাৎ তাদের শক্তি কমে যেতে লাগলো। এইভাবে তাপমাত্রা যখন আনুমানিক 4000° ডিগ্রিতে নেমে এলো তখনই রশ্মির প্রাধান্যের যুগ শেষ হল। তখন থেকে বস্তুকণাদের মধ্যেই বিশ্বের অধিকাংশ শক্তি সংগৃহীত। এখন আমরা matter-dominated universe-এ বাস করি।



পাঁচ

"শাশ্বত বিশ্ব" তত্ত্বের আবির্ভাব : মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের বিরোধিতা

আইনস্টাইন স্বপ্ন দেখেছিলেন এক অপরিবর্তিত, চিরস্থিত বিশ্বের—যে বিশ্ব বহু বিচিত্র আভ্যন্তরীণ গতি সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে অচঞ্চল। সে স্বপ্ন সফল হয়নি। কিন্তু তা বলে ঐ স্বপ্নের আকুতি মানুষের মন থেকে অন্তর্হিত হয়নি। পরিবর্তমান অথচ চির-অপরিবর্তিত বিশ্বলোকের যে চিত্রগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দারুণ ধ্বংসলীলার পরে বিজ্ঞানীদের মনে আবির্ভূত হলো তার পিছনে হয়তো বিজ্ঞানীদের অগোচরেই সেই দীর্ঘদিনের স্বপ্নের রেশ কিছুটা কাজ করেছিলো।

এ ছাড়াও দুটি ব্যাপারে মহাবিস্ফোরণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞানীদের মনে গুরুতর অসন্তোষ ছিল। প্রথমত, জন্মমুহূর্তটির কোন ব্যাখ্যা নেই। বিস্ফোরণের আগের অবস্থায় বিন্দুবৎ বিশ্বের ঘনত্ব ছিল অসীম এবং ব্যাপ্তি ও বয়স দুই-ই ছিল শূন্য। এই singularity-র অবস্থা, যার থেকে বিশ্বের তাৎক্ষণিক জন্ম, তাকে পদার্থবিদ্যার কোন সূত্রই ব্যাখ্যা করতে পারে না। এই চিন্তা তাই অনেক নতুন প্রশ্নের এবং অনেক বিকল্প চিন্তার উদ্রেক করেছিলো।

দ্বিতীয়ত, Hubble's law এবং Hubble's constant *(H)*, অর্থাৎ দূরের গ্যালাক্সিদের আলোর red-shift-এর পরিমাপ অনুযায়ী তাদের দূরত্ব এবং অপসারণ-বেগ (receding velocity) নির্ধারণের পদ্ধতি কতটা সঠিক সে-সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। H-এর মূল্য, অর্থাৎ বিশ্ব-পরিসরের প্রসারণের হার সম্বন্ধে ধারণা, কেবলই বদলে যাচ্ছিল। প্রথমে হাবল্ H-এর যে মান (value) ধরেছিলেন সে-অনুযায়ী বিশ্বের বয়স দাঁড়ায় মাত্র 200 কোটি বছর। অথচ জ্যোতির্বিদ্যা এবং ভূতত্ত্ব দুই-ই বলছে যে পৃথিবীর এবং সৌরজগতের বয়স 400 কোটি বছরের কম নয়। তাহলে কি বিশ্বের বয়স সৌরমণ্ডলের বয়সের চেয়ে কম? অবশ্য 1948 নাগাদ H-এর হিসাব বদলে গিয়ে বিশ্বের বয়সের হিসাব দাঁড়ালো 1,000 কোটি বছরের মতো। (এখনকার ধারণায় 1500 কোটি থেকে 2000 কোটি বছরের মধ্যে।)

এ-ছাড়াও হাবল্-এর পরিমাপসূত্রের সঙ্গে আরো একটা অনিশ্চয়তা জড়িয়ে ছিল এবং এখনো আছে। Big Bang-এর মুহূর্তে থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বপরিসরের প্রসারণবেগ তো কিছুটা প্রশমিত হওয়ার কথা—মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে। এই মন্থরায়নের হারটি (deceleration parameter বা q_0) কী পর্যায়ের? সেটা সঠিকভাবে জানার উপায় নেই, কারণ বিশ্বে বস্তুর গড় ঘনত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আজও অস্পষ্ট। অথচ এই ক্রম-মন্থরায়নের সঙ্গে সঙ্গে হাবল্-এর ধ্রুবকের মূল্যও পরিবর্তিত হওয়ার কথা। মন্থরায়ন-হার বা q_0 বেশি হলে

প্রসারণ-হার বা H সেইমতো কম হবে। সুতরাং Hubble's constant -এর মূল্য বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে একটু অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

বিশ্বের আকার ও বয়স সম্বন্ধে ধারণার এই অনিশ্চয়তা অনেক বিজ্ঞানীর মনে গভীর সংশয়ের সৃষ্টি করে আর তার ফলে নতুন এবং সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের এক চিন্তাধারার উদ্রেক হয়। এই বিকল্প তত্ত্বগুলির মধ্যে যেটি প্রধান, আমরা এখানে মূলত সেটিরই উল্লেখ করবো।

তিনজন ইংরেজ বিজ্ঞানী, বন্‌ডি (Hermann Bondi), গোল্‌ড্ (Thomas Gold) ও হইল্ (Fred Hoyle) 1948 সালে Steady State Theory-টি উপস্থাপিত করেন *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*-র 108 খণ্ডে। কিন্তু প্রথমে বন্‌ডি ও গোল্‌ড্ তত্ত্বটিকে পরিবেশন করেন একভাবে (252-270 পৃষ্ঠায়), এবং তার একটু পরেই (372 পৃঃ) হইল্ স্বতন্ত্রভাবে তত্ত্বটি তুলে ধরেন একটু অন্যভাবে।

বন্‌ডি ও গোল্‌ড্ বলেন: মহাবিস্ফোরণতত্ত্বের সমর্থকরা বিশ্বকে পরিবর্তনশীল বলে দেখান। অথচ বিশ্বের সুদূর শৈশবকালের যে নিশানাগুলি আমরা বহুদূরের গ্যালাক্সিগুলি থেকে পাই, সেগুলিকে তাঁরা ব্যাখ্যা করেন এখনকার বিশ্বের পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলি দিয়ে। কী করে তাঁরা জানলেন, বিশ্বের আদিযুগেও ঐ নিয়মগুলিই কার্যকরী ছিলো? "বিশ্ব" বলতে যদি সমস্ত অস্তিত্বের সমষ্টি বোঝায়, তাহলে physics-এর নিয়মগুলিও তার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। বিশ্ব যদি পরিবর্তিত হয়, তাহলে physics-এর নিয়মগুলিও পরিবর্তিত হওয়ার কথা। Physics-এর নিয়মগুলি অপরিবর্তিত থাকতে পারে একমাত্র এমন এক বিশ্বে যে-বিশ্ব নিজেই (সামগ্রিকভাবে) পরিবর্তনহীন।

চিরস্ফীত অথচ চিরস্থিত বিশ্বের ছবি

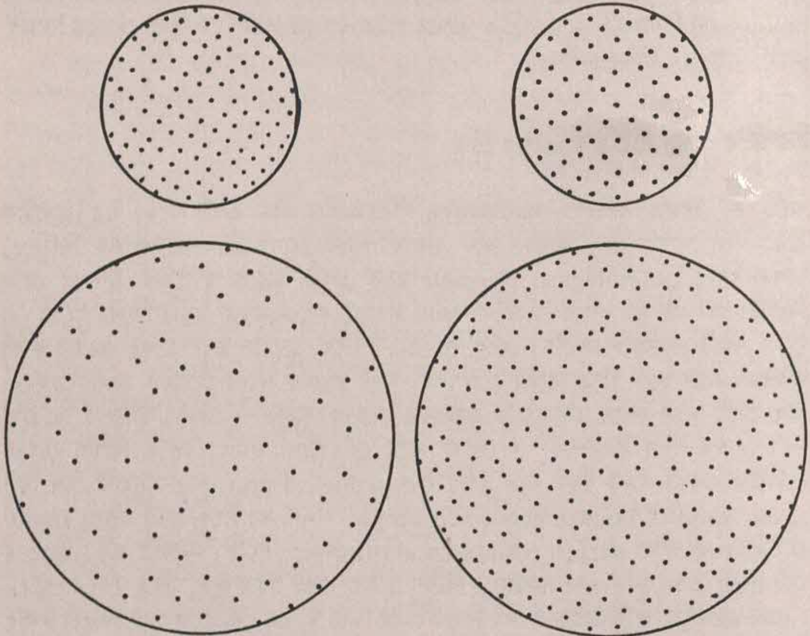
বন্‌ডি ও গোল্‌ড্ বললেন, সামগ্রিকভাবে পরিবর্তনহীন এমন একটি বিশ্বের চিত্র বৈজ্ঞানিক চিন্তা দিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব। মনে থাকতে পারে (হাবল্-এর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে) বিশ্বতাত্ত্বিকরা cosmological principle বলে একটি সূত্রকে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। এই সূত্র বলছে যে বিশ্বের সুদীর্ঘ ইতিহাসের যে-কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে (বা যুগে) একটি জায়গা (গ্যালাক্সি) থেকে যে-কোনো দিকে তাকালে সবদিককেই মোটের ওপর একরকম মনে হবে। কিন্তু বিশ্বের 100 কোটি বছর বয়সের সময়ে চারিদিক যেমন দেখাবে, 500 কোটি বছর বয়সে তার থেকে অন্যরকম দেখাবে। বন্‌ডি ও গোল্‌ড্ বললেন, তা ঠিক নয়। বিশ্বের বয়স-নির্বিশেষে, যে-কোনো যুগে যে-কোনো জায়গা থেকে বিশ্বের চেহারা (মোটের ওপর) একই রকম মনে হবে। Cosmological principle অনুযায়ী বিশ্ব ছিল space-এর ক্ষেত্রে homogeneous ও isotropic, অর্থাৎ সব দিকে একই রকম। Bondi ও Gold-এর নতুন perfect cosmological principle (PCP) অনুযায়ী শুধু space-এ নয়, time-এও (সর্বত্র এবং সর্বকালে) বিশ্বের চেহারা একই রকম ছিল, আছে এবং থাকবে।

এর মানে কি আইনস্টাইনের সেই নিশ্চল বিশ্বে ফিরে যাওয়া? না, তার আর কোনো উপায় ছিল না। কারণ মহাকায় টেলিস্কোপগুলির এবং অতিসূক্ষ্ম বর্ণালি-বিশ্লেষণের (spectrography-র) মাধ্যমে গ্যালাক্সিদের দূরাপসরণের ব্যাপারটি তখন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। না, Bondi-Gold-এর বিশ্বটিও চিরপ্রসারণশীল— এদিক দিয়ে Big Bang

বিশ্বের মতোই। কিন্তু তাহলে প্রসারণটা হচ্ছে কী করে? এই শাশ্বত বিশ্ব (Steady State Universe) যদি একটা বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্ট না হয়ে থাকে, তাহলে প্রসারণের গতিটা এলো কোথা থেকে? মজার ব্যাপার, এই স্বতঃপ্রসারণের ব্যাপারটিকে আনার জন্য Bondi-Gold ফিরে গেলেন সেই 1917-র ডি-সিটার বিশ্ব-মডেলে—যাতে বস্তুর ঘনত্ব অত্যন্ত অল্প হওয়ায় আইনস্টাইন-কল্পিত মহাবিকর্ষণশক্তি (lambda force) মহাকর্ষ (G-force)-কে পরাজিত করে বিশ্বকে এক চিরপ্রসারণের পথে ধাবিত করে। Steady State বিশ্বেও গ্যালাক্সিগুলি ক্রমশই পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু তাহলে তো মাঝখানের ফাঁকগুলো বেড়ে যাবে, আর বিশ্বের সামগ্রিক চেহারা বদলে যাবে। তাহলে সে-বিশ্বকে চিরস্থিত বা সমভাবাপন্ন বলার অর্থ কী?

শূন্য থেকে নতুন বস্তুর উদ্ভব?

অর্থ আছে—এবং এখানেই আর একটি চমকপ্রদ ধারণার আবির্ভাব। গ্যালাক্সিগুলি (ঠিকভাবে ধরলে বোধহয় বলা উচিত গ্যালাক্সিপুঞ্জগুলি) পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাওয়ায়



চিত্র 23

বাঁদিকে Big Bang বিশ্বের এবং ডানদিকে Steady State বিশ্বের চিত্র। Big Bang-এর ক্ষেত্রে প্রসারণের ফলে গ্যালাক্সিদের মধ্যেকার ফাক বেড়ে যাচ্ছে। Steady State-এ প্রসারণজনিত ফাঁক নতুন গ্যালাক্সিতে ভরে উঠছে। তাই সামগ্রিক চেহারা একরকমই থাকছে।

মাঝখানে যে-সব বিরাট-বিরাট ফাঁক সৃষ্টি হচ্ছে তা ধীরে ধীরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভরে উঠছে নতুন বস্তুপুঞ্জ, নতুন গ্যালাক্সি দিয়ে। কোথা থেকে এই বস্তু আসছে? এই বস্তুপুঞ্জ শূন্য পরিসর (empty space) থেকে সৃষ্টি হচ্ছে অত্যন্ত মন্থরগতিতে—হাইড্রোজেন পরমাণুর আকারে। বনডি-গোল্ডের হিসাব অনুযায়ী প্রতি তিন লক্ষ বছরে প্রতি ঘন মিটার পরিসরে একটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু শূন্যতার গর্ভ থেকে (ex nihilo) বিশ্বক্ষেত্রে আবির্ভূত হচ্ছে। মনে হতে পারে, ঐ সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অসম্ভব রকমের মন্থর। কিন্তু বিশ্ব-পরিসরের প্রসার এমনই অকল্পনীয় রকমের বিপুল যে ঐ হারেও কয়েকশো কোটি বছরে পাঁচ-দশ কোটি ঘন-আলোকবর্ষ (cubic light years) জুড়ে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন পরমাণু তৈরি হবে তার থেকে এক ঝাঁক নতুন গ্যালাক্সি গড়ে ওঠা সম্ভব। পুরোনো গ্যালাক্সিগুলি ক্রমশই ছড়িয়ে পড়বে, তাদের আলো ক্রমশই লালচে হয়ে উঠবে। আর বেড়ে-ওঠা ফাঁকগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে শূন্যের গর্ভ থেকে জেগে উঠবে তরুণ নীলাভ তারায় ভরা নতুন-নতুন গ্যালাক্সি। সেগুলোও আবার কালক্রমে ছড়িয়ে পড়বে, আর সেই সব ফাঁক ভরে দেবে শূন্যগর্ভ থেকে জেগে-ওঠা আরো নতুন সব গ্যালাক্সি। বিশ্বলোক অবিশ্রান্তভাবে প্রসারিত হতেই থাকবে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিশ্বপটটি একই রকম থেকে যাবে। অতীতেও বিশ্ব এই রকমই ছিল। দশ হাজার বা কয়েকশো কোটি বছর আগেও বিশ্বের চেহারাটি যে-কোন জায়গা থেকে ঠিক এই রকমই দেখাতো এবং সুদূর ভবিষ্যতের যে-কোনো সময়েও এই রকমই দেখাবে। অর্থাৎ এই বিশ্বের প্রসার এবং বয়স দুই-ই অসীম। কোনো দিন এর সৃষ্টি হয়নি : এ চিরদিনই ছিল, এবং চিরদিনই থাকবে। নিরন্তর পরিবর্তনের মাঝে এই বিশ্ব পরিবর্তনহীন।

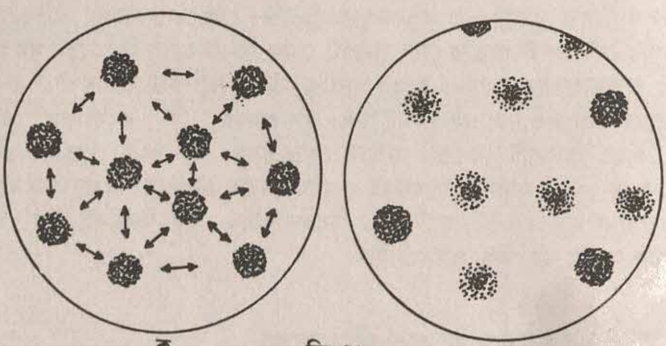
ফ্রেড হইল্ : নতুন বস্তু সৃষ্টির অভাবনীয় ব্যাখ্যা

কিন্তু এই সমভাবাপন্ন বিশ্বচিত্র সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি ছিল এই যে শূন্য থেকে বস্তুর উৎপত্তি পদার্থবিদ্যার একটি মূল সূত্র, বস্তু-শক্তির অক্ষয়ত্ব-সূত্রকে (law of conservation of matter-energy-কে) লঙ্ঘন করে। Bondi ও Gold এই আপত্তির উত্তরে কোনো স্পষ্ট যুক্তি দিতে পারেননি। তাঁদের মূল যুক্তি ছিল, এই একটানা সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে মেনে না নিলে বিশ্বের চিরস্থিত অবস্থাকে দাঁড় করানো যায় না।

Bondi ও Gold-এর তত্ত্ব-পরিবেশন শেষ হতে না হতেই বিশ্বতত্ত্ব-রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন এক রোমাঞ্চকর ব্যক্তিত্ব, Fred Hoyle। তিনি Steady State তত্ত্বটিকে একটু অন্যভাবে উপস্থাপিত করলেন— এমনভাবে যে তার মধ্যে তিনি ঐ একটানা-বস্তুসৃষ্টির (continuous creation of matter-এর) একটি অত্যাশ্চর্য গাণিতিক ব্যাখ্যা দিলেন। (বহু পণ্ডিত হইল্-এর অনেক বিখ্যাত গবেষণার মধ্যে এইটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন।)

বস্তু ও শক্তির সামগ্রিক পরিমাণ অপরিবর্তনীয়—এই সূত্রটিকে লঙ্ঘন না করতে হলে ধরে নিতে হয় বিশ্বে শক্তির একটি প্রচ্ছন্ন ক্ষেত্র আছে, যার থেকে ঐ নতুন বস্তু রূপান্তরণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু তাতে যে হিসেব মেলে না। কারণ, যতই বস্তু তৈরি হবে ততই তো ঐ শক্তি-উৎসটি (energy reservoir) ক্ষীণ হয়ে পড়বে। তাহলে চিরকাল সমান তালে তার থেকে বস্তুকণা সৃষ্টি হবে কী করে? তাছাড়া, বিশ্ব-পরিসরের সঙ্গে শক্তি-উৎসটিও তো প্রসারিত হচ্ছে, অর্থাৎ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে!

এই বাধাটিকে অতিক্রম করার জন্য হইল্ একটি নেগেটিভ শক্তি-উৎসের (negative energy field-এর) অবতারণা করলেন। ধরা যাক, ঐ নেগেটিভ শক্তি-উৎসে এখন প্রতি ঘন-মিটার space-এ রয়েছে −10 শক্তি-একক। প্রতি ঘন-মিটার পরিসর থেকে যদি এক একক (+1 unit) বস্তু সৃষ্টি হয় তাহলে শক্তি-উৎসটিতে শক্তির পরিমাণ কত দাঁড়াচ্ছে? −11 একক। কারণ ক্ষেত্র থেকে একটি পজিটিভ unit বেরিয়ে যাওয়ার ফলে negative unit-এর সংখ্যা একটি বেড়ে গেল। তাহলে কি প্রতিবার বস্তুসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নেগেটিভ শক্তি-উৎস প্রবলতর হয়ে ওঠে? না। কারণ, ঐ যে শক্তি-উৎসটির মান −10 থেকে −11-এ উঠে এলো, সেটি কিন্তু বিশ্বের প্রসারণের দরুন আবার −10-এই নেমে আসবে। এইভাবে Steady State মডেলের বিশ্বে সৃষ্টি এবং প্রসারণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে।



ক চিত্র 24 খ

শূন্য থেকে বস্তুর উদ্ভব। (ক) Steady State তত্ত্ব অনুযায়ী প্রসারমান বিশ্বপরিসরে গ্যালাক্সিগুলি ছড়িয়ে পড়ছে। (খ) মাঝখানের ফাঁকগুলিতে Hoyle-কল্পিত C-field থেকে নতুন বস্তুকণা জেগে উঠে কালক্রমে নতুন-নতুন গ্যালাক্সি সৃষ্টি করছে।

হইল্ এই বস্তুসৃষ্টিকারী নেগেটিভ শক্তি-উৎসটির নাম দেন C-field, এবং এটিকে তিনি আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রগুলির সঙ্গে যুক্ত করে নেন—আইনস্টাইন নিজেই যেমন তাঁর 1915-র প্রথমবারের সমীকরণগুলির সঙ্গে মহাবিকর্ষণশক্তির সূচক lambda term-টিকে অভিযোজিত করে নিয়েছিলেন। এইভাবে হইল্ Steady State তত্ত্বটিকে একটি অভিনব গাণিতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন।

সাধারণ মানুষের কল্পনাদৃষ্টিতে এই প্রসারণশীল অথচ চিরস্থিত বিশ্বচিত্রটির একটি সৌন্দর্য-আবেদন আছে। তাছাড়া বিজ্ঞানীদের চোখে এর একটি বিশেষ গুণ ছিল। Big Bang তত্ত্বে বিশ্বের জন্মমুহূর্তটি রহস্যাবৃত। বিস্ফোরণের ঠিক আগের মুহূর্তের যে বিন্দুবৎ অবস্থা (singularity) তাকে কোন নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। Steady State তত্ত্বের অজাত এবং অপরিবর্তিত বিশ্বে জন্মের কোন ব্যাপারই নেই।



ছয়

রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকাশ : মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের চমকপ্রদ অগ্রগতি : "শাশ্বত বিশ্ব" ক্রম-নিষ্প্রভ

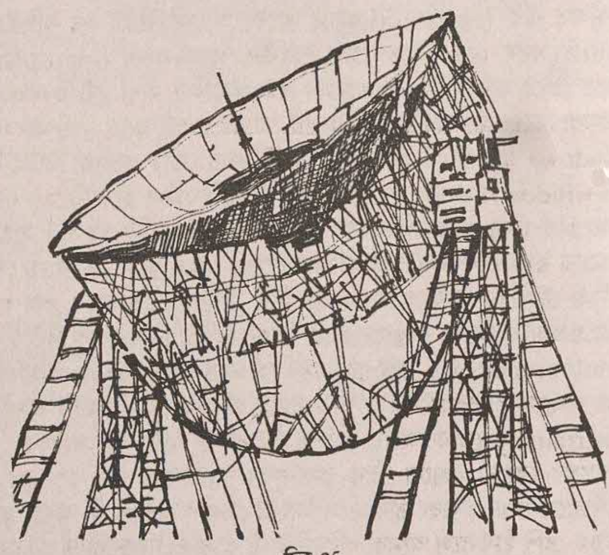
আমরা জানি, রেডিও-তরঙ্গ একধরনের লম্বা-ঢেউয়ের অদৃশ্য আলো। দৃশ্য আলোর বর্ণালীর প্রান্তে অবস্থিত লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। তার চেয়েও বেশি infrared বা তাপরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য। তার চেয়েও একটু বেশি microwave-এর। তার চেয়েও বেশি দৈর্ঘ্য রেডিও-তরঙ্গের (1 cm. থেকে শুরু করে বহু হাজার মিটার পর্যন্ত)। বহির্বিশ্ব থেকে যত রশ্মি (radiation) আসে তাদের অধিকাংশকেই হয় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল শোষণ (absorb) করে নেয় নয়তো তারা পৃথিবীর আয়ন-মণ্ডল (ionosphere) থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের এই দেয়ালের মধ্যে দুটি জানালা আছে যার মধ্যে দিয়ে আমরা বিশ্বের নানারকমের খবর পাই তাদের একটি হচ্ছে দৃশ্য-আলোর বর্ণালি (optical window) আর অন্যটি হচ্ছে $^1/_{100}$ সেন্টিমিটার থেকে পনেরো মিটার দীর্ঘ রেডিও তরঙ্গ (radio window)। এগুলি শোষিতও হয় না, প্রতিফলিত হয়ে ফিরেও যায় না। তার চেয়ে বড় তরঙ্গগুলি কিন্তু প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। কৃত্রিম উপগ্রহগুলি সৃষ্টি হবার পর অবশ্য বায়ুমণ্ডলের বাধা বেশ কিছুটা অপসারিত হয়েছে। তার ফলে মহাশূন্যস্থ (অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়) রেডিও-টেলিস্কোপগুলিতে এখন অতিদীর্ঘ রেডিও-তরঙ্গসমূহও ধরা পড়ছে। শুধু তাই নয়, উপগ্রহে বসানো বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্বের বিভিন্ন উৎস থেকে বিকীর্ণ অতিবেগুনি রশ্মি (ultraviolet radiation), এক্স-রে, এমন কি গামা রশ্মির স্রোতও আহরিত ও বিশ্লিষ্ট হচ্ছে এবং তার মাধ্যমে বিশ্বের প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ক্রমশই প্রসারিত হচ্ছে।

Radio astronomy থেকে আমরা বিশেষ কী সুবিধা পাই? খুব সংক্ষেপে বলা যাক। প্রথমত, মহাকাশের কোনো কোনো দিকে কৃষ্ণ-ধূসর ধূলিমেঘের পুঞ্জ ওপারের আলো-কে টেলিস্কোপে পৌঁছাতে দেয় না এবং তার ফলে আমরা সে-সব অঞ্চলে কী আছে জানতে পারি না। রেডিও-তরঙ্গ বেশি দীর্ঘ বলে অনেক পরিমাণেই ঐ ধূলোর মেঘগুলোকে অতিক্রম করে ঐ মেঘলোকের ওপারের জগতের বার্তা আমাদের কাছে বয়ে নিয়ে আসে। ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত আমাদের ছায়াপথ-গ্যালাক্সির যে রহস্যময় কেন্দ্রস্থলটি, সেটির অবস্থান ধনুরাশি (Sagittarius) আকাশের যেদিকে আছে সেই দিকে—অবশ্য ধনুরাশির নক্ষত্রগুলি থেকে বহু বহু দূরে। কিন্তু মাঝখানে ভেসে-থাকা ধুলোর মেঘের জন্য তার চেহারা বা প্রকৃতি বহুদিন আমাদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। রেডিও টেলিস্কোপের আবিষ্কারের পর

থেকেই আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রস্থল সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হতে শুরু হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, রেডিও টেলিস্কোপ মহাকাশে এমন অনেক জিনিস আবিষ্কার করতে লাগলো যেগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে রেডিও-বিকিরণ আসতে থাকে, কিন্তু সেগুলো থেকে দৃশ্য আলো খুবই কম আসে বলে আমরা আগে তাদের অস্তিত্বের কথাই জানতাম না। আবার এমন অনেক তারা বা গ্যালাক্সি পাওয়া গেছে, শুধুমাত্র দৃশ্য আলোর বিকিরণ থেকে যাদের বেশ ক্ষীণ মনে হয়েছে, কিন্তু পরে যাদের থেকে বিপুল পরিমাণ রেডিওরশ্মির সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলিকে radio star, radio galaxy ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিশ্বের যে-সব বস্তু বা যে-সব ব্যাপার দৃশ্য-আলোয় অদৃশ্য, তাদের উপস্থিতির বার্তা এবং তাৎপর্যের আভাস আমরা radio astronomy-র মাধ্যমে বেশ কিছুটা পাই।

Radio astronomy-র আর একটি বিরাট অবদান হচ্ছে মহাশূন্যের স্থানে স্থানে অতিক্ষীণভাবে পরিব্যাপ্ত atomic hydrogen (ইলেকট্রনযুক্ত পারমাণবিক হাইড্রোজেন) থেকে বিকীর্ণ 21-সেন্টিমিটার রেডিওতরঙ্গের বৈপ্লবিক আবিষ্কার। বিশ্বের আদিতম পারমাণবিক উপাদান এই হাইড্রোজেনের অবস্থিতি থেকে বিজ্ঞানীরা আমাদের ছায়াপথ-গ্যালাক্সির বিভিন্ন অঞ্চলের, এমন-কি সমগ্র গ্যালাক্সির মানচিত্র রচনার কাজে বহুদূর এগিয়ে গেছেন। এও জানা গেছে যে আমাদের কাছাকাছি গ্যালাক্সিগুলি ঐরকম অতিক্ষীণ হাইড্রোজেনের সেতুদ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।



চিত্র 25

Jodrell Bank-এর radio telescope

(প্রসঙ্গত, আমাদের জানা উচিত, বেতার-জ্যোতির্বিদ্যার বিকাশে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চাশের দশকে ম্যাঞ্চেস্টার-এর Jodrell Bank-এ গবেষণা করে মৃণালকুমার দাশগুপ্ত ও আর· সি· জেনিসন্ (R. C. Jennison) radio intensity

interferometer নামক একটি সূক্ষ্ম কৌশল উদ্ভাবন করেন যার মাধ্যমে দূর মহাকাশে অবস্থিত কোনো রেডিও-উৎসের ব্যাস এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার বিচিত্র যুগ্ম আকৃতি (dual বা double structure) সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়। গোবিন্দ স্বরূপ ও মুকুলরঞ্জন কুণ্ডুর সৌর রেডিও-তরঙ্গউৎস বিষয়ক গবেষণা এবং টি·কে·মেননের 21-সে·মি· তরঙ্গের মাধ্যমে Milky Way-র গঠন সম্পর্কে গবেষণাও তাৎপর্যপূর্ণ। অশেষপ্রসাদ মিত্র, পি· পার্থসারথি, টি· কৃষ্ণন এবং ডি· রাধাকৃষ্ণনের অবদানও উল্লেখযোগ্য। ভারতে এখন বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে রেডিও অ্যাস্ট্রনমির ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা চলছে।)

বেতার-জ্যোতির্বিদ্যার যে তৃতীয় অবদানটির কথা আমরা এবার বলবো সেটি বিশ্বতত্ত্ব-আলোচনার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মোটামুটি সাত রকমের যে দৃশ্য-আলো মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু থেকে আসে, সেগুলির আপেক্ষিক তীব্রতা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরকম হয়। বিশেষত, আলোক-উৎসটি (যেমন, একটি গ্যালাক্সি) যত দূরস্থিত, তার আলো তত লোহিতায়িত বা লোহিতাপসৃত (red-shifted) হয়ে ক্ষীণতর হয়ে দেখা দেবে। রেডিওতরঙ্গের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় (কোন বস্তু থেকে আসা) নানারকম wave-length-এর রেডিও-তরঙ্গের তীব্রতার হেরফের ততটা হয় না। অর্থাৎ বিশ্বের প্রসারণজনিত লোহিতায়নের (তরঙ্গের দীর্ঘায়নের) ফলে দূর পদার্থ থেকে আসা দৃশ্য আলো যতটা ক্ষীণ হয়ে আসবে, ঐ উৎসেরই রেডিও-তরঙ্গ ততটা ক্ষীণ হয়ে পড়বে না। তার মানে বিশ্বের বহুদূরের অঞ্চলগুলি থেকে আমরা দৃশ্য আলোর চেয়ে রেডিও-তরঙ্গ বেশি সংগ্রহ করতে পারবো—যার ফলে দৃশ্য আলোর টেলিস্কোপের চেয়ে রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে বিশ্বের আরো বেশি দূর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। Van-de Hulst এবং Jan Oort 1945 সালে প্রথম এই আশা প্রকাশ করেন যে রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে আমরা বিশ্বের সুদূর অতীতকে পর্যবেক্ষণ করে তাকে বিশ্বের বর্তমান পর্যায়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারবো, এবং তার থেকে হয়তো বোঝা যাবে বিভিন্ন বিশ্ব-মডেলগুলির মধ্যে কোনটি কতটা ঠিক। এই চিন্তাটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা শীঘ্রই বুঝতে পারবো।

Steady State তত্ত্বের উপর প্রথম সন্দেহের ছায়াপাত

বিশ্বলোক জন্মমুহূর্ত থেকে প্রসারিত হয়ে চলেছে, এটা যদি ঠিক হয় তাহলে বলতে হবে বহুদূরের কোনো গ্যালাক্সিকে দেখা মানেই বিশ্বের এক অতীত পর্যায়ে ফিরে যাওয়া। সুপরিচিত Great Andromeda Galaxy M-31-এর কথা ধরা যাক। ওটি রয়েছে 22 লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে। অর্থাৎ ওটি থেকে এখানে আসতে আলোর 22 লক্ষ বছর লাগে। তার মানে, আমরা আজ যে-আলোয় M-31-কে দেখছি সেই আলো ওখান থেকে রওনা হয়েছিল 22 লক্ষ বছর আগে। অর্থাৎ M-31-এর আজকের ওই শুভ্র ডিম্বাকার চেহারাটি তার 22 লক্ষ বছর আগেকার চেহারা। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে যখনই আমরা M-31-কে দেখছি তখনই আমরা বিশ্বের ইতিহাসের 22 লক্ষ বছর আগেকার এক পর্বে ফিরে যাচ্ছি। Canes Venatici মন্ডলের ভিতর দিয়ে দৃশ্যমান M-51 গ্যালাক্সিটি প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে। অর্থাৎ ওটিকে যখন আমরা দেখছি তখন এক কোটি বছরেরও বেশি আগেকার বিশ্বের একটি জিনিসকে আমরা দেখছি। অর্থাৎ মহাকাশে যত বেশি দূরে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি ততই আমরা বিশ্বের আগেকার আমলের অর্থাৎ তার তরুণতর অবস্থার পরিচয় পাচ্ছি। (পক্ষান্তরে

বিশ্বের যে গ্যালাক্সি যত কাছে সেটি তত একালের অর্থাৎ তত কম পুরোনো।) তবে যতই বেশি-বেশি দূরে আমরা (টেলিস্কোপ দিয়ে) তাকাই ততই বস্তুগুলির উজ্জ্বলতা কম মনে হয়। এটা হয় (i) দূরত্বের জন্য আলো ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার ফলে, আর (ii)বিশ্ব-পরিসরের প্রসারণের দরুন আলোর লোহিতায়ন (red-shift) এবং ক্ষীণায়নের জন্যে।

তা যদি হয়, আমরা যতই দূরে তাকাবো, আলোক-উৎস রেডিও-উৎস সবই ক্ষীণতর মনে হতে থাকবে। কিন্তু পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেল ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। দৃষ্টিকে আমরা বিশ্বের গভীরে প্রসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য আলোর উৎসগুলি অবশ্য ঠিক প্রত্যাশিত হারেই ক্ষীণতর দেখাচ্ছে এবং সংখ্যায় কম মনে হচ্ছে; কিন্তু রেডিও-উৎসগুলির ঔজ্জ্বল্য বা তাদের সংখ্যা ঠিক ঐ হারে কমছে না। অর্থাৎ আমরা যেন বিশ্বের দূরের অঞ্চলগুলিতে কাছের অঞ্চলগুলির চেয়ে বেশি-বেশি রেডিও-উৎসের উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি; কিম্বা দূরের ঐ রেডিও-উৎসগুলি কাছের উৎসগুলির চেয়ে বেশি উজ্জ্বল। আমরা জানি, বিশ্বের দূর অঞ্চল মানেই বিশ্বের আগেকার যুগ। সুতরাং উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে রাইল্ (Martin Ryle) 1958 সালে এই মত প্রকাশ করেন যে আগেকার যুগের বিশ্বে এখনকার চেয়ে বেশিসংখ্যক অথবা বেশি উজ্জ্বল রেডিও-উৎস ছিল।

শাশ্বত বিশ্ব (Steady State Universe) মতবাদ অনুযায়ী বিশ্বের কোনো "তরুণতর অবস্থা" থাকা সম্ভব নয়, কারণ চিরকালই বিশ্বের একই রূপ। এখানে দুটি তত্ত্বের মধ্যে কোনটি ঠিক তা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নির্ণয় করার সম্ভাবনা আছে। Steady State অনুযায়ী দূরের বা অতীতের "আকাশ" এবং কাছের বা বর্তমানের "আকাশ" একই রকম দেখাবে। আর মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব (Big Bang Theory) অনুযায়ী দূরের "আকাশ" বিশ্বের অল্পবয়সের রূপ বলে কাছের "আকাশের" থেকে আলাদা দেখাবে।

তা যদি হয় তাহলে বলতে হয় সমভাবাপন্ন বিশ্বের যে তত্ত্বটি Bondi, Gold ও Hoyle উপস্থাপিত করেছিলেন তার সঙ্গে পর্যবেক্ষণের ফল মিলছে না। কারণ দূরের (বা অতীতের) বিশ্ব আর কাছের (বা বর্তমানের) বিশ্বের মধ্যে রেডিও-উৎসের এই তারতম্য থেকে মনে হয় বিশ্ব আগেকার অবস্থা থেকে বদলে গেছে। অর্থাৎ বিশ্ব চিরসম নয়; পরিবর্তনশীল ও বিবর্তমান।

Quasar আবিষ্কার: Steady State তত্ত্বের দ্বিতীয় বিপর্যয়

1958 সালেই মার্টিন রাইল্ এমন কতকগুলি বিন্দুবৎ রেডিও-তরঙ্গউৎস বা radio star-এর কথা বলেন যেগুলো তাঁর ধারণায় ছায়াপথের বাইরে দূর মহাশূন্যে অবস্থিত। W Baade, R. Minkowski, T. Matthews, A. Sandage প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ক্রমশই ধরা পড়তে লাগলো যে ঐরকম প্রত্যেকটি রেডিও-উৎসের অবস্থানবিন্দুতে দৃশ্য-আলোর টেলিস্কোপ (optical telescope) ফেলে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে হয় একটি বহুদূরের গ্যালাক্সিকে, নয়তো একটি গ্যালাক্সির চেয়ে অনেক ছোট, অনেকটা তারার আকৃতির একটি বস্তুকে।

এই বহুদূরের নক্ষত্রবৎ বস্তুগুলির প্রকৃতি নিয়ে 1962 থেকে 1973 পর্যন্ত প্রবল বিতর্ক চলে। এইরকম একটির পর একটি quasi-steller radio source বা নক্ষত্রসদৃশ রেডিও-উৎস আবিষ্কৃত হতে লাগলো। পরে যখন দেখা গেল এগুলি থেকে বিপুল পরিমাণ দৃশ্য আলো এবং এক্স-রেও আসে তখন এদের নতুন নাম হলো quasi-stellar obiect

(নক্ষত্রসদৃশ বস্তু) বা QSO—চলতি ভাষায় কোয়েসার (quasar)। এই কোয়েসারগুলির আলোয় এত অদ্ভুত রকমের বেশি red-shift দেখা যেতে লাগলো যে, Marten Schmidt-এর সঠিক ও সুন্দর ব্যাখ্যা সত্ত্বেও, তা দেখে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধাঁধায় পড়ে গেলেন। কারণ ঐ পরিমাণ লোহিতাপসরণ মানে (Hubble-এর সূত্র অনুযায়ী) ঐ বস্তুগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতি সেকেন্ডে 90 হাজার কিলোমিটার বা এক লক্ষ ত্রিশ হাজার কি·মি· বা দু'লক্ষ কি·মি·—এই ধরনের বেগে আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। (প্রসঙ্গত, সেকেন্ডে দু'লক্ষ কি·মি· মানে আলোর বেগের দুই-তৃতীয়াংশ।) ক্রমশ এমন কয়েকটি কোয়েসারেরও সন্ধান পাওয়া গেল যাদের অপসারী গতিবেগ মনে হয় আলোকের বেগের 90%-এর কাছাকাছি। যেমন OQ 172 কোয়েসারটির red-shift নির্দেশ করছে যে ঐ বস্তুটি আলোর গতির নব্বই শতাংশের বেশি বেগে আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে।(সাদা-কালো প্লেট 14 দেখুন।)

তা যদি হয় তাহলে ঐ রহস্যময় কোয়েসারগুলি রয়েছে (মহাজাগতিক পরিমাপেও) বহু বহু দূরে—অবিশ্বাস্য রকমের বিপুল দূরত্বে। (আমরা জেনেছি, বিশ্ব-পরিসর প্রসারিত হচ্ছে, এবং যে বস্তুর দূরাপসরণ-বেগ যত বেশি সেটি সম্ভবত তত দূরে রয়েছে।) প্রথমত এদের এই বিশাল দূরত্বগুলিই রীতিমত বিস্ময়কর। এটা কিন্তু বিস্ময়ের শুরু মাত্র। কারণ অত দূরের জিনিস থেকে যে পরিমাণ বিকিরণ (দৃশ্য-আলো, রেডিও-রশ্মি, এক্স-রে সবই) আসছে তা অবিশ্বাস্য রকমের বেশি। এটা কী করে সম্ভব? প্রথমত অত দূরের জিনিস অত উজ্জ্বল হয় কী করে? দ্বিতীয়ত নক্ষত্রসদৃশ কোয়েসারগুলির ব্যাস গ্যালাক্সিদের গড় ব্যাসের হাজার ভাগেরও কম বলে মনে হয়। তাহলে এত ছোটো জিনিস থেকে এত বেশি শক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে কী করে? (এ সম্বন্ধে পরে আরো আলোচনা হবে।)

Quasar-দের শক্তি-উৎপাদনের রহস্য যাই হোক না কেন, তাদের উপস্থিতি মহাবিশ্বের গঠন ও ইতিহাসের ওপর এক গভীর আলোকপাত করলো। কোয়েসারগুলিকে পাওয়া গেছে বিশ্বের বহুদূর অঞ্চলগুলিতে—আনুমানিক 200 কোটি থেকে 1000 কোটি আলোকবর্ষ দূরে। কাছাকাছি অঞ্চলে একটিও নেই। কেন? আমরা জানি কোনো কোয়েসার (বা গ্যালাক্সি) যত বেশি দূরের, সেটি বিশ্বের তত বেশি আগেকার যুগের জিনিস। সব কোয়েসারই বহু দূরে অবস্থিত; তাহলে সব কোয়েসারই কি বিশ্বের অতীত যুগের বস্তু? কোয়েসাররা কি তাহলে বিশ্বের সুদূর অতীতের এমন এক ধরনের ঘটনা যা আজকের বিশ্বে আর ঘটে না?

তা যদি হয় তাহলে তো বিশ্ব আগে যেরকম ছিল এখন আর ঠিক সেরকম নেই। তাহলে বলতে হবে Steady State তাত্ত্বিকদের সমভাবাপন্ন পরিবর্তনহীন বিশ্বের চিত্রটির সঙ্গে বিশ্বের বাস্তব অবস্থার মিল পাওয়া যাচ্ছে না।

অবশ্য কোনো কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী (যাঁদের মধ্যে অগ্রণী Geoffrey Burbidge) বলেছেন যে কোয়েসারদের আলোয় ঐ যে অত্যধিক red-shift, ওটা তাদের গতিবেগের জন্য না হয়ে ওদের প্রচন্ড অভিকর্ষের ফলও হতে পারে। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কোন শক্তিশালী মহাকর্ষক্ষেত্র (যেমন কোনো বিপুল ভর ও প্রচণ্ড ঘনত্বসম্পন্ন তারা) থেকে নির্গত আলোর শক্তি একটু কমে যায়, অর্থাৎ তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য একটু বেড়ে যায় এবং আলোটি সামগ্রিকভাবে একটু লালচে (red-shifted) হয়ে যায়। এর নাম মহাকর্ষ-ঘটিত লোহিতাপসরণ (gravitational red-shift বা Einstein shift)। Burbidge প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বললেন, quasar-গুলি হয়তো বিপুলকায় এবং

অসাধারণ ঘন বস্তুপিন্ড যার দানবীয় অভিকর্ষ থেকে বেরুতে গিয়ে আলোর শক্তি অনেক কমে যাচ্ছে এবং রং লালচে হয়ে যাচ্ছে। হয়তো আত্ম-অভিকর্ষের দরুনই কোয়েসারদের এই বিপুল red-shift, দূরত্বের এবং প্রচন্ড গতির জন্য নয়। হয়তো তারা মহাশূন্যের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি অঞ্চলেই অবস্থিত। তাহলে বিশ্বের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে কোনো তফাৎ আছে এরকম মনে করার আর কোনো কারণ থাকে না, এবং Steady State তত্ত্ব ভুল এরকম কথা ভাবারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু 1963-64 নাগাদ অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে radio astronomy-র সামগ্রিক সাক্ষ্য, বিশেষত quasar-দের বিপুল দূরত্ব এবং অদ্ভুত প্রকৃতি, এই ইঙ্গিতই বহন করে যে বিশ্ব সমভাবাপন্ন নয়; বিশ্ব পরিবর্তমান ও বিবর্তনশীল।

সর্বব্যাপী microwave পটভূমির আবিষ্কার: Steady State তত্ত্বের পশ্চাদপসরণ

1965 সালে radio astronomy-র ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় আবিষ্কার মানুষের বিশ্বতাত্ত্বিক চিন্তাকে আকস্মিকভাবে এক সূক্ষ্মতর ও উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে গেল। আবিষ্কারের নাটকীয় ঘটনাটিকে আগে বিবৃত করা যাক; তাৎপর্যের কথা পরে হবে।



চিত্র 26

(ডান দিকে) আর্নো পেনজিয়াস্ ও রবার্ট উইলসন

যুক্তরাষ্ট্রের New Jersey রাজ্যের অন্তর্গত Crawford Hill অঞ্চলে Bell Telephone Laboratory কোম্পানীর গবেষণাগারে কুড়ি ফুট ব্যাসের একটি উৎকৃষ্ট রেডিও-টেলিস্কোপ ছিল। সেটি ব্যবহার হচ্ছিল প্রধানত Echo 1, Echo 2, প্রভৃতি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে

বেতারতরঙ্গ কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তা মাপার জন্যে। 1964 সালে পেনজিআস (Arno Penzias) ও উইলসন (Robert Wilson) নামক দুজন রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানী ঐ টেলিস্কোপটি নিয়ে কাজ করছিলেন। আমাদের গ্যালাক্সির তল (plane) থেকে দূরে ("ওপরে" বা "নিচে") মহাকাশের যেসব অঞ্চল, সেগুলি থেকে কী ধরনের এবং পরিমাণের রেডিওতরঙ্গ আসে তা নির্ণয় করার চেষ্টা করছিলেন। টেলিস্কোপটিকে তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের রেডিওরশ্মির সঙ্গে অভিযোজিত করে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। (প্রসঙ্গত, স্মরণ করা যেতে পারে, 21 সে·মি· দৈর্ঘ্যের যে তরঙ্গ neutral হাইড্রোজেন গ্যাসপুঞ্জ থেকে আসে তাকে বিশ্লেষণ করে আমরা মহাকাশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছি।) একটা সময়ে Penzias ও Wilson 7·35 সে·মি· দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ টেলিস্কোপের antenna-য় গ্রহণ করে বিভিন্ন দিকে তার উৎসের তীব্রতা মাপতে গিয়ে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন। (মোটের উপর, 1/100 সে·মি· থেকে 10 সে·মি· দৈর্ঘ্যের রশ্মিকে microwave radiation বলে।) তাঁরা বিভিন্ন দিকে antenna-র মুখটি ঘুরিয়ে দেখলেন সবদিক থেকেই ঐ 7.35 সে·মি· তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বেশ কিছুটা microwave noise, অর্থাৎ রেডিও-তরঙ্গজনিত শব্দ আসছে। তাঁরা ছায়াপথের বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর, Andromeda Galaxy M 31-এর ওপর, এবং মহাশূন্যের অন্য নানা দিকে antenna-র মুখটিকে ফেরালেন; কিন্তু ঐ 7.35 সে·মি· তরঙ্গ তবু সব দিক থেকেই আসতে লাগলো। কিন্তু সব জায়গা থেকেই কি সমান পরিমাণে আসতে লাগল? না, কতকগুলো আগে থেকেই চেনা বিশেষ শক্তিশালী রেডিও-উৎস থেকে অনেক বেশি আওয়াজ, অর্থাৎ তরঙ্গ আসতে লাগল। কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষ উৎস থেকে আসা বিশেষ পরিমাণ রেডিও-তরঙ্গকে বাদ দেওয়ার পরও ঠিক সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ microwave বিকিরণটি অবশিষ্ট থাকছে। বিস্মিত বিজ্ঞানীরা দেখলেন, এই অদ্ভুত রকমের সর্বব্যাপী রশ্মিটিকে যদি black body radiation বলে ধরা হয় (এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে) তাহলে এর তাপমাত্রা হবে 3° Kelvin-এর (−270° সেন্টিগ্রেডের) কাছাকাছি—absolute zero-র মাত্র তিন ডিগ্রি ওপরে। এই 3°K তাপমাত্রার microwave তরঙ্গ দিনে, রাতে, সকালে, সন্ধ্যায়, মহাকাশের সমস্ত দিক থেকে সমানভাবে আসছে। বিস্মিত ও বিভ্রান্ত Penzias ও Wilson তখনও জানেন না যে তাঁরা সমস্ত বিশ্বের প্রকৃতি, গঠন ও ইতিহাস সম্বন্ধে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতের সামনে তুলে ধরতে চলেছেন।

পেনজিআস-উইলসনের আবিষ্কারের তাত্ত্বিক পটভূমি

ফ্রিডমান ও লেমেতারের চিন্তাকে অনুসরণ করে জর্জ গ্যামো ও তাঁর সহকারীরা বিশ্বসৃষ্টির যে মহাবিস্ফোরণ-তত্ত্ব পরিবেশন করেছিলেন তার বিবরণ আগে দেওয়া হয়েছে। নবজাত বিশ্বের সেই আদিম অগ্নিগোলকের (primeval fireball-এর) প্রকৃতি ও বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁরা একটি গভীর ইঙ্গিত করেছিলেন, যার সঙ্গে পেনজিআস-উইলসনের আবিষ্কারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মনে থাকতে পারে, ঐ অগ্নিগোলকটি প্রায় বিন্দুবৎ অবস্থা থেকে ক্রমশই স্ফীত হতে থাকে এবং তার তাপমাত্রা প্রায় অসীমতা থেকে ক্রমশ নেমে আসতে থাকে। আগেই বলা হয়েছে, এই আদিপর্বে বিশ্বের সেই cosmic soup-এর তাপমাত্রা ও ঘনত্ব ছিল অকল্পনীয় এবং তার মধ্যে রশ্মিকণা ও বস্তুকণাগুলি সারাক্ষণ পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। এর ফলে matter ও energy-র এই অবিমিশ্র খিচুড়িটির সর্বত্রই সমান তাপমাত্রা বিরাজ করছিল।

অর্থাৎ এই পর্যায়ে বিশ্বের সর্বত্র একটা thermal equilibrium বা তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় ছিল।

যে জিনিসের সমস্ত অংশে তাপমাত্রা সমান এবং যার সমস্ত দিক থেকে একইভাবে শক্তি-বিকিরণ ঘটতে থাকে তাকে (বৃহত্তর অর্থে) black body বলা হয়। আর ঐ বস্তু থেকে বিকীর্ণ রশ্মিকে বলে black body radiation। এই রশ্মি কতটা শক্তিমান হবে, অর্থাৎ তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য কী পর্যায়ের হবে, তা নির্ভর করে একটিমাত্র factor-এর ওপর: সেটি হচ্ছে ঐ বিকিরণকারী বস্তুর তাপমাত্রা। মনে রাখতে হবে, (i) কোনো রশ্মির শক্তি যত বেশি, তার স্পন্দনহার—frequency— তত বেশি এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত কম, আর (ii) কোনো black body-র তাপমাত্রা যত বেশি তার রশ্মির তরঙ্গ তত হ্রস্ব-মানের। পক্ষান্তরে, উষ্ণতা যত কম হবে তার রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত বেড়ে যাবে, অর্থাৎ শক্তি কমে যাবে। বৈদ্যুতিক বাতির filament-এর মতো একটা জিনিসকে black body বলে ধরা যাক। একটা বিশেষ তাপমাত্রায় সেটি থেকে প্রধানত ছোটো তরঙ্গের নীলাভ আলো বেরুবে—তার চেয়ে কম ও বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বেরুবে অপেক্ষাকৃত কম। Black body-টির তাপমাত্রা কিছুটা নেমে এলে তার থেকে—প্রধানত—অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গের হলদে আলো বেরুবে। Temperature আরো নেমে এলে—প্রধানত—আরো দীর্ঘ তরঙ্গের (এবং অল্পশক্তির) লাল আলো বেরুবে। সে সময়ে লালের চেয়ে বেশি ও কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মিও কিছু বেরুবে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম।

অর্থাৎ কোনো black body-র বিশেষ অবস্থার তাপমাত্রাই স্থির করে তার থেকে যে রশ্মিসমষ্টি নির্গত হবে তার মধ্যে wave-length-এর distribution কীরকম হবে, অর্থাৎ তার মধ্যে কত-কত দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ কী কী পরিমাণে উপস্থিত থাকবে।

আদিম অগ্নিকুন্ডের অবশেষ-রশ্মি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী

গ্যামোর চিন্তা অনুসরণ করে 1948 সালে (*Nature* 162) প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে অ্যালফার ও হারমান বলেন যে ঐ cosmic soup অবস্থায় আদিবিশ্ব ছিল একটি black body-র মতো। নিরন্তর প্রসারণ সত্ত্বেও তার নিদারুণ ঘনত্বের জন্য তার সর্বত্র তাপমাত্রা ছিল সমান (in a state of thermal equilibrium)। তাহলে ঐ মহাজাগতিক black body-টির বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে তার যে-কোনো মুহূর্তের তাপমাত্রা থেকেই নির্ণীত হত ঐ মুহূর্তে তার রশ্মিগুলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কী ধরনের ছিল।

বিজ্ঞানীরা সূক্ষ্ম কোআন্টাম্-তাত্ত্বিক হিসাব করে দেখেছিলেন সৃষ্টির 1/100 সেকেন্ড পরে বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল 10,000 কোটি Kelvin। তার পরে বিভিন্ন পর্যায়ে—বিশ্ব যত দিন পর্যন্ত সমতপ্ত অবস্থায় ছিল—বিশ্বের তাপমাত্রা বিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কী হারে নেমে এসেছে এবং তার ফলে red-shift-এর মাধ্যমে রশ্মিগুলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কী হারে বেড়ে গেছে তার একটা ছকও পাওয়া যায়। Alpher ও Herman বললেন সেই cosmic soup অবস্থায় বিশ্ব থেকে যে বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি বেরিয়ে এসেছিল তার একটা চিহ্ন, একটা অবশেষ, আজকের বিশ্বে থাকার কথা। নিঃসন্দেহে সেই রশ্মি বিশ্বের বিপুল প্রসারণের ফলে আজ খুবই ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিপুলভাবে বেড়ে গেছে আর তার তাপমাত্রা অনেক অনেক কমে গেছে—এত কম যে তার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার।

দুই বিজ্ঞানী বললেন: সেই আদিম অগ্নিগোলকের নিদারুণ তীব্র রশ্মির যে অতিক্ষীণ ছায়া আজকের বিশ্বে পরিব্যাপ্ত থাকার কথা, তার এখনকার সমতুল তাপমাত্রা হবে 5°Kelvin-এর মতো। এই চিন্তাসূত্র ধরে ভাবতে ভাবতে Princeton বিশ্ববিদ্যালয়ের R. H.Dicke, P.G. Roll, D. T. Wilkinson, P. J. E. Peebles প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা 1965-র গোড়ার দিকে মহাশূন্যে এই ধরনের একটি অতিনিম্ন তাপমাত্রার সর্বব্যাপী রশ্মির অনুসন্ধানের কথা চিন্তা করছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন Penzias ও Wilson-এর কাছ থেকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত একটি বার্তা এলো তাঁদের কাছে, যে তাঁরা (Penzias ও Wilson) মহাকাশের সর্বত্র এমন একটি রশ্মিস্রোতের সন্ধান পাচ্ছেন যার গড় উত্তাপ তিন ডিগ্রি কেলভিনের মতো।

বুঝতেই পারা যায়, এই বার্তা Princeton-এর ঐ বিজ্ঞানীদের মনে এক বিদ্যুৎ-শিহরণের সৃষ্টি করল। কবি কীট্স্-এর ভাষায় তাঁদের মনে জেগে উঠল একটা wild surmise : এই কি তবে সেই? সুদূর-কল্পিত বিশ্বের সেই সুদূর অগ্নিময় প্রভাতের রেশটুকু কি সত্যিই আজ ধরা পড়ল? ফ্রিডমান-লেমেতারের সেই দুঃসাহসিক স্বপ্ন তাহলে নিছক স্বপ্ন নয়? সেই অকল্পনীয় অগ্ন্যুচ্ছ্বাসেরই ছায়াবশেষ তাহলে আজকের এই অতিক্ষীণ অতিশীতল বিশ্বব্যাপ্ত রশ্মিজালটি—যা পেন্জিআস্-উইলসনের অ্যানটেনায় ধরা পড়েছে!

তবু সাবধানের মার নেই। *Astrophysical Journal*-এর 142 সংখ্যায় (1965) Penzias ও Wilson তাঁদের আবিষ্কারটি পরিবেশন করলেন অত্যন্ত বিনীতভাবে *A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 M Hz* নামে। (ঐ নামটি হচ্ছে আবিষ্কৃত রশ্মির frequency, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে স্পন্দনের হার—যার সমতুল তরঙ্গদৈর্ঘ্য 7·35 সে·মি· এবং যার সমতুল তাপমাত্রা 3°K বা −270°C-র মতো।) আর ঐ পত্রিকার ঐ সংখ্যাতেই Dicke, Peebles, Roll, ও Wilkinson ঐ আবিষ্কারের বিশ্বতাত্ত্বিক তাৎপর্য আলোচনা করে বললেন, খুব সম্ভব এটি বিশ্বের আদিম তেজপুঞ্জের সেই ক্ষীণ অবশেষটি—গ্যামো, অ্যালফার ও হারমান্ যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

দিকে দিকে দেশে দেশে radio astronomer-দের পরীক্ষা চলতে লাগল। মোটের ওপর সবাই একমত হলেন, প্রায় 3°K তাপমাত্রার অনুবর্তী একটা অতিরিক্ত microwave তরঙ্গ আকাশের সব দিক থেকে আসছে। আর ঐ রশ্মি ঐ তাপমাত্রার black body radiation হলে তার wavelength distribution (বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের আপেক্ষিক পরিমাণ) যে-রকম হবার কথা, মোটের ওপর সেইরকমই। পরে অবশ্য সূক্ষ্মতর পরিমাপে ধরা পড়ে তরঙ্গটির সঠিক তাপমাত্রা 2·7° Kelvin।

মহাকাশে Cyanogen অণুদের রহস্যময় ঘূর্ণন

সৃষ্টির আদিপর্বের অবশেষ এই black body বিকিরণের উপস্থিতির আর এক অপ্রত্যাশিত সাক্ষ্য পাওয়া গেল কিছুদিন পরেই। ব্যাপারটির অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ আমরা এখানে দিচ্ছি। বৃশ্চিক রাশির কিছুটা উত্তরে অবস্থিত Ophiuchus (সর্পধারী) নক্ষত্রমন্ডলে xi (জাই) Ophiuchi নামে একটি অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত তারা আছে। ঐ তারাটির আলো আমাদের কাছে পৌঁছায় একটা আন্তঃনক্ষত্রীয় গ্যাসপুঞ্জের ভিতর দিয়ে। ঐ তারার বর্ণালীতে এমন কতকগুলি কালো শোষণরেখা (dark absorption lines) দেখা যায় যার থেকে বোঝা যায়, মাঝখানের ঐ গ্যাসটিতে সায়ানোজেন (CN : একটি কার্বন ও একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর যৌগ) অণুর

পুঞ্জ রয়েছে। ঐ cyanogen molecule সবচেয়ে নিম্ন শক্তিমাত্রায় থাকলে স্থির থাকে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মিপাতে বিশেষ বিশেষ বেগে ঘুরতে থাকে। 1941 সালে W.S. Adams ও A. McKellar লক্ষ্য করেন xi Ophiuchi-এর বর্ণালীতে সায়ানোজেনের উপস্থিতিসূচক তিনটি রেখা পাওয়া যাচ্ছে। ঐ রেখাগুলি অণুগুলির তিনরকম অবস্থার পরিচয় দেয়: ঘূর্ণনহীন, মন্থরঘূর্ণিত এবং দ্রুতঘূর্ণিত। এর থেকে তাঁরা বহু সূক্ষ্ম পরিমাপের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে ঐ অণুগুলির ঘূর্ণনের বিশেষ ছন্দটি থেকে মনে হয় যে ওগুলির ওপর এমন একটি রশ্মি এসে পড়ছে যার (black body radiation হিসাবে) তাপমাত্রা হবে 2·7° Kelvin-এর মতো। একমাত্র ঐ বিশেষ শক্তিবিশিষ্ট রশ্মিই ঐ ধরনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

এই গৌণ রহস্যটির সঙ্গে বিশ্বের উৎপত্তির কোন যোগ থাকতে পারে এমন কথা কারুরই মনে হয়নি। কিন্তু 1965 সালে পেন্‌জিআস ও উইলসন সেই 2·7°K তাপমাত্রার মহাজাগতিক বিকিরণ আবিষ্কার করার পর cyanogen অণুগুলির সেই বিচিত্র ঘূর্ণনছন্দের ওপর নতুন আলোকপাত ঘটল। G. Field, I. S. Shklovsky ও N. J. Woolf একটি গবেষণাপত্রে দেখালেন যে সায়ানোজেন অণুগুলির ঘূর্ণনছন্দের ঐ বিশেষ তারতম্যের পিছনে রয়েছে ঐ 2·7°K তাপমাত্রার black body রশ্মি, যা সম্ভবত বিশ্বের সেই আদিম অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের ক্ষীণ অবশেষ।

আমরা আগে আলোচনা করেছি, কোনো বিশেষ তাপমাত্রার black body-রশ্মি বিকীর্ণ হয় প্রধানত একটি বিশেষ range-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে; কিন্তু কিছুটা বেশি এবং কিছুটা কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যেও খানিকটা বিকিরণ হয়। Cyanogen অণুগুলির বিশেষ ঘূর্ণন যে 2·7°K তাপমাত্রার রশ্মি দিয়ে মাপা হয়েছিল সেটি কিন্তু দৃশ্য-আলো। এখন বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করতে চাইলেন, দৃশ্য আর microwave-এর মাঝামাঝি যে তাপ বা infrared রশ্মির স্থান সেই রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যেও ঐ বিশ্বব্যাপী 2·7°K বিকিরণটিকে সঠিক পরিমাণে পাওয়া যায় কিনা। যদি মেলে, তাহলে মাইক্রোওয়েভ range-এ, optical বা দৃশ্য-আলোর range-এ, এবং অবলোহিত বা infrared range-এ—এই তিন পর্যায়ের তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ঐ 2·7°K রশ্মির উপস্থিতি ধরা পড়বে।

বহু বেলুন এবং রকেটের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলের ওপারে infrared receiver পাঠানো হল। 1972 নাগাদ মোটের ওপর সব পরীক্ষকই এ বিষয়ে একমত হলেন যে মহাশূন্যের সমস্ত দিক থেকে আসা infrared তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঙ্গে 2·7°K তাপমাত্রার এক বিকিরণস্রোত ভেসে আসছে।

ইতিমধ্যে মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) তত্ত্বের পক্ষে এবং শাশ্বত বিশ্ব (Steady State) তত্ত্বের বিপক্ষে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। Steady State তত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা এবং ঐ তত্ত্বের গণিত-ভিত্তির শ্রেষ্ঠ রচয়িতা স্বয়ং Fred Hoyle 1965-র শেষের দিকে (*Nature*, 208, 111) স্বীকার করে নিলেন যে Big Bang তত্ত্বের স্বপক্ষে যে তথ্যগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি নিজে এবং Bondi ও Gold যে বিশেষ ধরনের Steady State বিশ্বের কল্পনা করেছিলেন তাকে আর ঠিক বলে মনে হয় না।

এই দ্বন্দ্বের কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এই বিতর্ক আজও চলছে এবং Hoyle সম্প্রতিকালে আবার মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের বিরুদ্ধে কিছুটা বেঁকে দাঁড়িয়েছেন। তাছাড়া astronomy এবং quantum physics দুটি ক্ষেত্রেই বহু বিচিত্র আবিষ্কারের ফলে বিশ্বতত্ত্ব আজ সত্যিই এক রোমাঞ্চকর পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

সাত

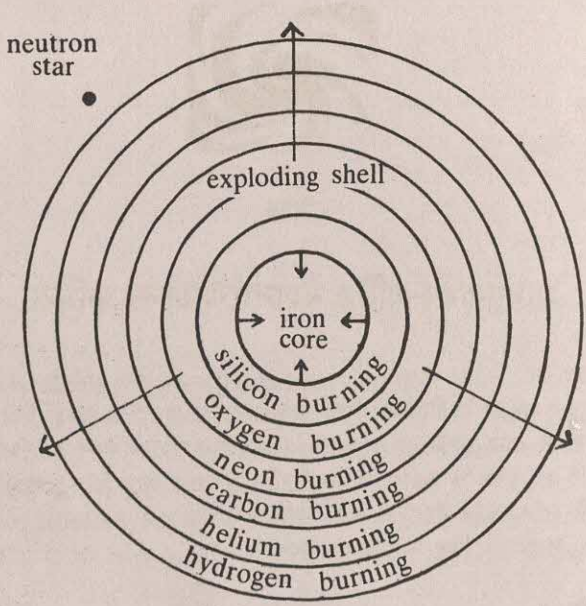
মাধ্যাকর্ষণ-ঘটিত মহাসংকোচনের ভূমিকা

মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষ, নিউটন যাকে universal gravitation বলে অভিহিত করেছেন, তার ক্রিয়া বিশ্বলোকের সর্বত্রই প্রতীয়মান। কিন্তু বিপুলকায় ও অত্যধিক ঘনত্ববিশিষ্ট বস্তুপিণ্ডের ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণের এমন একটি ভূমিকা আছে যা আমাদের সাধারণ ধারণার একেবারে বাইরে। অথচ মহাকর্ষের এই চরম ও ভয়াবহ অভিব্যক্তিটির উপলব্ধি বাদে বিশ্বের গঠন ও ভবিষ্যৎ পরিণতির চিত্রটি বোঝা সম্ভব নয়। তাই এই পরিচ্ছেদে আমরা gravitational collapse-এর ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব।

বিপুল-অভিকর্ষপিষ্ট বস্তুপিণ্ডের অবস্থা : নতুন তত্ত্বরচনা ও আবিষ্কার

White dwarf বা সাদা বামন তারার কথা আগে বলা হয়েছে। তারাদের হাইড্রোজেন, হিলিআম প্রভৃতি thermonuclear জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার পর তারা নিজেদের কেন্দ্রীয় অভিকর্ষের টানে ধসে পড়ে একটি অতিঘন নক্ষত্রকেন্দ্রকে পরিণত হয়—যার মধ্যে প্রচণ্ড চাপের ফলে পরমাণুগুলি ভেঙে গেছে, এবং হিলিআম-কেন্দ্রকগুলি ও ইলেকট্রনগুলি জড়াজড়ি করে তাল পাকিয়ে আছে। আমাদের লুব্ধকের সেইরকম একটি বামন সঙ্গী আছে; তার এক ঘন মিটার পরিসরে যে বস্তুটুকু আছে পৃথিবীতে তার ওজন হবে দুলক্ষ মেট্রিক টনের মতো। W. S. Adams এবং Eddington 1915 সালে এই ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

White dwarf-দের এই নিদারুণ ঘনত্বই প্রকৃতির জগতে ঘনত্বের চরম দৃষ্টান্ত—এই ধারণা ভাঙতে আরো 15 বছরের মতো লাগলো। E. C. Stoner, W. Anderson, এবং তারপরে আরো স্পষ্টভাবে S. Chandrasekhar (জন্মসূত্রে ভারতীয়, পরে মার্কিন নাগরিক হিসাবে নোবেল পুরস্কার পান) 1931 থেকে 1935-এর মধ্যে দেখালেন (*Astrophysical Journal* 74, p. 81, 1931) যে, কোনো তারার ভর সূর্যের 1·4-এর বেশি হলে সে তারার gravitational collapse সাদা বামন পর্যায় পেরিয়ে আরো নিবিড় ঘনত্বের দিকে এগিয়ে যাবে। স্বয়ং এডিংটন প্রথমে চন্দ্রশেখরের এই ধারণাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন! কিন্তু চন্দ্রশেখরের 1935-এর সূক্ষ্ম গাণিতিক ব্যাখ্যা (Monthly Notices of R. A. S 1935) বিজ্ঞানীমহলে গৃহীত হল, এবং সাদা বামনদের ভরের ঐ ওপরের সীমারেখাটি (সূর্যের 1·4 গুণ) Chandrasekhar('s) limit নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলো। আজ এই পরিমাপটি astrophysics-এর এক অপরিহার্য অঙ্গ।



চিত্র 27

মহাদানব নক্ষত্রের সুপারনোভা -বিস্ফোরণের ঠিক আগেকার অবস্থার ও বিস্ফোরণ-মুহূর্তের ছক। লৌহগঠিত কেন্দ্রটি নিজের অভিকর্ষের চাপে collapse করে নিউট্রন তারায় বা ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়। বাকি তারাটি বিস্ফোরিত হয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে।

White Dwarf-এর চেয়েও 100 কোটি গুণ ঘন তারা

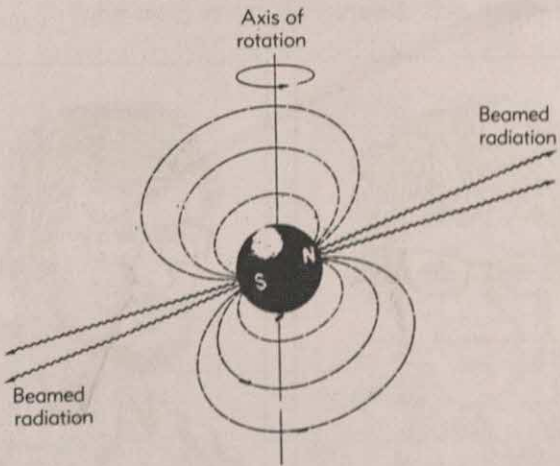
বোঝা গেল বৃহত্তর নক্ষত্ররা collapse করে আরো ভয়ানক রকমের ঘন কেন্দ্রক সৃষ্টি করবে। কিন্তু ঐ সৃষ্টিছাড়া অবস্থায় বস্তুর অবস্থাটা কীরকম দাঁড়াবে?

1934 থেকে 1938-এর মধ্যে Baade, Zwicky ও atom bomb-এর স্রষ্টা Oppenheimer-এর গবেষণা থেকে মনে হলো, চন্দ্রশেখর-সীমার চেয়ে বেশি ভরের তারাগুলির ভিতর আভ্যন্তরীণ তাপ ও চাপ অনেক বেশি হওয়ায় তাদের ভিতরে তাপ-পারমাণবিক প্রক্রিয়া আরো প্রচণ্ড হয়। তাদের মধ্যে অনেক বেশি দ্রুত হারে হিলিআম থেকে লোহা, কোবাল্ট্ প্রভৃতি মৌল গঠিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রশ্মির বহির্মুখী চাপ আর অভিকর্ষের কেন্দ্রমুখী টানের নিদারুণ সংঘর্ষের ফলে ঐ জাতীয় তারার সমস্ত বহিরাবরণটি এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে বেরিয়ে যায়, আর দারুণ ঘনত্বসম্পন্ন কেন্দ্রকটি নিজেরই ভীষণ অভিকর্ষে পিষ্ট হয়ে আরো ভয়ানক রকম ঘন হয়ে যায়। এই বিস্ফোরিত নক্ষত্র বা (Type-II) supernova-র ধ্বংসাবশেষ যে অতিক্ষুদ্র অতিঘন তারাটি, সেটি হয় প্রধানত

নিউট্রন দিয়ে গঠিত (neutron star)। কারণ ঐ প্রচণ্ড চাপে এক-একটি প্রোটন এক-একটি ইলেকট্রনের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি করে নিউট্রন সৃষ্টি করে। তারাটি হচ্ছে একটি নিউট্রন-পিণ্ড। এর ভর হয়তো সূর্যের দ্বিগুণ, কিন্তু ব্যাস হয়তো 15 বা 20 কিলোমিটার। এই জাতীয় তারার ঘনত্ব white dwarf-এর ঘনত্বের চেয়ে 100 কোটি গুণ পর্যন্ত বেশি হতে পারে। এর প্রতি ঘন-সেন্টিমিটার বস্তুর ওজন আমাদের মাপে হবে দু লক্ষ টনের মতো। এই ঘনত্ব পরমাণু-কেন্দ্রকের ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশি। (প্রসঙ্গত, দু-ধরনের সুপারনোভা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রথম পরিচ্ছেদে আছে।)

Pulsar আবিষ্কার: Neutron Star-এর আর এক পরিচয়

Neutron star-এর এই পরমাশ্চর্য ঘনত্বের ধারণাটি প্রথমে ছিল তত্ত্বগত—বাস্তবজগতে তার যাথার্থ্যের আভাস ছিলো দু-ধরনের। প্রথমত, আমাদের গ্যালাক্সির দূরাঞ্চলে সুপারনোভা-বিস্ফোরণের অবশেষ বলে অনুমিত কতকগুলি নীহারিকার উপস্থিতি—যাদের



চিত্র 28

Pulsar বা neutron star-এর তত্ত্বকল্পিত মডেল। তারাটির ঘূর্ণন-অক্ষ ও চৌম্বকঅক্ষের কৌণিক পার্থক্য লক্ষ্য করুন। তারাটির ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে দুটি চৌম্বক মেরু থেকে নির্গত synchroton রশ্মি লাইটহাউসের সার্চলাইটের মতো ঘুরতে থাকে। চৌম্বকমেরু ঘটনাচক্রে আমাদের দিকে ঘোরানো থাকলে তবেই আমরা তারাটির সন্ধান পাই।

মধ্যে আছে বৃষরাশি অঞ্চলের সুবিখ্যাত Crab Nebula বা কর্কট নীহারিকা। (রঙিন প্লেট 8 দেখুন।) দ্বিতীয়ত, সুদূর অতীতে আমাদের ছায়াপথ-গ্যালাক্সিতে (শেষবার 1604 সালে), এবং

এ-যুগে বহুদূরের কয়েকটি গ্যালাক্সিতে লক্ষিত কতকগুলি মহাদীপ্তিময় বিস্ফোরণ—যাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 1985 সালে M-31 বা Great Andromeda Galaxy-তে লক্ষিত Hartwig's Star। কিন্তু অনেক পরে আরো এক ধরনের প্রমাণ পাওয়া গেলো। 1968 নাগাদ Antony Hewish, Jocelyn Bell এবং অন্যান্য কয়েকজন বিজ্ঞানী এক ধরনের রেডিও-উৎস আবিষ্কার করলেন যেগুলো থেকে অত্যন্ত দ্রুত এবং আশ্চর্য রকমের নিয়মিত ছন্দে বেতারস্পন্দন আসছে। এগুলির নাম দেওয়া হলো pulsar। এইরকম একটি সংকেত-উৎস পাওয়া গেল বৃষরাশির অন্তর্গত Crab Nebula-নামক যে নীহারিকাটি সুদূর অতীতের এক সুপারনোভা বিস্ফোরণের ধ্বংসাবশেষ—তার কেন্দ্রস্থলে। সেইখানে আলোর টেলিস্কোপ (optical telescope) ফেলে সত্যিই খুঁজে পাওয়া গেল এমন একটি ক্ষীণ তারা, যার চরিত্র তত্ত্বকল্পিত neutron star-এরই মতো।

এখন প্রায় সব বিজ্ঞানীই মনে করেন pulsar-গুলি এক-একটি অতিঘন নিউট্রন তারা। সুপারনোভার বিস্ফোরণের মুহূর্তে নক্ষত্রকেন্দ্রটির এক প্রচণ্ড সংকোচন-প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে নিউট্রন তারার সৃষ্টি হয়। এই সংকোচনের ফলে তারাটি অসাধারণ দ্রুতগতিতে নিজের চারদিকে ঘুরতে থাকে—এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে তার এক পাক খাওয়া হয়ে যায়। এই তারার চারিদিকে প্রচণ্ড-শক্তিময় একটি চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, যার চৌম্বক-অক্ষটি (magnetic axis)



চিত্র 29

জসিলিন বেল

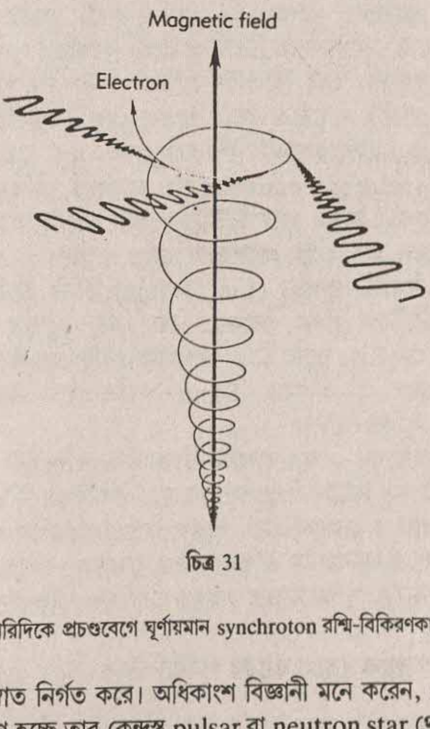


চিত্র 30

ইয়ান শেলটন

তারাটির ঘূর্ণন-অক্ষের সঙ্গে কিছুটা কৌণিকভাবে অবস্থিত। ঐ প্রবলবেগে ঘূর্ণায়মান চৌম্বকক্ষেত্রে ধরা পড়ে ইলেকট্রন প্রভৃতি চার্জযুক্ত কণারা প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণিত হয়ে তারাটির চৌম্বক মেরুদুটি থেকে প্রায় আলোর বেগে নির্গত হয়। নির্গমনকালে তারা গতিমুখের দিকে synchroton radiation নামে অভিহিত একজাতীয় রশ্মি বিকীর্ণ করে। ঘূর্ণায়মান, চৌম্বক মেরুদুটি যদি ঘটনাচক্রে আমাদের দিকে ফেরানো থাকে, একমাত্র তাহলেই ঐ synchroton রশ্মি—লাইটহাউসের সার্চলাইটের মতো—ফিরে ফিরে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। (পাল্সার-মডেলের চিত্র দেখুন।)

Crab Nebula-র pulsar-টির মতো অপেক্ষাকৃত তরুণ নিউট্রন তারাদের ক্ষেত্রে ঐ synchroton রশ্মির কিছুটা অংশ দৃশ্য-আলো হয়েও আসে। কিন্তু কালক্রমে তারাটির ঘূর্ণনবেগ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঐ রশ্মির কম্পাংক ও শক্তি হ্রাস পায়, এবং তখন ঐ রশ্মি শুধুমাত্র রেডিও-তরঙ্গরূপেই নির্গত হয়। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর ধারণায় নিউট্রন তারাটির উপরিতলের নিউট্রনগুলিই ভেঙে গিয়ে ইলেকট্রন ও প্রোটন উৎপন্ন করে, এবং ঐ কণাগুলি, বিশেষত অতি লঘু ইলেকট্রনগুলি, ঐ প্রচণ্ড চৌম্বকক্ষেত্রের কবলিত হয়ে নিরন্তর



চিত্র 31

চৌম্বক-অক্ষের চারিদিকে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণায়মান synchroton রশ্মি-বিকিরণকারী ইলেকট্রন।

synchroton রশ্মিস্রোত নির্গত করে। অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন, Crab Nebula-র উজ্জ্বলতার প্রধান কারণ হচ্ছে তার কেন্দ্রস্থ pulsar বা neutron star থেকে অবিচ্ছিন্ন স্রোতে নির্গত ঐ প্রচণ্ডশক্তিবাহী relativistic, অর্থাৎ প্রায় আলোকের গতিসম্পন্ন, ইলেকট্রনগুলি। সমগ্র ব্যাপারটির মূলে কিন্তু আছে বিধ্বস্ত supernova-র অতিঘন কেন্দ্রটির নিদারুণ gravitational collapse—white dwarf-এর বহু কোটি গুণ ঘনত্বের অবস্থায় সংকোচন।

নতুন সুপারনোভার চাঞ্চল্যকর সাক্ষ্য

এই প্রসঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানলোকে বিপুল-ঢেউ-তোলা ছ-বছর আগেকার সুপারনোভাটির কথা সংক্ষেপে বলা যাক।

1987 সালের 23 ফেব্রুয়ারি আমাদের ছায়াপথ-গ্যালাক্সির ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, "মাত্র" এক

লক্ষ সত্তর হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত Large Magellanic Cloud (LMC) গ্যালাক্সিটির মহাকায় "ঊর্ণনাভ নীহারিকা"র প্রান্তদেশে, দেখা দিল একটি উজ্জ্বল সুপারনোভা। দেড় লক্ষাধিক বছর ধরে মহাশূন্যের ঐ ব্যবধান অতিক্রম করে যখন তার দেড় লক্ষাধিক বছর আগেকার আলো পৃথিবীতে পৌঁছালো, প্রায় সেই মুহূর্ত থেকেই আমাদের বিজ্ঞানীরা ঐ আলোর বহুবিধ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শুরু করার সুযোগ পেলেন। একটি লক্ষাধিক বছর আগে তোলা ভিডিও ফিল্মের মতো ঐ প্রাচীন সুপারনোভাটির বিস্ফোরণের প্রায় প্রতিটি পর্যায়ের প্রতিটি মুহূর্ত বিজ্ঞানের দৃষ্টির সামনে উদঘাটিত ও লিপিবদ্ধ হলো।

পরম বিস্ময় ও আনন্দের ব্যাপার এই যে—দু-একটি ছোটোখাটো সম্ভাব্য বৈষম্য বাদে—নতুন সুপারনোভা থেকে আগত চিত্রটি আমাদের পূর্বকল্পিত সুপারনোভাতত্ত্বকে সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণিত করলো। সেই বিস্ফোরণ-তাড়িত বহু-উপাদান-সমন্বিত মেঘপুঞ্জ, সেই অসহ্য-অভিকর্ষ-পিষ্ট কেন্দ্রীয় পালসার—সবই পাওয়া গেল। এমন-কি, যাকে এই জাতীয় যুগপৎ মহাবিস্ফোরণ ও মহাসংকোচনের নিশ্চিততম স্বাক্ষর বলা যায়, সেই বিপুল-পরিমাণ নিউট্রিনো-বিকিরণও (neutrino emission-ও) আমাদের অতিসূক্ষ্ম যন্ত্রগুলিতে ধরা পড়লো। সূর্য থেকে একটা বিশেষ হারে নিউট্রিনো-স্রোত সর্বদাই আসছে। কিন্তু ঐ বিশেষ মুহূর্তে নিউট্রিনো-পাতের হার হঠাৎ প্রবলভাবে বেড়ে গেলো।

যে মুহূর্তে তরুণ বিজ্ঞানী শেল্‌টন (Ian Shelton) চিলির অ্যান্ডিজ-শিখর থেকে ঐ হঠাৎ-জেগে-ওঠা তারাটিকে প্রথম দেখেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই পৃথিবীপৃষ্ঠের চারটি গবেষণাগারে—যুক্তরাষ্ট্রের Erie হ্রদের তীরে, জাপানের একটি দস্তা-সীসে খনিতে, আল্পস্‌-এর Mont Blanc সুড়ঙ্গে ও রাশিয়ার Elburz পর্বত-গহ্বরে—নিউট্রিনো-পাতের এক অস্বাভাবিক আধিক্য লক্ষিত হলো।

অর্থাৎ অভিকর্ষের মারাত্মক পেষণে তারাটির লৌহগঠিত কেন্দ্রস্থলটি যে সত্যিই ভীষণভাবে collapse করে একটি ক্ষুদ্র নিউট্রন-পিণ্ডে পরিণত হয়ে এক বিপুল নিউট্রিনো-স্রোত মহাশূন্যে ছড়িয়ে দেয় তার অভ্রান্ত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেলো। প্রকৃতির গূঢ়তম প্রক্রিয়াগুলিকে সূক্ষ্মভাবে বোঝার ব্যাপারে মানবমনের তাত্ত্বিক পূর্বানুমান-ক্ষমতার আরো একটি আশ্চর্য পরিচয় বহন করে এলো 1987A সুপারনোভার বহুযুগ-প্রতীক্ষিত বিকিরণরাশি।

আরো বেশি ঘনত্ব? ব্ল্যাক হোল তত্ত্বের পুনরাবির্ভাব

নিউট্রন তারাদের ঐ অভাবনীয় ঘনত্ব (যা কিছুকাল আগেও বিজ্ঞানীদের ধারণার অতীত ছিল) বিজ্ঞানীদের মনে বস্তুর চরম ঘনত্ব সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন জাগাতে লাগলো। Neutron star-এর চেয়েও ঘন কোনো কিছু কি সম্ভব? সূর্যের ভরের 1·4 -এর চেয়ে অনেক বেশি ভরসম্পন্ন অর্থাৎ সূর্যের চার, পাঁচ বা দশ বা পঞ্চাশ গুণ ভরের তারাদের ক্ষেত্রে আরো চাঞ্চল্যকর কোনো পরিণতি কি সম্ভব? বিজ্ঞানীদের নতুন করে মনে পড়তে লাগলো আইনস্টাইনের General Relativity Theory-র একটি ইঙ্গিতের কথা: কোনো বিপুল বস্তুপিণ্ডের ক্ষেত্রে অভিকর্ষশক্তি যদি চরম প্রবল হয়ে ওঠে তাহলে ঐ বস্তুপিণ্ড সংকুচিত হতে হতে এক বিন্দুবৎ অবস্থায় পৌঁছাবে—যে অবস্থায় তার ঘনত্ব হবে অসীম এবং তার আয়তন হবে শূন্য (infinite density and zero volume)। সত্যিই কি এই ধরনের black hole-এর উপস্থিতি সম্ভব?

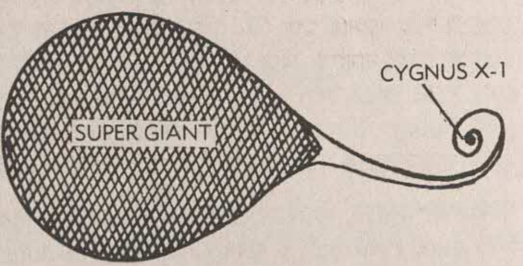
ব্ল্যাকহোল-এর চরিত্র নিয়ে গভীর গবেষণা চলতে লাগলো। আশ্চর্যের কথা, বহুকাল আগে, General Relativity তত্ত্ব প্রকাশের বছর দুয়েকের মধ্যেই Karl Schwarzschild নামে এক মনীষী আইনস্টাইনের তত্ত্বসূচিত ঐ ধরনের gravitational collapse-এর একটা প্রাথমিক গাণিতিক ছক তৈরি করে ফেলেছিলেন। সেই হিসেব অনুযায়ী তিনি বলেছলেন, আমাদের এই বিপুলকায় সূর্য (ব্যাস প্রায় 14 লক্ষ কি·মি·) যদি সংকুচিত হতে হতে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছোয় যেখানে তার ব্যাসার্ধ মাত্র তিন কিলোমিটার, তাহলে তত্ত্ব অনুযায়ী সে collapse-কে আর কোনোভাবেই থামানো যাবে না: সূর্য শেষ পর্যন্ত একটি বিন্দুবৎ black hole-এ পরিণত হবে। সূর্যের ক্ষেত্রে চরম collapse-এর আগের মুহূর্তের যে ব্যাসার্ধ, যে critical radius (তিন কি·মি·), ঐটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে Schwarzschild radius নামে প্রসিদ্ধ। আর ঐ ব্যাসার্ধের বৃত্তকে বলে ব্ল্যাকহোলের ঘটনা-দিগন্ত (event horizon)।

এই প্রাথমিক গবেষণার ভিত্তিতে এবং পরবর্তীকালের জ্ঞানের আলোকে বহু বিজ্ঞানী, বিশেষত পেনরোজ (Roger Penrose) ও হকিং (Stephen Hawking) ব্ল্যাকহোলের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। (Hawking-এর তত্ত্ব-উদ্ভূত black hole radiation সম্পর্কে আলোচনা পরে আছে।) ব্ল্যাকহোল্ গঠিত হওয়ার শেষ পর্যায়ে অভিকর্ষশক্তি শুধু বস্তুকে নয়, সমস্ত রকম শক্তিকেও নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলে। এই ধসে পড়ার বা collapse-এর প্রক্রিয়াটি event horizon-কে অতিক্রম করার পর আর কোনো আলোও (এমন-কি গামা-রশ্মিও) সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাই black hole-কে কখনো দেখা সম্ভব নয় optical বা radio telescope দিয়ে। তার উপস্থিতি টের পাওয়া যেতে পারে একমাত্র তার অতিপ্রচণ্ড অভিকর্ষশক্তির প্রভাব লক্ষ্য করে। আরো একটি নিশানা পাওয়া যেতে পারে। ব্ল্যাকহোলের কাছাকাছি এলাকা থেকে কোনো বস্তুপুঞ্জ যদি ব্ল্যাকহোলের সর্বগ্রাসী গহ্বরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে ধাবিত হয়, তাহলে অভিকর্ষজনিত ঐ প্রচণ্ড ত্বরণের জন্য ঐ ধাবমান বস্তুকণাসমূহ থেকে তীব্র X-ray-স্রোত নির্গত হওয়ার কথা। কিন্তু মহাকাশ থেকে X-ray বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আমাদের টেলিস্কোপ পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে না। সুতরাং মহাকাশে X-ray উৎসের সন্ধান করতে হলে কৃত্রিম উপগ্রহে X-ray টেলিস্কোপ বসিয়ে মহাকাশের সব দিকে লক্ষ্য করে যেতে হবে।

প্রায়-সনাক্ত একটি কৃষ্ণ গহ্বর

প্রবল এবং বহুমুখী অনুসন্ধানের ফলে সত্যিই আমাদের গ্যালাক্সির বিভিন্ন অঞ্চলে এমন অনেকগুলি উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল যেখানে ঐ রহস্যময় black hole থাকার সম্ভাবনা। তাদের মধ্যে যে উৎসটির black hole বলে প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে উজ্জ্বল, শুধু সেই Cygnus X-1-এর কথাই আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। উত্তর আকাশের Cygnus নক্ষত্রমণ্ডলে একটি বিপুলকায় supergiant-শ্রেণীর তারার সন্ধান পাওয়া গেছে। ঐ তারাটির গতিকে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করে বোঝা গেছে যে ওর একটি অদৃশ্য অথচ রীতিমতো ভারি সহচর (binary companion) আছে, যার প্রবল অভিকর্ষ ওর গতিকে প্রভাবিত করছে। কিন্তু এই অদৃশ্য সঙ্গীটিতো কোন ক্ষীণ white dwarf বা neutron star-ও হতে পারে, দূরত্বের জন্য যাকে দেখা যাচ্ছে না? সম্ভাবনা খুবই কম। প্রথমত, পরিমাপে বোঝা যায়, অদৃশ্য

সঙ্গীটির ভর যে-কোনো white dwarf-এর চেয়ে এবং আমাদের জানা সমস্ত neutron star-এর চেয়ে বেশি (সূর্যের ভরের ছয় থেকে পনেরো গুণ)। দ্বিতীয়ত, মহাকাশে পাঠানো X-ray-টেলিস্কোপে এক অদ্ভুত ব্যাপার ধরা পড়েছে। ঐ মহাকায় তারাটি থেকে একটি ক্ষীণ বস্তুস্রোত বেরিয়ে ঐ অদৃশ্য উৎসটির দিকে প্রবাহিত—তার অদৃশ্য আকর্ষণে। আর



চিত্র 32

Cygnus X-1 খুব সম্ভব একটি ব্ল্যাক হোল।এর প্রচণ্ড অভিকর্ষের টানে পাশের মহাদানব নক্ষত্রটির গড়ন খানিকটা তেবড়ে গেছে, আর একটি বস্তুস্রোত তারাটির থেকে প্রচণ্ড-ভরসম্পন্ন ব্ল্যাকহোলটির দিকে চলেছে।

বস্তুকণাগুলি যেখানে অদৃশ্য বস্তুটির সবচেয়ে কাছে পৌঁছেছে সেখান থেকে ভেসে আসছে একটি তীব্র X-ray স্রোত। এই সব কারণে বিজ্ঞানীদের অনুমান ঐ বিশাল নক্ষত্রটির অদৃশ্য সহচরটি হচ্ছে একটি black hole। এর নাম দেওয়া হয়েছে Cygnus X-1. (নক্ষত্র-মানচিত্রের সাহায্যে supergiant সঙ্গীটিকে চার-ইঞ্চি টেলিস্কোপ দেখা যায়।)

ব্ল্যাকহোল ও বিশ্বতত্ত্ব ঃ গ্যালাক্সিদের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ব্ল্যাকহোলের সূচনা?

Black hole-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই প্রায়-নিশ্চিতি বিশ্বতাত্ত্বিক চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলো। Black hole হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যেখানে একটি বিপুলকায় নক্ষত্রের সমস্ত অবশিষ্ট বস্তুপুঞ্জ ও রশ্মিপুঞ্জ একটিমাত্র রহস্যময় point-এর মধ্যে সংহত হচ্ছে। Big Bang-বিশ্বের যে প্রাক-বিস্ফোরণ আদি অবস্থা কল্পনা করা হয় সে তো অনেকটা একটা অতিঘন ব্ল্যাক হোলেরই মতো—তাই নয় কি? ঐ রকমই একটি বিন্দুবৎ অবস্থা থেকে বিশ্বের সমস্ত বস্তু ও শক্তি নিমেষের মধ্যে এক দারুণ বিস্ফোরণের মাধ্যমে ফেটে পড়েছিল বলে মনে করা হয়। তাহলে জন্মের প্রাক্-মুহূর্তে বিশ্ব কি একটি বিশাল black hole ছিল? (এই শূন্যতা বা প্রায়-শূন্যতা থেকে বস্তু-শক্তির উদ্গীরণকে কোনো কোনো বিজ্ঞানী white hole বলে অভিহিত করেছেন।)

এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে quasar-দের প্রচণ্ড-পরিমাণ রশ্মি বিকিরণের রহস্য। আমাদের জানা কোনো রকম thermonuclear প্রক্রিয়ায় ঐ পরিমাণ শক্তি উৎপাদন সম্ভব নয়। সুতরাং বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করেন, কোয়েসারদের ঐ অবিশ্বাস্য শক্তি-বিকিরণের মূলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির

ক্রিয়া রয়েছে। Quasar-দের বিকিরণ আবার অদ্ভুতভাবে বাড়ে-কমে। সে কারণে অনেক বিজ্ঞানীর অনুমান ঐ রহস্যময় বস্তুগুলির অভ্যন্তরে সব সময়েই কম বা বেশি পরিমাণে অভিকর্ষজাত সংকোচন-প্রক্রিয়া (gravitational collapse) সংঘটিত হচ্ছে। তাহলে quasar-গুলি কি ব্ল্যাক হোলে পরিণত হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে?

দু-ধরনের অদ্ভুত আকারের গ্যালাক্সি পাওয়া গেছে—Seyfert galaxy ও N-galaxy—যাদের সঙ্গে quasar-দের অনেকটা মিল আছে। এদের কেন্দ্রগুলি প্রকাণ্ড এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল, এবং তার তুলনায় বাইরের অংশগুলি ছায়াময়। N-galaxy-গুলির red-shift থেকে মনে হয়, সেগুলিও বিশ্বের সুদূর অঞ্চলগুলিতে অবস্থিত—যদিও কোয়েসারদের মতো অত দূরে নয়। আর আলো ছাড়াও এগুলি থেকে বিপুল-পরিমাণে এক্স-রে ও রেডিওতরঙ্গ আসছে। এগুলির সঙ্গে কোয়েসারদের গঠনের সম্পর্ক কী? N-galaxy-গুলি কি ক্রমশ আরো-ঘনীভূত হয়ে কোয়েসারে পরিণত হচ্ছে? এই পরিণতি কি ঘটছে gravitational collapse-এর ফলে?

তা যদি হয়, তাহলে অন্যান্য গ্যালাক্সিদের ক্ষেত্রেও কি এই ধরনের অভিকেন্দ্রিক সংকোচনের কোনো লক্ষণ দেখা যায়? বিজ্ঞানীরা মোটেই নিশ্চিত নন। কিন্তু পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হয় অনেক গ্যালাক্সির কেন্দ্রাঞ্চলে—এমন কি ছায়াপথের কেন্দ্রেও—এক ধরনের আলোড়ন চলছে; কখনো মৃদু, কখনো তীব্র। এবং সম্ভবত এই আলোড়নের মূলে আছে thermonuclear শক্তি-উৎপাদন প্রক্রিয়া আর অভিকেন্দ্রিক শক্তির মধ্যেকার সেই দ্বন্দ্ব, যা আমরা নক্ষত্রদের অভ্যন্তরে লক্ষ করেছি। তবে বিপুল গ্যালাক্সিকেন্দ্রের এই আলোড়ন নক্ষত্রকেন্দ্রের আলোড়নের চেয়ে বহু বহু গুণে তীব্র। পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হয়, কোনো কোনো গ্যালাক্সির কেন্দ্রে এক ধরনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ গ্যাস ও ধূলোর মেঘ বেরিয়ে আসছে। এই ধরনের গ্যালাক্সিগুলির মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ চেহারা হচ্ছে দক্ষিণ আকাশের Centaurus মণ্ডলের ভিতর দিয়ে দেখা Galaxy NGC 5128 (Centaurus A), এবং উত্তর আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডলের (Ursa Major-এর) ভিতর দিয়ে দৃশ্য M-82 (NGC 3034)। (রঙিন প্লেট 11 দেখুন।) কন্যারাশির M87 গ্যালাক্সিটির কেন্দ্রনির্গত এক্স-রে-বিকিরক jet-টিও এই জাতীয় আলোড়নের আভাস দেয়।) আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থলটি সম্বন্ধে এখন অনেক কিছু জানা গেছে—রেডিও টেলিস্কোপ এবং কৃত্রিম উপগ্রহে বসানো infra-red রশ্মি, ultraviolet রশ্মি ও X-রশ্মিগ্রাহী টেলিস্কোপের মাধ্যমে। তার থেকে মনে হয়, কয়েক কোটি বছর আগে ছায়াপথের nucleus অঞ্চলে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে গেছে, যার থেকে উদ্ভূত গ্যাস ও ধূলিপুঞ্জ, বিশেষত হাইড্রোজেনের মেঘ, দ্রুতবেগে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে ক্রমিক অভিকেন্দ্রিক সংকোচনের ফলে আমাদের ছায়াপথ ক্রমশ একটি N-galaxy-তে, এবং শেষ পর্যন্ত একটি quasar-এ পরিণত হবে? আর, quasar-রা নিজেরা কি black hole-এ পরিণত হতে চলেছে? তাহলে সমস্ত গ্যালাক্সিরই কি শেষ পর্যন্ত ঐ একই পরিণাম দাঁড়াবে? অভিকেন্দ্রিক ও তাপ-পারমাণবিক শক্তির দ্বন্দ্বজাত পুনঃপুনঃ সংকোচন ও বিস্ফোরণের ফলে (i) একদিকে বিপুল পরিমাণে গ্যাস ও ধূলিপুঞ্জ উৎক্ষেপিত হয়ে চতুর্দিকের মহাকাশে ছড়িয়ে পড়বে আর (ii) অন্যদিকে কেন্দ্রস্থলগুলি কি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে এক-একটি ভীষণ-ভরসম্পন্ন black hole-এ পরিণত হবে? বিশ্বলোক কি তাহলে শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হবে চিরপ্রসারিত

মহাশূন্যে ক্ষীণভাবে ছড়ানো কতকগুলি ব্ল্যাক হোলের অদৃশ্য অভিকর্ষ-আবর্তে? নাকি, আমাদের অজানা, অলক্ষিত কোন শক্তি বা প্রক্রিয়া এই ভয়াবহ পরিণতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে? নাকি, গ্যালাক্সিদের বিবর্তনের এই কল্পিত ধারাটিই ঠিক নয়?



চিত্র 33

সাদা-কালো প্লেট 11-এ প্রদর্শিত Virgo Cluster-এর M87 গ্যালাক্সিটির আর একটি চিত্র। কেন্দ্রে সম্ভাব্য ব্ল্যাকহোলের প্রচণ্ড আলোড়নে উৎক্ষিপ্ত গ্যাসস্রোত বা jet-টি এখানে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। যে দৃশ্য আলোটুকু ধরা পড়েছে তা ছাড়াও এই jet-টি থেকে প্রচণ্ড-পরিমাণ X-Ray বিকিরণ ঘটছে।

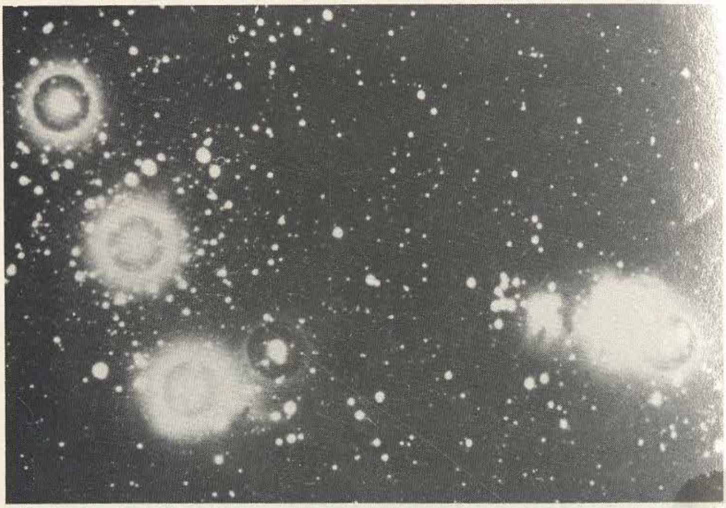
আবার প্রায়-বিপরীত এক ধরনের চিন্তাও দেখা দিয়েছে। কোয়েসাররা বহুদূরের, অর্থাৎ বিশ্বের সুদূর অতীতের ব্যাপার। হয়তো এরা গ্যালাক্সি-গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ের নিদর্শন। হয়তো এই আদি পর্যায়ে গ্যালাক্সিকেন্দ্রে প্রচণ্ড অভিকর্ষজনিত সংকোচন ঘটে—যার ফলে ঐ বিক্ষুব্ধ কেন্দ্র থেকে ঐ অস্বাভাবিক পরিমাণ এক্স-রে, আলো ও রেডিও-রশ্মি নির্গত হয়। হয়তো ঐ কেন্দ্রীয় বিক্ষোভের প্রচণ্ডতা কালক্রমে প্রশমিত হয়, গ্যালাক্সিকেন্দ্রস্থ কোয়েসারের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য কমে আসে, এবং গ্যালাক্সিটি ছায়াপথ বা M-31-এর মতো আপেক্ষিক ভারসাম্যের অবস্থায় এসে দাঁড়ায়।

সে যাই হোক, এই প্রক্রিয়ার অন্য দিকটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ নতুন চিন্তার উদ্রেক করেছে। কোয়েসার ও বিভিন্ন ধরনের গ্যালাক্সি থেকে পর্যায়ক্রমে ঘটা বিস্ফোরণের (periodic explosion-এর) ফলে প্রকাণ্ড গ্যাস ও ধূলোর মেঘ মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয় বলে মনে করা হচ্ছে। (হয়তো এই প্রক্রিয়া থেকেই গ্যালাক্সিপুঞ্জের ভিতরের আন্তঃ-গ্যালাক্সীয় শূন্যাঞ্চলে লক্ষিত ক্ষীণ কিন্তু অতি-উত্তপ্ত বস্তুকণাসাগরের (intergalactic medium-এর) উৎপত্তি।)

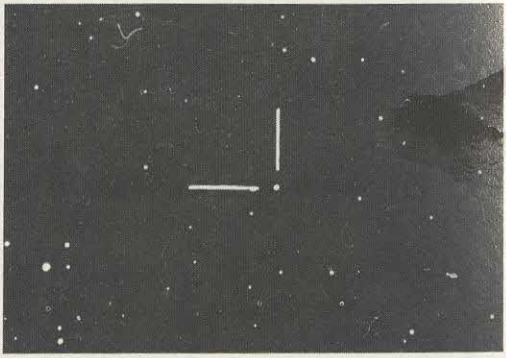


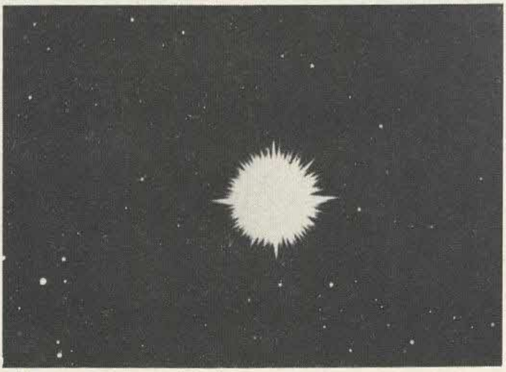
প্লেট 1

কালপুরুষের অশ্বমুণ্ড নীহারিকা অঞ্চল



প্লেট 2





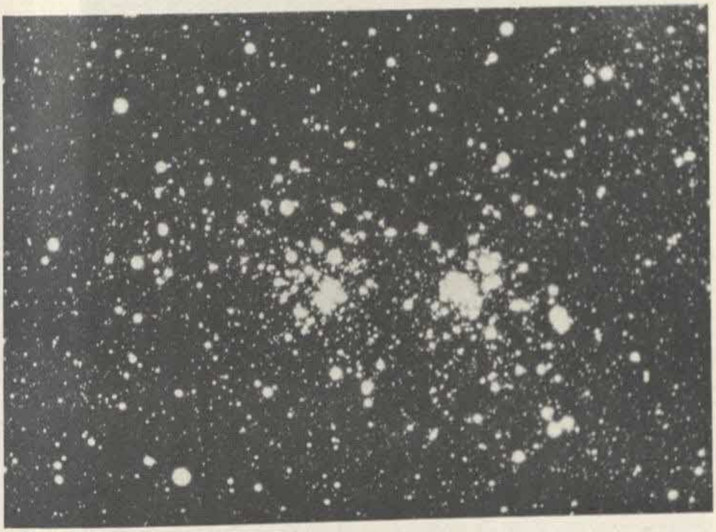
প্লেট 3

উপরে : কালপুরুষের কোমরবন্ধ ও তরবারি অঞ্চল

নিচে : 1934 সালে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত Nova Herculis। ওপরে ক্ষীণতম ও নিচে উজ্জ্বলতম অবস্থা। (Lick Observatory-র সৌজন্যে)

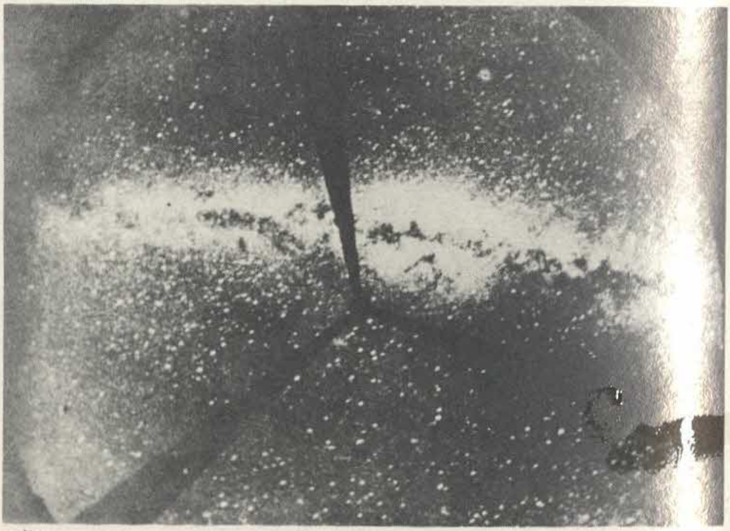


প্লেট 4

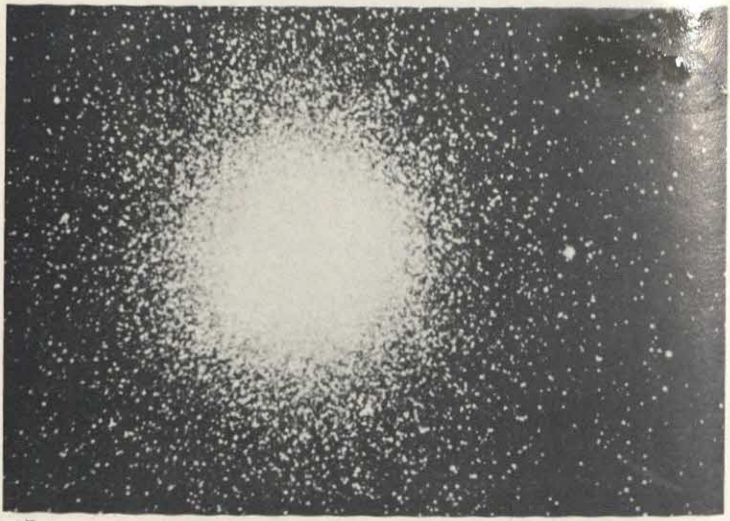


প্লেট 5

উপরে : Cone Nebula-য় উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ নীহারিকার সংমিশ্রণ
নিচে : Perseus মণ্ডলের বিখ্যাত Double Cluster

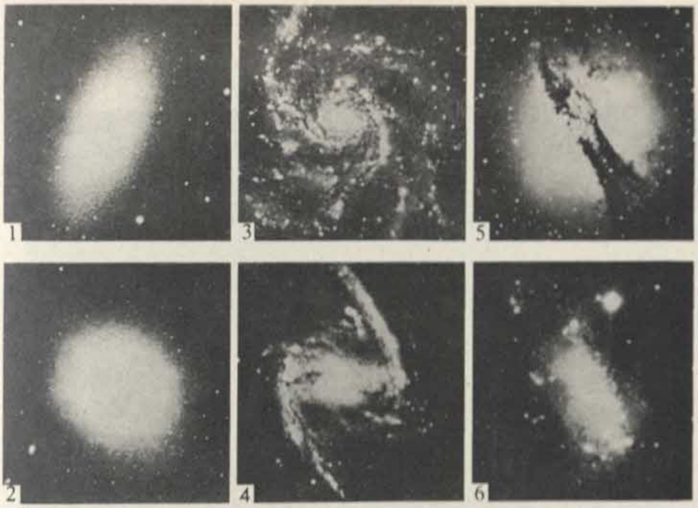


প্লেট 6



প্লেট 7

উপরে : Cygnus থেকে Sagittarius পর্যন্ত প্রসারিত ছায়াপথের উজ্জ্বলতম অংশ
নিচে : দশ লক্ষ তারার মহাপুঞ্জ গোলকাকার নক্ষত্রপুঞ্জ Omega Centauri



প্লেট 8



প্লেট 9

উপরে : বিভিন্ন আকৃতি ও গঠনের কয়েকটি গ্যালাক্সি

নিচে : M51—Whirlpool Galaxy (ঘূর্ণি গ্যালাক্সি) নামে পরিচিত



প্লেট 10

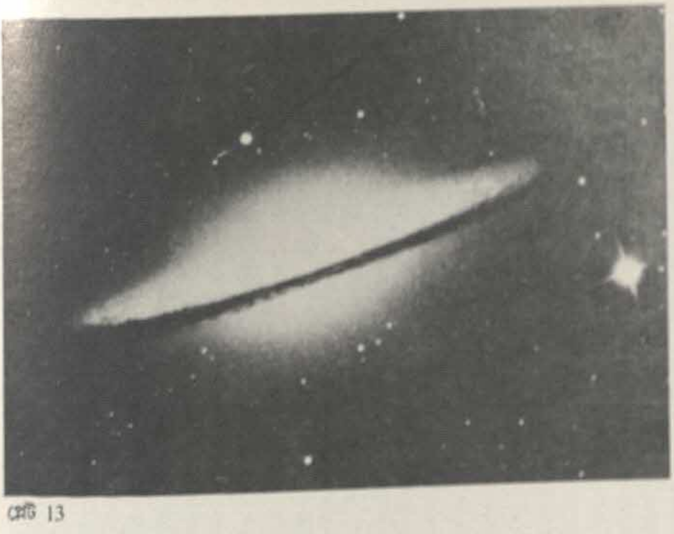


প্লেট 11

উপরে : অপূর্ব সুন্দর spiral গ্যালাক্সি M81
নিচে : Virgo-পুঞ্জের দানব গ্যালাক্সি M87



প্লেট 12

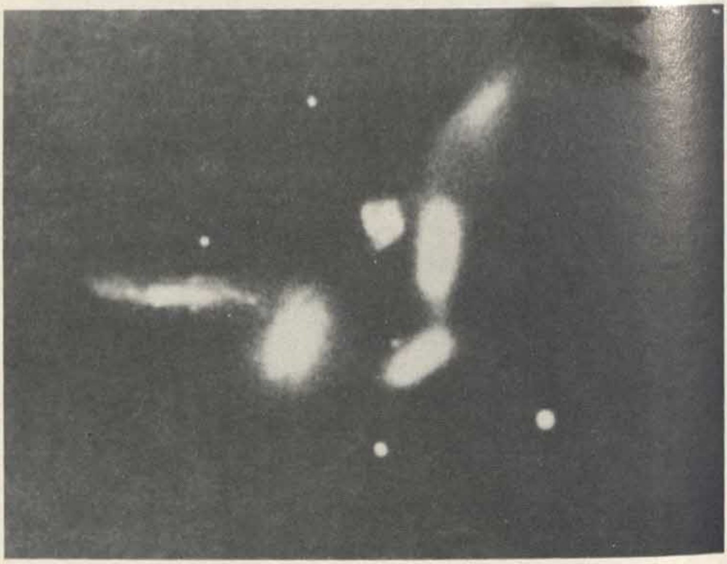


প্লেট 13

উপরে : ছায়াপথের অনুচর-গ্যালাক্সি Large Magellanic Cloud
নিচে : অপূর্বদর্শন মহাকায় Sombrero Galaxy



প্লেট 14



প্লেট 15

উপরে : দূরবিশ্বের অবিশ্বাস্য উজ্জ্বল বস্তুগুলির একটি—Quasar 3C 273
নিচে : দূর মহাকাশে পাঁচটি বিচিত্রদর্শন গ্যালাক্সির সমাবেশ

একদিকে এই little big bangs বা ছোটোখাটো মহাবিস্ফোরণগুলিকে বিশ্বের সেই Big Bang উৎপত্তির অতিরিক্ত প্রমাণ বলে মনে করা যেতে পারে। অন্যদিকে Steady State বিশ্বের সমর্থকরা মনে করেন, এইভাবে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত বিশাল বিশাল গ্যাস আর ধূলোর মেঘ থেকে কালক্রমে নতুন নতুন গ্যালাক্সির সৃষ্টি হতে পারে। বিশ্বপরিসরের প্রসারণের ফলে পুরোনো গ্যালাক্সিগুলি দূরে সরে যাওয়ার ফলে যে-সব ফাঁক সৃষ্টি হবে সেই ফাঁকগুলোতে ধীরে ধীরে জেগে উঠবে এই নতুন গ্যালাক্সিগুলি। সুতরাং প্রসারণ সত্ত্বেও বিশ্বের সামগ্রিক চেহারা এক রকমই থেকে যাবে। বিশ্বের উৎপত্তি একটা বিরাট বিস্ফোরণের মাধ্যমে হয়ে থাকলেও, মহাশূন্যের ফাঁকে ফাঁকে (কোয়েসার ও গ্যালাক্সিসমূহ থেকে বহিষ্কৃত বস্তুপুঞ্জ দিয়ে গঠিত) এই নতুন গ্যালাক্সিদের আবির্ভাব বিশ্বচিত্রটিকে steady অর্থাৎ সমভাবাপন্ন রাখবে। Little big bang-এর ধারণার সঙ্গে জড়িত এই নতুন বিশ্বতত্ত্বটিকে তাই এক ধরনের Modified Steady State Theory বলা হয়।

Hawking-এর Black Hole Radiation

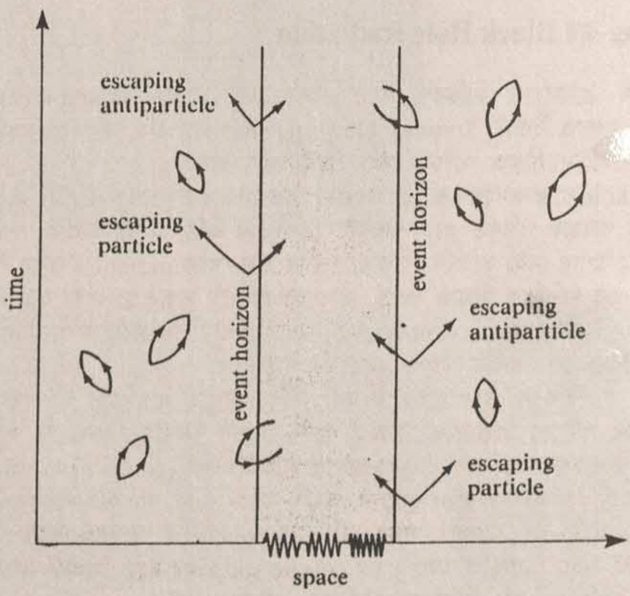
এই প্রসঙ্গে ব্ল্যাকহোল - বিকিরণ ও ব্ল্যাকহোল-এর অস্থিতি (instability) সম্বন্ধে কেমব্রিজের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী Stephen Hawking-এর গভীর এবং দুরূহ তত্ত্বচিন্তার একটা সংক্ষিপ্ত ও অতিসরলীকৃত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাক।

Black hole বা কৃষ্ণগহ্বর তো তার সর্বজয়ী অভিকর্ষবলে সব-কিছুকেই টেনে নিয়ে একটা প্রায়-বিন্দুবৎ অবস্থায় পরিণত করে। বস্তুকণা তো দূরের কথা, আলোকরশ্মিরও তার কবল থেকে মুক্তির উপায় নেই। তা যদি হয় তাহলে ব্ল্যাকহোল থেকে radiation আসে কী করে? অথচ হকিং-এর গাণিতিক সিদ্ধান্ত বলছে, ব্ল্যাকহোলকে যদি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করা সম্ভব হয় তাহলে তার ঘটনা-দিগন্তের (event horizon-এর), অর্থাৎ তার সর্বগ্রাসী আকর্ষণ-পরিধির চারিদিকে, বিকিরণের একটা অস্পষ্ট আভা দেখা যাবে।

আসলে ঐ বিকিরণ কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর থেকে আসছে না। তার উৎপত্তি event horizon-এর বাইরের প্রান্তদেশে। আমরা জানি, বিশেষ অবস্থায় বস্তুকণা ও শক্তিকণার পারস্পরিক রূপান্তরণ সম্ভব এবং উচ্চশক্তিসম্পন্ন গামারশ্মিকণা (gamma photon) থেকে বিশেষ অবস্থায় ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগলের, অর্থাৎ একটি real ও একটি বিপরীত-চার্জযুক্ত virtual particle-এর, উৎপত্তি সম্ভব। Big Bang সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনাকালেও আমরা দেখেছি, সেই প্রচণ্ড উত্তপ্ত ও অসম্ভব ঘন cosmic soup-এর মধ্যে কীভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে শক্তিকণার বস্তুকণায় এবং বস্তুকণার শক্তিকণায় রূপান্তর ঘটে।

এখানে ব্ল্যাকহোলের প্রান্তদেশে তাপের তাড়না নেই, আছে অভিকর্ষের মারাত্মক চাপ। Black hole-এর পরিধিপ্রান্তের মহাশূন্য (স্থান-কাল পরিসর বা space-time continuum) ঐ ভীষণ অভিকর্ষের পীড়নে দুমড়ে গিয়ে এক চরম বিকৃত অবস্থায় থাকে। Gravitational energy-র ঐ প্রচণ্ড পীড়নে শূন্য থেকেই জোড়ায় জোড়ায় নানাজাতীয় particle-antiparticle pair সৃষ্টি হয়। প্রতিটি জোড়ের একটি কণা সৎ (real) ও অন্যটি অসৎ (virtual)। অর্থাৎ একটি পজিটিভ-শক্তিসম্পন্ন ও অন্যটি নেগেটিভ শক্তিযুক্ত। বহু ক্ষেত্রেই এই দুটি বিপরীত-কণা একটি বিন্দু থেকে উৎপন্ন হয়ে ছিটকে দুদিকে বেরিয়ে গিয়ে আবার বেঁকে ফিরে এসে পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলে।

কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই নেগেটিভ অর্থাৎ virtual কণাটি জন্মানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্ল্যাকহোল-এর মধ্যে গ্রস্ত হয়। আর real অর্থাৎ পজিটিভ কণাটির দুরকম পরিণতি হতে পারে। তার শক্তি পজিটিভ প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও (Pauli Exclusion Principle অনুযায়ী) ব্ল্যাকহোল-এর মারাত্মক অভিকর্ষের প্রভাবে তার পজিটিভ শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে যাবে, এমন-কি কোনো ক্ষেত্রে চরমভাবে ক্ষীণায়িত হয়ে নেগেটিভ শক্তিতেও পর্যবসিত হতে পারে। সে অবস্থায় ওটিও কৃষ্ণগহ্বরে শোষিত হতে পারে। পক্ষান্তরে, কণাটি তার অবশিষ্ট পজিটিভ শক্তির জোরে ব্ল্যাকহোল-এর অভিকর্ষ-আবেষ্টনী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে পালিয়ে যেতে পারে। মূলত, ব্ল্যাকহোল-এর প্রান্তদেশে জাত এবং সেখান থেকে পলায়নকারী এই জাতীয় অসংখ্য কণার স্রোতকেই আমরা black hole radiation হিসাবে দেখতে পাবো—এবং সর্বগ্রাসী ব্ল্যাকহোল-এর ভিতর থেকে কী করে রশ্মি বা কণা নির্গত হচ্ছে তা ভেবে অবাক হবো।



চিত্র 34

Black hole -এর প্রান্তদেশে Hawking -কল্পিত কণাসৃষ্টি- কণাবিলয় প্রক্রিয়ার একটি ছক। নিচের অনুভূমিক রেখাটি স্থান-নির্দেশক। বাঁদিকের ঊর্ধ্বমুখী রেখাটি কাল-নির্দেশক। বহুক্ষেত্রেই কণা-জোড়া জন্মে আবার পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জোড়ার একটি কৃষ্ণগহ্বরে গ্রস্ত হচ্ছে। অন্যটি মহাশূন্যে পালিয়ে যাচ্ছে।

আর সেই-যে নেগেটিভ-শক্তিসম্পন্ন কণাটি ব্ল্যাকহোল-এর ভিতরে ঢুকে গেলো সেটিরও তাৎপর্য কম নয়। Black hole-এর ভিতরে যে চরম-পিষ্ট বস্তু-রশ্মি বা তার কোনো ধরনের অবশেষ থাকে, তার energy স্বভাবতই পজিটিভ প্রকৃতির। সেখানে যেই একটি

নেগেটিভ-শক্তিসম্পন্ন কণা ঢুকলো, সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঐ পরিমাণ পজিটিভ শক্তি নাকচ হয়ে গেল। ঐভাবে বাইরের অভিকর্ষ-পীড়িত ক্ষেত্র থেকে অনবরত নেগেটিভ কণা প্রবেশের ফলে black hole-এর ভর—যত ধীরেই হোক— ক্রমশই কমতে থাকে। অর্থাৎ তার অবস্থা হয় অস্থিত (unstable)। এই প্রক্রিয়ার কল্পিত চরম পরিণতি হচ্ছে ব্ল্যাকহোলগুলির অনিবার্য অবক্ষয়—এবং শেষ পর্যায়ে একটা সম্ভাব্য মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্তি।

বিশ্বলোকে Antimatter-এর উপস্থিতির প্রশ্ন

Quasar -দের প্রচণ্ড শক্তি -উৎপাদনের রহস্যের মূলে অভিকর্ষশক্তির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। এ ছাড়াও আর একটি সন্দেহ এই যে quasar-দের (এবং হয়তো গ্যালাক্সিদেরও) কেন্দ্রস্থলে কিছু-পরিমাণ প্রতিবস্তু(antimatter)আছে। আমরা জানি, কোনো একটি বস্তুকণা (ইলেকট্রন) তার বিপরীতকণা বা anti-particle-এর (পজিট্রনের) সংস্পর্শে এলেই দুটি কণাই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে কতকগুলি উচ্চশক্তিসম্পন্ন রশ্মিকণায়, অর্থাৎ গামারশ্মির photon-এ পরিণত হয়। প্রোটনের সঙ্গে অ্যান্টিপ্রোটনের বা নিউট্রনের সঙ্গে অ্যান্টিনিউট্রনের সম্পর্কও একইরকম। Antimatter বলে যদি কিছু থাকে তাহলে তার গঠনে হাইড্রোজেনের বদলে থাকবে anti-hydrogen, এবং এইভাবে antihelium, anticarbon, anti-iron ইত্যাদি। এই antimatter যদি সামান্য পরিমাণেও কোয়েসারদের মধ্যে উপস্থিত থাকে, তাহলে তারা matter-এর সংস্পর্শে আসার ফলে যে ভীষণ ধ্বংসলীলা সংঘটিত হতে পারে তার থেকেই কোয়েসারদের ঐ অস্বাভাবিক শক্তিস্রোত সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এ সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তের দিকে এগোনো যায়নি।

কিন্তু antimatter-এর উদ্ভব, প্রকৃতি ও ভূমিকার প্রশ্নটি একটি বিরাট প্রশ্ন। তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণ দুই-ই বলে, রশ্মিকণা থেকে কোন বস্তুকণা যদি সৃষ্টি হয়, তবে একই সঙ্গে তার বিপরীতকণাও সৃষ্ট হয়ে দুটি কণা পরস্পরের উল্টোদিকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। শুধু ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়া নয়, কৃত্রিম উপায়ে proton-antiproton জোড়া এবং neutron-antineutron জোড়াও সৃষ্টি করা গেছে।

তাহলে প্রথম যখন—Big Bang অগ্নিকুণ্ডের প্রথম পর্যায়ে—প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কণা দারুণ উত্তপ্ত রশ্মিপুঞ্জ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলি নিশ্চয় জন্মেছিল জোড়ায় জোড়ায়। অর্থাৎ যতগুলি প্রোটন ঠিক ততগুলি অ্যান্টিপ্রোটন, যতগুলি নিউট্রন ততগুলি অ্যান্টিনিউট্রন, যতগুলি ইলেকট্রন ততগুলি পজিট্রন সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তাহলে আমরা বিশ্বের বস্তুজগতে শুধু প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন দেখি কেন? Antiproton, antineutron, positron দেখি না কেন? বিশেষ অবস্থায় মাঝে মাঝে এক-একটা বিপরীত-কণা হয়তো সেকেন্ডের দশকোটি ভাগের এক ভাগের জন্য ঝলক দিয়ে যায়; কিন্তু আমাদের জগতের বস্তুর সংগঠনের মধ্যে তাদের কোনো খোঁজ নেই কেন? আদিযুগে সৃষ্ট বিপরীতকণাগুলি গেল কোথায়?

Antimatter-এর অন্তর্ধানের রহস্য : দুটি সমাধান

বিশ্বতাত্ত্বিকরা এই সমস্যার দুরকম সমাধানের আভাস দিয়েছেন। আদি মুহূর্তগুলিতে কোনো

কণা ও তার বিপরীতকণা যেমন একসঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি ঐ প্রচন্ড ঘন cosmic soup-এর মধ্যে আবার কণা আর বিপরীত-কণারা সারাক্ষণই পরস্পরকে ধ্বংস করে যাচ্ছিলো। যখন তাপমাত্রা কিছুটা নেমে আসার ফলে রশ্মি থেকে প্রোটন-অ্যান্টিপ্রোটন আর হচ্ছিলো না, তখন থেকে তাহলে পরস্পরকে ধ্বংস করতে করতে প্রোটন ও অ্যান্টিপ্রোটন দুয়েরই সংখ্যা সমানভাবে কমে আসতে লাগলো। নিউট্রন-অ্যান্টিনিউট্রন এবং ইলেকট্রন-পজিট্রনদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটার কথা। তাহলে তো শেষ পর্যন্ত সমস্ত কণা (ও বিপরীতকণা) ধ্বংস হয়ে যাবার কথা। তা হয়নি কেন?

প্রথম সম্ভাব্য সমাধান : সৃষ্টিকালে, যে-কোনো কারণেই হোক, বিপরীতকণার চেয়ে কণা, অর্থাৎ antiproton, antineutron ও positron-এর চেয়ে proton, neutron ও electron কিছু বেশি সংখ্যায় সৃষ্ট হয়েছিলো। তাই পারস্পরিক ধ্বংসক্রিয়ার শেষে "অল্পসংখ্যক" (কার্যত অগণ্য কোটি) প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন উদ্বৃত্ত থেকে যায়, এবং এই "অল্পসংখ্যক" উদ্বৃত্ত কণা থেকেই বিশ্বের এই কোটি কোটি গ্যালাক্সি গঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা : প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত রকমের কণা ও বিপরীতকণা একেবারে সমান সংখ্যায়ই সৃষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু আদিম অগ্নিকুণ্ডের প্রসারণের কোনো এক পর্যায়ে—কোনো অজানা কারণে—কণাগুলি (matter) এবং বিপরীতকণাগুলি (antimatter) আলাদা হয়ে গিয়ে বিশ্বের দুটি ভিন্ন অঞ্চলে সংগৃহীত হয়। আমরা বিশ্বের যে অংশে বাস করি সেটি matter দিয়ে গঠিত, আর যে অংশ antimatter দিয়ে গঠিত সেটি অনেক ব্যবধানে আছে—যার জন্য দুটি জগতের মধ্যে কোনো পারস্পরিক ধ্বংসক্রিয়া ঘটছে না। আবার একথাও কেউ কেউ বলছেন, হয়তো দুই বিশ্বের প্রান্তদেশে কোথাও কোথাও matter-antimatter-এর পারস্পরিক বিনাশ ঘটছে, এবং রহস্যময় মহাজাগতিক রশ্মিগুলি (cosmic radiation) হয়তো ঐ ধ্বংসলীলারই সৃষ্টি।

দুটি সমাধানই অনুমানভিত্তিক। আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে antimatter-এর স্থায়ী উপস্থিতির কোনো সন্ধান আমরা পাইনি। টেলিস্কোপ ইত্যাদির সাহায্যে যে কয়েকশো কোটি আলোকবর্ষ দূর পর্যন্ত আমরা নজর করতে পেরেছি তার মধ্যে antimatter-এর উপস্থিতির কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। (বড় জোর quasar-দের অস্বাভাবিক শক্তি-উৎপাদন দেখে আমাদের মনে antimatter-এর উপস্থিতির কথা মনে হয়েছে।) Antimatter দিয়ে তৈরি কোনো গ্যালাক্সি দূরশূন্যে বিচ্ছিন্নভাবে থাকলেও আমরা বুঝতে পারবো না যে সেটা অন্যরকম বস্তু দিয়ে তৈরি। কারণ তার বার্তা বয়ে আনবে আলো—photon—যা matter ও antimatter থেকে একইভাবে বিকীর্ণ হয় এবং যার কোনো বিপরীতকণা নেই। Cosmic ray, যা প্রধানত অতি উচ্চশক্তিসম্পন্ন প্রোটনের স্রোত, তার মধ্যেও কেউ কখনো কোনো antiproton-এর সন্ধান পায়নি।



আট

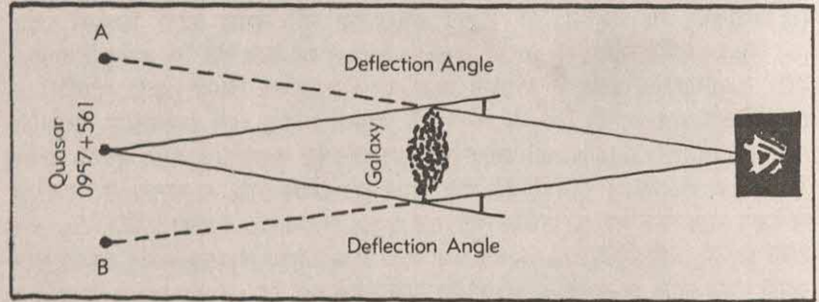
বিশ্বহৃদয়ে চতুঃশক্তির স্পন্দন

আধুনিক পদার্থবিদ্যার ধারণায় বিশ্বের এই বিচিত্র ক্ষেত্রে মূলত চারটি ভিন্ন ধরনের শক্তি বা আন্তঃক্রিয়া (interaction) কাজ করে চলেছে। দুটি অনেক আগে থেকে পরিচিত : (i) মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষ, যা বিশ্বের যে-কোনো দুটি কণার মধ্যে বিদ্যমান, আর (ii) বিদ্যুৎ-চুম্বকীয়-শক্তি (electromagnetic force) যার ফলে পজিটিভ চার্জযুক্ত কণাদের মধ্যে বা নেগেটিভ চার্জযুক্ত কণাদের মধ্যে থাকে স্বাভাবিক বিকর্ষণ, আর পজিটিভ ও নেগেটিভের মধ্যে থাকে ঠিক ঐ পরিমাণেই আকর্ষণ। কিন্তু পরে কোআন্টাম বলবিদ্যার (quantum mechanics-এর) অগ্রগতির ফলে অতিক্ষুদ্র কণাজগতে আরো দুরকম শক্তির অস্তিত্ব ধরা পড়লো। (iii) প্রোটনরা পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয়; তা সত্ত্বেও ঐ বিকর্ষণকে অতিক্রম করে অনেকগুলো প্রোটন আর তার ওপরে আবার অনেকগুলো নিউট্রন (Iron-এ 26টি প্রোটন 30টি নিউট্রন, Uranium-এ 92টি P ও 146টি N) এক-একটা পরমাণুকেন্দ্রে জমাট বেঁধে থাকে যে-প্রচণ্ড আকর্ষণশক্তির বলে তাকে বলা হয় strong force বা strong interaction (সংক্ষেপে SI)। (iv) আর যে ধরনের বিক্রিয়ায়—ধরা যাক—নিউট্রন রূপান্তরিত হয় একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন ও একটি অ্যান্টি-নিউট্রিনোয়, যে প্রক্রিয়ায় পরমাণুদের তেজস্ক্রিয় (radioactive) অবক্ষয় ঘটে, তাকে বলা হয় weak force বা weak interaction (সংক্ষেপে WI)। এই দুর্বল প্রক্রিয়াটির এক প্রচণ্ড অভিব্যক্তি লক্ষিত হয় যখন কোনো supernova-র লৌহগঠিত কেন্দ্রস্থলটি নিজের নিদারুণ অভিকর্ষের চাপে collapse করে, এবং ঐ কেন্দ্রের অগণ্য কোটি প্রোটন অগণ্য কোটি ইলেকট্রনের সঙ্গে (এক-একটি করে) একীভূত হয়ে গিয়ে এক অতিবিপুল neutrino-স্রোত উদ্গীর্ণ করে—যার চাপেই সম্ভবত মহানক্ষত্রটির সমস্ত বহিরাংশটি বিধ্বস্ত হয়ে মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত হয়।

কোনো পরমাণু-কেন্দ্রকের গঠন, বিশেষত হিলিআম বা লোহা জাতীয় কেন্দ্রকের বাঁধুনি, অসাধারণ শক্ত। বৈদ্যুতিক বিকর্ষণকে অনায়াসে নাকচ করে কণাগুলিকে এই সুদৃঢ় বাঁধনে বেঁধে রাখে যে শক্তি (SI) তার প্রকৃতি আজও রহস্যাবৃত। মহাকাশ থেকে আসা cosmic radiation-এ প্রোটন নিউট্রন ইত্যাদি ভারি কণাদের (hadron) আন্তঃক্রিয়া লক্ষ্য করে, আর গবেষণাগারে প্রোটন ও নিউট্রনদের কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রচণ্ড গতিশক্তিযুক্ত করে (নানারকম accelerator যন্ত্রের মাধ্যমে) তাদের আচরণ লক্ষ্য করে এই SI শক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়েছে। প্রোটন ও নিউট্রনদের সাধারণ নাম nucleon। মনে করা হয়, পরমাণুকেন্দ্রকের ভিতর nucleon-গুলির মধ্যে সারাক্ষণই এক ধরনের কণা-বিনিময় চলছে, এবং এই অবিশ্রান্ত

বিনিময়-প্রক্রিয়াই প্রোটন ও নিউট্রনগুলিকে ঐ সুদৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। এদের মধ্যে যে কণাগুলির বিনিময় হচ্ছে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে meson (অর্থ: মাঝারি ভরের কণা)। বহু রকমের meson এই বিনিময় প্রক্রিয়ায় কার্যকরী; তবে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হচ্ছে pi-meson বা pion—যার ভর প্রোটনের 1/7 এর মতো, এবং যার তিনরকম চরিত্র হতে পারে: পজিটিভ বা নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট, বা চার্জহীন (neutral)।

Pion ছাড়াও আরো অন্তত পাঁচ রকমের meson এই strong interaction -এর সঙ্গে জড়িত। তাছাড়াও সময়ে সময়ে আর এক আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। Nucleon-দের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে বিশেষ অবস্থায় প্রোটনের চেয়ে বেশি ভরের কণাও সাময়িকভাবে উৎপন্ন হয়। এদের বলা হয় hyperon অর্থাৎ অতিরিক্ত বা অত্যধিক ভরের কণা। এদের কারুরই জীবনকাল অবশ্য এক সেকেন্ডের একশো কোটি ভাগের এক ভাগও নয়। তার পরেই এরা

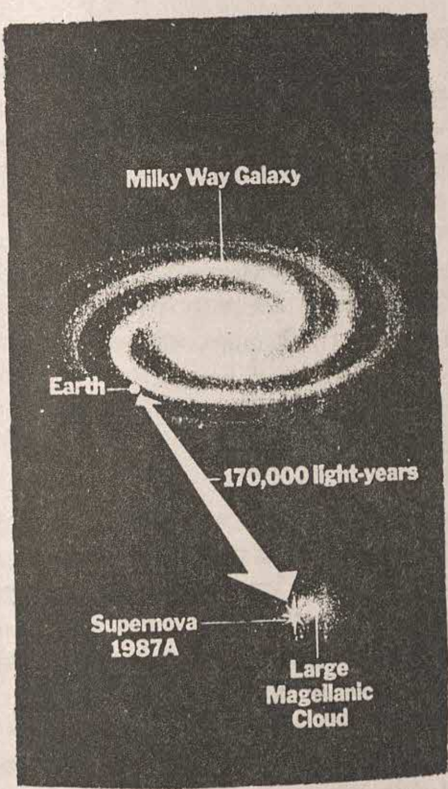


চিত্র 35

আলোকও মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা প্রভাবিত হয়— আইনস্টাইন-এর এই আবিষ্কারের একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। 500 কোটি আলোকবর্ষ দূরের এক কোয়েসার-এর আলো মাঝপথের একটি গ্যালাক্সির দুপাশ দিয়ে আসতে গিয়ে ঐ গ্যালাক্সির প্রচণ্ড অভিকর্ষের টানে ভিতরের দিকে একটু বেঁকে এসে আবার একটি আলোকরশ্মিগুচ্ছ হয়ে আমাদের চোখে (টেলিস্কোপে) পৌঁছচ্ছে। ফলে আমরা একই কোয়েসারের দুটি প্রতিবিম্ব (image) A ও B দেখছি। গ্যালাক্সিটি এক্ষেত্রে একটি gravitational lens-এর কাজ করছে।

নানারকম ক্ষুদ্রতর বস্তুকণায় ও রশ্মিকণায় (photon-এ) ভেঙে পড়ে। মোটামুটি সাতরকম hyperon-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। Meson-দেরও অস্তিত্ব ঐ-রকমই ক্ষণিক। Meson আর hyperon মিলে এই যে গোটা পনেরো অন্তর্বর্তী কণা (—ক্রমশই আরো নতুন নতুন কণা আবিষ্কৃত হচ্ছে—), এদের প্রত্যেকটির ভর, চার্জ ও জীবনকাল কোআন্টাম-বিজ্ঞানীরা মেপে ফেলেছেন। কিন্তু তবু এরা অসৎ কণা (virtual particle), সৎ কণা (real particle) নয়। কারণ বস্তুজগতে এদের কোন স্থায়ী অস্তিত্ব নেই। আমাদের জগতের স্থায়ী (বা প্রায়-স্থায়ী) nucleon-দের যখন পারস্পরিক রূপান্তরণ ঘটে তখন সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে এরা নিমেষের জন্য জেগে ওঠে ছায়ামূর্তির মতো। আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়।

এই SI শক্তিটি কিন্তু কার্যকরী অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরের ভিতর। এক মিটারের এক কোটি কোটি ভাগের এক ভাগের (10^{-15} m.) মধ্যেই শুধু এই প্রচণ্ড আকর্ষণশক্তি কার্যকরী; তার বাইরে নয়। আর এই শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় শুধু neucleon-জাতীয় ভারি কণারা, অর্থাৎ



চিত্র 36

আমাদের Milky Way গ্যালাক্সি এবং প্রতিবেশী গ্যালাক্সি Large Magellanic Cloud (LMC) যার মধ্যে সম্প্রতিকালের উজ্জ্বলতম সুপারনোভাটির আবির্ভাব হয়েছিল। LMC এবং তার খুব কাছে অবস্থিত Small Magellanic Cloud (SMC) ছায়াপথ-গ্যালাক্সির দুটি ক্ষুদ্র অনুচর। LMC-র উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বিখ্যাত উজ্জ্বল গ্যাসপুঞ্জ উর্ণনাভ নীহারিকা বা Tarantula Nebula–আমাদের জানা বিশ্বের সমস্ত নীহারিকার মধ্যে বিশালতম। এর দক্ষিণ প্রান্তেই আবির্ভূত হয়েছিল ঐ সুপারনোভাটি যার দীপ্তি সাময়িকভাবে সমস্ত গ্যালাক্সিটির দীপ্তির প্রায় সমান হয়ে উঠেছিল। (Time পত্রিকার সৌজন্যে)

প্রোটনরা, নিউট্রনরা, meson-রা আর hyperon-রা। আশ্চর্য ব্যাপার, electron-দের বা neutrino-দের ওপর এই প্রচণ্ড শক্তির কোন প্রভাবই নেই। আর বিশেষ কয়েক রকমের আন্তঃক্রিয়ায় muon নামে একরকম নেগেটিভ-চার্জযুক্ত কণা (আর একটি virtual particle) ক্ষণেকের জন্য উৎপন্ন হয়। তার ভর ইলেকট্রনের 207 গুণ। একে এক ধরনের অতি-ক্ষণস্থায়ী ভারি ইলেকট্রন বলা যায়। এটিও SI শক্তির প্রভাবের বাইরে। যে শক্তিটিকে বলা হয় "দুর্বল শক্তি" বা weak interaction তার প্রভাবের মধ্যে পড়ে এই electron, neutrino এবং অতি-ক্ষণস্থায়ী muon। (এই তিন রকম কণাকে বলা হয় lepton বা লঘু কণা।)

এই weak interaction-এর জোর strong interaction-এর মাত্র 10,000 কোটি ভাগের এক ভাগ (10^{-12})—যদিও নিছক পরিমাণের বিপুলতার দরুন এই WI-এর মাধ্যমেই supernova explosion-এর মতো মহাবিধ্বংসী প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

'বর্ণ-গন্ধ-বৈচিত্র্যময়" সূক্ষ্মতর কণাজগৎ?

সম্প্রতিকালে জেলম্যান (Murray Gell-mann) এবং জোআইগ (George Zweig) কণাজগৎ সম্পর্কে আর একটি বিচিত্র তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছেন। এই ধারণা অনুযায়ী শুধু leptonগুলি, অর্থাৎ ইলেকট্রন ও নিউট্রিনোরাই মৌলকণা। Hadronগুলি, এমনকি প্রোটন ও নিউট্রনরাও আসলে মৌলকণা নয়; তারা কয়েক ধরনের ক্ষুদ্রতর মৌলকণা দিয়ে গঠিত। এদের নাম দেওয়া হয়েছে quark—উপন্যাসিক James Joyce-এর Finnegans Wake উপন্যাসের একটি রহস্যময় উক্তি "Three quarks for Muster Mark" থেকে। এই কোআর্ক-তত্ত্ব রচনায় কোআন্টাম্ বিজ্ঞানীদের কবিকল্পনা কীভাবে উৎসারিত হয়েছে তা ঐ কোআর্কদের নাম ও রূপবর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। এই quark-গুলি নাকি ছ' রকম "flavour"-এর: যথা—up, down, strange, charmed, bottom এবং top। (শেষ দুটির বিকল্প নাম beautiful ও true।) আবার এদের প্রত্যেকটি তিন রকম "colour"-এর হয় : red, yellow বা green আর blue। এই রকম প্রত্যেকটি quark-এর আবার একটি করে বিপরীতকণা বা antiquark আছে।

এই ধারণা অনুযায়ী lepton ও photon-রা ছাড়া আর সব কণাই হচ্ছে একাধিক quark-এর সমন্বয়। যেমন প্রত্যেকটি মেসন (nucleon-দের মধ্যে সারাক্ষণ যে-সব কণার বিনিময় হচ্ছে) নাকি একটি quark ও একটি antiquark দিয়ে গড়া। প্রোটনের মধ্যে আছে তিনটি কোআর্ক। দু'টি up ও একটি down (uud), আর নিউট্রনের মধ্যে থাকে একটি up ও দু'টি down-মার্কা কোআর্ক (udd)। কোআর্করা যে ইলেকট্রিক চার্জ বহন করে তা কিন্তু একের কম—ভগ্নাংশ (fractional charge)। যেমন up কোআর্কে থাকে $+\frac{2}{3}$ চার্জ; down ও strange কোআর্কে থাকে $-\frac{1}{3}$ চার্জ। তত্ত্বগতভাবে অনুমান করা হয়, gluon (glue বা আঠা থেকে) নামক একজাতীয় চার্জহীন ও স্থিতি-ভরহীন কণা কোয়ার্কগুলিকে দুটির (মেসন) গুচ্ছে বা তিনটির (প্রোটন বা নিউট্রন) গুচ্ছে বেঁধে রাখে।

রূপকথার মতো শুনতে হলেও এই ধারণা কিন্তু গভীর কোআন্টাম-তাত্ত্বিক চিন্তাপ্রসূত। তাছাড়া, 1973 সালে হারভার্ডের Hugh Politzer এবং প্রিন্সটনের David Gross ও Frank Wilczek এই চিন্তাসূত্রটিকে এক দৃঢ়তর গাণিতিক ভিত্তিতে স্থাপিত করেন—যদিও কোনো পরীক্ষার মাধ্যমেই আজ পর্যন্ত কোনো quark-এর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে আর একটি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ফল quark-তত্ত্বকে অনেকটা জোরালো করে তুলেছে। Hadron জাতীয় (ভারি) কণাদের মধ্যে একমাত্র প্রোটনই স্থায়ী বলে এতদিন ধারণা ছিল। নিউট্রন তো মুক্ত অবস্থায় মিনিট পনেরোর মধ্যেই রূপান্তরিত হয়ে যায়; কিন্তু প্রোটন অবিনশ্বর। কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়ে এবং খুব সাম্প্রতিক পরীক্ষা থেকে মনে হচ্ছে প্রোটনেরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে পড়া (spontaneous disintegration) সম্ভব। ভূপৃষ্ঠের অনেক নিচে, কোলার স্বর্ণখনির গভীরে এবং আল্পস্-পর্বতভেদী সুড়ঙ্গের ভিতরে, যেখানে প্রচণ্ড শক্তিমান cosmic

ray-রও পৌঁছোনোর উপায় নেই, সেখানে রাখা কোটি কোটি প্রোটনের দু-চারটিকে ভেঙে পড়তে দেখা গেছে—এরকম সংবাদ এসেছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তত্ত্ব অনুযায়ী এই ভাঙনের হার অবিশ্বাস্য রকমের কম। কিন্তু যত কমই হোক একটি প্রোটনেরও যদি স্বতঃস্ফূর্ত অবক্ষয় (spontaneous disintegration) লক্ষ্য করা যায় তাহলে প্রমাণিত হবে যে কোনো hadron-কেই ঠিক মৌলকণা বলা যায় না। তাহলে Quark theory-র অগ্রগতির পথে প্রোটনের অবিনশ্বরতা যে-বাধা সৃষ্টি করেছে তা আর থাকবে না।

(সাধারণ জিজ্ঞাসু পাঠকের জন্য লেখা এই রচনাটিতে আমি ভেবেচিন্তেই কোয়ান্টামতত্ত্ব-সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সম্পর্কে কোনো বিশেষ আলোচনা করিনি—যদিও এইসব তত্ত্বচিন্তার তাৎপর্য বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গে বহুবারই এই রচনায়



চিত্র 37

সত্যেন্দ্রনাথ বসু



চিত্র 38

মেঘনাদ সাহা

আলোচিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে মৌলিককণাদের প্রকৃতি ও আচরণগত শ্রেণীবিভাগসূচক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও আইনস্টাইন-কৃত Bose-Einstein Statistics, Fermi-Dirac Statistics ও Pauli Exclusion Principle।)

চারটি বিশ্বশক্তির আপেক্ষিক প্রবলতা

এই বিচিত্র বিশ্বক্ষেত্রে আমরা এই যে চার রকমের মৌলিক শক্তি বা interaction-এর বিজড়িত ক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি, এদের তীব্রতার অনুপাতের কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। যে শক্তিটি (SI) ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রে, অর্থাৎ পরমাণু-কেন্দ্রকের অভ্যন্তরে, কাজ করছে সেটিই হচ্ছে সবচেয়ে প্রচণ্ড। আর মাধ্যাকর্ষণ নামক যে শক্তিটি বিশ্বের সমস্ত বস্তু ও রশ্মিকণার মধ্যে বিদ্যমান, যে শক্তিটি ক্ষীণব্যাপ্ত নীহারিকা থেকে গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সিপুঞ্জ সৃষ্টি করে বিশ্বপরিসরের এই মহাসৌধটি গড়ে তুলেছে—সেই শক্তিটি হচ্ছে চারটি শক্তির মধ্যে সবচেয়ে

দুর্বল। Strong interaction-এর থেকে বিদ্যুৎ-চুম্বকশক্তি (electromagnetic force) অনেক দুর্বল। তার চেয়ে WI আবার আরো ক্ষীণ। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ weak interaction-এর চেয়ে আরো অনেক দুর্বল। WI-এর দশ হাজার কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র (10^{-25})।

কিন্তু তবু—অন্তত বিশ্বের বর্তমান পর্যায়ে—মহাকর্ষশক্তিরই জিত দেখা যাচ্ছে। তা নাহলে বিশ্বপ্রাঙ্গন জুড়ে এই অভিকর্ষ-রচিত গ্যালাক্সিসৌধ অটুট রয়েছে কী করে? কিন্তু কীভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে? কারণটা বোঝা খুব কঠিন নয়। SI শক্তি বা বিদ্যুৎ-চুম্বক শক্তি বা WI প্রত্যেকটি নিজের-নিজের বিশেষ ও সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই সক্রিয়; নিজের-নিজের ছোটো বা বিশেষ সীমাটুকুর বাইরে এই শক্তিগুলি নিষ্ক্রিয়। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ—নিউটন-এর universal gravitation—সর্বব্যাপী। কাছে বা দূরে, পজিটিভ-নেগেটিভ-নিউট্রাল নির্বিশেষে, SI-প্রভাবিত ভারি কণা (hadrons) বা WI-প্রভাবিত হাল্কা কণা (lepton) নির্বিশেষে, এমন কি বস্তু ও শক্তি নির্বিশেষে, এই অভিকর্ষশক্তি সক্রিয়। তাই গুণগতভাবে দুর্বল হলেও নিছক পরিমাণের বিপুলতায় মাধ্যাকর্ষণ বিশ্বক্ষেত্রে (বর্তমান পর্যায়ে) নিজের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণগত শক্তির কাছে আর সব শক্তির পরাজয়ের ভীষণতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে black hole—যেখানে বিপুল-পরিমাণ বস্তু ও শক্তি অভিকর্ষপিষ্ট হয়ে একটি বিন্দুবৎ পদার্থে (?) পরিণত হয়—যার কবল থেকে প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটারগামী আলোরও পালানোর উপায় নেই। আবার যে বিন্দুবৎ অবস্থা থেকে (Big Bang তত্ত্ব অনুসারে) আদি বিশ্ব বিস্ফোরিত হয়েছিল, সেই অবস্থাতেও হয়তো মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির চরম প্রাধান্য ছিল। নাকি সেই অকল্পনীয় অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণের চেয়ে বহুগুণ সর্বব্যাপী বা সর্বগ্রাসী কোনো অজানা শক্তির—কোনো superforce-এর—আধিপত্য ছিল?

নয়

চতুঃশক্তি কি অভিন্ন মহাশক্তির রূপবিকাশ?

অনেক বিজ্ঞানীই এখন মনে করেন বিশ্বের সামগ্রিক গঠন ও তার উৎপত্তির রহস্যকে বুঝতে হলে কণাজগতের রহস্যকে, বিশেষত strong interaction-এর প্রকৃতিকে বুঝতে হবে। আর বুঝতে হবে, চারটি মৌলিক শক্তির উপস্থিতির তাৎপর্য কী, এবং কীভাবে তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। তার সঙ্গে আবার একথাও মনে হচ্ছে যে কণাজগতের রহস্যকে পরিস্ফুট করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে (Big Bang তত্ত্ব অনুযায়ী) বিশ্বের সেই মহাগ্নিময় জন্মমুহূর্তে। বিশ্বের তখনকার ছবিটির সঙ্গে আজকের ছবিটিকে মিলিয়ে নিতে হবে।

এই unified field theory গঠনের চিন্তাটি নতুন নয়। আইনস্টাইন নিজে এবং পরে এডিংটন ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এমন একটি তত্ত্বসূত্র আবিষ্কারে প্রয়াসী হন যার মাধ্যমে মাধ্যাকর্ষণ ও বিদ্যুৎ-চুম্বকশক্তিকে একটিমাত্র গভীরতর বিশ্বশক্তির দুটি ভিন্ন অভিব্যক্তি হিসাবে দেখানো যাবে। সে চেষ্টা সফল হয়নি। তখন অবশ্য জানা ছিল না যে কণাজগতের বিচিত্র আচরণ (quantum phenomena) gravitation-এর নিয়মকেও মানে না, electromagnetism-এর নিয়মকেও মানে না: তাদের আচরণ অন্য দুটি বিচিত্র শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—যাদের এখন বলা হয় strong ও weak interaction।

সুতরাং এখনকার প্রচেষ্টা চলছে, দুটি নয়, চারটি বিশ্বশক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য আবিষ্কারের। ক্রমশই বিজ্ঞানীরা এই ধারণার দিকে এগোচ্ছেন যে এই সমস্যার সমাধানের জন্য (Big Bang তত্ত্ব অনুযায়ী) সদ্যজাত বা সদ্য-বিস্ফোরিত বিশ্বের অবস্থা ও প্রকৃতিকে বোঝা একান্ত প্রয়োজন। এইরকম একটা ধারণা ক্রমশই দানা বাঁধছে যে আজকের বিশ্বে যে শক্তিগুলি ভিন্ন, আদি বিশ্বে সম্ভবত সেগুলি ছিল অভিন্ন, অর্থাৎ একটিমাত্র শক্তিরূপে উপস্থিত ছিল। আগেকার তুলনায় আজকের বিশ্ব বিপুলভাবে স্ফীত; অর্থাৎ এর তাপমাত্রা অনেক অনেক কম। তখনকার চেয়ে এখনকার রশ্মিগুলির (radiation) তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক বেশি, অর্থাৎ তাদের শক্তি অনেক কম। তাই চেষ্টা চলছে বিশ্বের আদিপর্বের দিকে এক দুঃসাহসিক মানসিক—কিন্তু গণিতনির্ভর—অভিযানের। বিশ্বের সদ্যজাত অবস্থার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ বাদে আর তিনটি বিশ্বশক্তির সমন্বয়-সন্ধানী এই চিন্তাগুলি Grand Unified Theories বা GUT নামে পরিচিত। আগেকার এক পরিচ্ছেদে আমরা ওআইনবার্গ-এর (Steven Weinberg-এর) অপূর্ব চিত্রণ অনুযায়ী মহাবিস্ফোরণের $^{1}/_{100}$ সেকেন্ড পর থেকে পর্যায়ে পর্যায়ে প্রসারমান

বিশ্বের বিবর্তনধারাটিকে অনুসরণ করেছিলাম। এখন আমরা যাত্রা করবো উল্টোদিকে: বর্তমান অবস্থা থেকে সেই প্রায়-বিন্দুবৎ, প্রায়-অসীম তাপ ও ঘনত্বের অবস্থার দিকে।

(Supergravity তত্ত্ব এবং String Theory-গুলির মাধ্যমে পরিবেশিত চার-বিশ্বশক্তির একীকরণের সূত্রগুলি আমরা এই আলোচনার মধ্যে আর আনলাম না। তাছাড়া ঐ তত্ত্বগুলি কিছুটা এগিয়ে মাঝপথে আটকে গেছে এবং quark-তত্ত্বের প্রাধান্যের ফলে বেশ কিছুটা ম্লান হয়ে পড়েছে।)

সমন্বয়ের সন্ধানে আদিম অগ্নিকুন্ডের দিকে অভিযান

ধরা যাক একটি সোপানশ্রেণী বেয়ে আমরা Big Bang মুহূর্তের দিকে উঠছি। ধরা যাক, যেই আমরা এক ধাপ উঠছি, অমনি বিশ্বের বয়স আগেকার ধাপের $\frac{1}{10}$ ভাগ হয়ে যাচ্ছে, এবং তাপমাত্রা ও ঘনত্ব দশ গুণ করে বেড়ে যাচ্ছে। সিঁড়ির নিচে, অর্থাৎ এখন, বিশ্বের বয়স ধরা যাক 1,000 কোটি বছর (10 billion years)—যদিও একে 1500 থেকে 2000 কোটি বছর বলে মনে করার দিকেই আজ বিজ্ঞানীদের ঝোঁক বেশি। প্রথম ধাপ উঠতেই বিশ্বের বয়স হয়ে গেল 100 কোটি বছর। অন্ধকার মহাকাশে ভাসছে সদ্যগঠিত গ্যালাক্সিগুলি। তাদের নীহারিকাপুঞ্জের মাঝে মাঝে ভাসছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আদিকালে সদ্য-চোখ-মেলা তারা"—প্রায় সবই তরুণ নীলাভ নক্ষত্র। দ্বিতীয় ধাপ আমাদের যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে বিশ্বের বয়স 10 কোটি (100 million) বছর। বিপুল, প্রায়-অন্ধকার মহাশূন্যব্যাপী হাইড্রোজেন ও হিলিঅমের মেঘ। কিছু কিছু গ্যালাক্সি সেই সবে জমতে শুরু করেছে; তাদের মাঝে কিছু অপরিণত তারা (protostar) থেকে ক্ষীণ লালচে তাপরশ্মি বেরুচ্ছে।

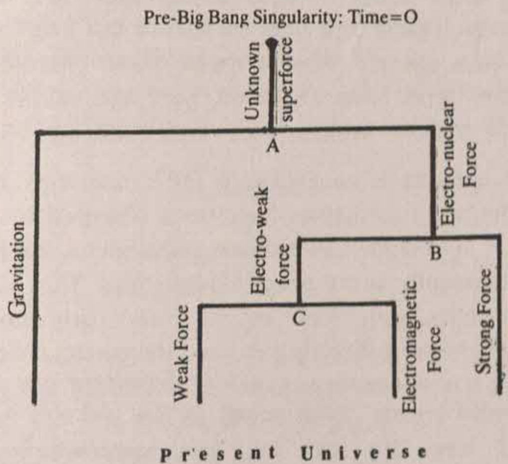
আরো তিন ধাপ উঠলে বিশ্বের বয়স তখন এক লক্ষ বছর। অন্ধকারের জায়গায় আলো। কারণ বিশ্বের ঘনত্ব দারুণ বেড়ে গেছে আর রশ্মিকণারাও অনেক বেশি ঘনীভূত ও শক্তিমান (energetic)। তাপমাত্রা 4500° কেলভিনের মতো, অর্থাৎ সূর্যের উপরিতলের তাপের কাছাকাছি। পরমাণুগুলি এখনও রয়েছে, কিন্তু তাপমাত্রা আর খানিকটা বাড়লে neutral (ইলেকট্রন-যুক্ত) atom আর থাকবে না।

আরো দশ ধাপ উঠলে আমরা একেবারে সেই আদিম অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে গিয়ে পড়বো। বিশ্বের বয়স এখন মাত্র দু মিনিট 15 সেকেন্ড। ঘনত্ব এখন পাথরের চেয়েও বেশি, কিন্তু প্রচণ্ড তাপের (100 কোটি ডিগ্রিরও বেশি) দরুন অবস্থাটা fluid; অর্থাৎ সদাচঞ্চল বা নিরন্তর-পরিবর্তনশীল নানারকম বস্তুকণা ও রশ্মিকণাদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও পারস্পরিক ধ্বংস ও রূপান্তরণ চলছে। এই অবস্থায় হিলিআম পরমাণুও দানা বাঁধতে পারছে না।

আরো যতই উঠছি, তাপ ও ঘনত্ব ততই বাড়ছে। রশ্মিকণাদের মাঝে শুধুই প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো আর অ্যান্টিনিউট্রিনোর ঝাঁক। আরো ওপরে দেখা যাবে প্রোটনের সঙ্গে অ্যান্টিপ্রোটন এবং নিউট্রনের সঙ্গে অ্যান্টিনিউট্রনও ঐ জমাট অগ্নিকুণ্ডের ভিতর জন্মাচ্ছে আর ধ্বংস হচ্ছে। তারও ওপরে, প্রোটন ও নিউট্রনগুলি ভেঙে গিয়ে quark-এর ঝাঁকে পরিণত হয়েছে।

জন্মমুহূর্তের কাছাকাছি: সমন্বয়ের শুরু

বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী সবশুদ্ধ 27 ধাপ এগুলে আমরা লক্ষ্য করবো electromagnetic force আর weak interaction একটি অভিন্ন শক্তি হিসাবে কাজ করছে—যাকে বলা হয়েছে electroweak interaction। স্টিভ্‌ন্ ওয়াইনবার্গ ও আবদুস্ সালাম তাঁদের বিখ্যাত গবেষণায় দেখিয়েছেন, এই পর্যায় থেকেই ঐ electroweak force দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পরবর্তীকালের বিশ্বে দুটি ভিন্ন শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো। দুই বিজ্ঞানীর পৃথক গবেষণাপ্রসূত তত্ত্ব অনুযায়ী শক্তিদুটির একীভবন ঘটে দুটি বিপুল-ভরসম্পন্ন virtual particle-এর বিনিময়ের মাধ্যমে—W কণা, যা পজিটিভ ও নেগেটিভ দুরকম রূপে আবির্ভূত হয়, এবং চার্জহীন Z কণা, যার প্রকৃতি ভরের বিপুলতা বাদে আর সব দিক দিয়েই আলোক-কণার (photon-এর) মতো। 1983 সালে জেনেভার প্রখ্যাত CERN গবেষণাগারের অতিপ্রচণ্ড-শক্তিসম্পন্ন Proton-Antiproton Collider-এ এই কণাদুটি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, এবং তার ফলে electromagnetic force এবং weak interaction যে একই মূলশক্তির দুটি ভিন্ন অভিব্যক্তি তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।



চিত্র 39

তত্ত্বকল্পিত আদি superforce থেকে বর্তমান বিশ্বে লক্ষিত চারটি বিশ্বশক্তির উদ্ভবের ছক। নিচে থেকে ওপর দিকে গেলে এটিই চারটি শক্তির ক্রমিক সমন্বয়ের চিত্র হয়ে ওঠে।

এর পরের সমন্বয়টি সম্ভবত ঘটতে দেখা যাবে আমরা 51-তম ধাপে পৌঁছোলে। Big Bang-এর মুহূর্ত থেকে মাত্র 10^{-35} সেকেন্ড কেটেছে। বিশ্বের আয়তন একটা ফুটবলের চেয়েও ছোটো, এবং ঘনত্ব একটি পরমাণুকেন্দ্রের ঘনত্বের চেয়ে 10^{60} গুণ বেশি। এই মুহূর্তে আমরা লক্ষ্য করবো electroweak interaction ও (পরমাণুকেন্দ্রস্থ) strong interaction একটিমাত্র অভিন্ন শক্তিতে সমন্বিত হয়েছে—সালাম যার নাম দিয়েছেন electronuclear force (ঠিকভাবে ধরলে, electroweak-nuclear force)। তাহলে

জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের গাণিতিক অনুমান দৃষ্টিতে সৃষ্টির এই আদি মুহূর্তটিতে চারটি বিশ্বশক্তির তিনটির সমন্বয় দেখা গেল। বাকি রইল সবচেয়ে দুর্বল শক্তিটি—gravitation। সেটি এখনো স্বতন্ত্র।

আরো আটটি ধাপ অতিক্রম করলে, অর্থাৎ 59-তম ধাপে পৌঁছোলে, আমরা এক চরম পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবো। বিশ্বের বয়স এখন মাত্র 10^{-43} সেকেন্ড। ঘনত্ব এমন এক চরম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং কণাগুলি পরস্পরের মধ্যে এমন ভয়ানকভাবে ঠাসা যে ঐ অবস্থায় অভিকর্ষশক্তি (যা এমনিতে এত দুর্বল) প্রচণ্ড শক্তিমান হয়ে উঠে আর তিনটি শক্তির সমন্বিত রূপের সমান প্রবল হয়ে উঠেছে–অর্থাৎ চারটি বিশ্বশক্তি একটিমাত্র শক্তিতে সংহত হয়েছে। ঠিকভাবে দেখলে বলতে হয়, আদিম বিস্ফোরণের 10^{-43} সেকেন্ড পর পর্যন্ত বিশ্বে ছিল একটিমাত্র অবিভক্ত শক্তি; তার পরেই হয়ে গেল দুটি। তারও অনেক পরে তিনটি, এবং শেষ পর্যন্ত চারটি।

10^{-43} সেকেন্ডের আগে কী অবস্থা ছিল? তা বলা যায় না। সেটা পদার্থবিজ্ঞানেরও কল্পনার বাইরে। General Relativity-র সূত্রগুলিও এখানে অচল। কারণ বিশ্বের জন্মমুহূর্তের দিকে আরো এগোলে সম্মুখীন হতে হবে সেই singularity-র, সেই শূন্য আয়তন ও অসীম ঘনত্বের অবস্থার, যার কোন ব্যাখ্যাই আমাদের আজকের জ্ঞানের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

এই সব চমকপ্রদ নতুন চিন্তাধারা থেকে বোঝা যায় বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে মহাবিশ্বের সামগ্রিক প্রকৃতিকে বুঝতে হলে তার কণাগুলির সূক্ষ্মতম গঠনকে বোঝা দরকার। আবার মৌলকণাগুলির গঠনকে, তাদের বিচিত্র রূপ-বদলকে, বুঝতে হলে আমাদের বুঝতে হবে বিশ্বের সামগ্রিক আদি রূপটিকে। Weinberg-এর অপূর্ব ভাষায় বলা যায়:

"The present universe is so cold that the symmetries among the different particles and interactions have been obscured by a kind of freezing; they are not manifest in ordinary phenomena, but have to be expressed mathematically, in our gauge field theories. That which we do now by mathematics was done in the very early universe by heat—physical phenomena directly exhibited the essential simplicity of nature. But there was no one there to see it." (বর্তমান বিশ্ব এতই বেশি ঠাণ্ডা যে বিভিন্ন কণা ও শক্তিগুলির মধ্যেকার মৌলিক সমতাটি এই হিমে চাপা পড়ে গেছে। প্রকৃতির জগতে আজকে ঐ অবস্থা আর প্রকট নয়; এদের আন্তঃসম্পর্কগুলিকে আমাদের ক্ষেত্রতত্ত্বগুলির গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করতে হয়। যে কাজ আজকে আমাদের অঙ্ক দিয়ে করতে হচ্ছে, সে কাজটি আদিম বিশ্বে তাপের দ্বারাই সংঘটিত হোতো। প্রকৃতির মৌলিক সরলতা তখনকার অবস্থার মধ্যে পরিস্ফুট ছিল। কিন্তু সে অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না।)



দশ

শূন্যের স্ফীতিসম্ভূত বিশ্ব-উৎপত্তি তত্ত্ব

গত দশ-বারো বছরের মধ্যে Big Bang বা মহাবিস্ফোরণের কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ নতুন তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে—তাকে বলা যেতে পারে Inflationary Theory of the Big Bang। এখানে এই জটিল তত্ত্বটির একটি অতিসরল বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

তত্ত্বটি প্রথম পরিবেশন করেন MIT-র অ্যালান গাথ্ (Alan Guth) 1980 সালে। পরে মস্কো থেকে আন্দ্রে লিন্দে (Andrey Linde) ও পেনসিলভেনিয়া থেকে স্টাইনহার্ট (Paul Steinhart) ও অ্যালব্রেক্ট্ (Andreas Albrecht) এর একটি পরিবর্তিত রূপ উপস্থাপিত করেন। এই তত্ত্বচিন্তা অনুযায়ী Big Bang প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অসম্ভব রকমের দ্রুত কিন্তু অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এক প্রসারণ-প্রক্রিয়া দিয়ে—Guth যার নাম দিয়েছেন Inflation পর্ব। কোথাও কিছু ছিল না, হঠাৎ এই অতিপ্রচণ্ড প্রসারণ-প্রক্রিয়া—এই inflationary expansion—শুরু হল কীভাবে। কীসেরই বা প্রসারণ? এর সমস্ত রহস্যই নাকি নিহিত আছে quantum vacuum-এর প্রকৃতির মধ্যে, অর্থাৎ quantum mechanics-এর ধারণা অনুযায়ী যাকে "শূন্য" বলা হয় তার মধ্যে। আগেই আলোচিত হয়েছে, এই বিশ্বব্যাপী শূন্যতা আপাতদৃষ্টিতেই শূন্য। আসলে ঐ শূন্য হচ্ছে অপরিমেয় শক্তির এবং অগণ্য virtual particle-এর এক সুপ্ত সমুদ্র, যার থেকে মাঝে মাঝে positron, antiproton, বিভিন্ন ধরনের hyperon (উচ্চভরসম্পন্ন কণা), কয়েক রকমের meson (মধ্যভরের কণা) প্রভৃতি দু-চারটি ছায়াবৎ কণা অতি অল্পকালের জন্য (সেকেণ্ডের দশ কোটি ভাগের এক ভাগেরও কম সময়ের জন্য) আবির্ভূত হয়ে আবার ঐ অলক্ষ্য শক্তিসাগরে মিলিয়ে যায়। এই quantum vacuum-কে তাই মনে করা হয় negative energy-র এক অতল মহাসাগর, যা এমনিতে প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং যার অস্তিত্ব ধরা পড়ে তখনই যখন কোন স্থানীয় আলোড়নবশত তার থেকে ঐ-সব অতিক্ষণস্থায়ী কণা বা রশ্মি নির্গত হয়।

নেগেটিভ শক্তিলোকের মহাবিকর্ষণ-তাড়িত স্ফীতি

বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে (Inflation-তত্ত্ব অনুযায়ী) এক কণা শূন্য পরিসর (empty space) থেকে। কিন্তু এই শূন্যতা হচ্ছে সেই quantum vacuum, যাকে false

vacuum-ও বলা হয়েছে। আমাদের পরিচিত গুরুভার তেজস্ক্রিয় পরমাণুকেন্দ্রকগুলির মতো এই false vacuum টি ছিল অস্থিত গঠনের (unstable)।কোনো কারণে এই সুপ্ত শক্তি-ভাণ্ডারের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয় এবং তার ফলে সমস্ত সংহত শক্তিপুঞ্জটি (অথবা তার এক অংশ) এক অভাবনীয় প্রচণ্ড গতিতে স্ফীত হতে থাকে। কিন্তু false vacuum থেকে জেগে ওঠা ঐ শক্তিপুঞ্জটি ছিল negative প্রকৃতির। তাই তার আচরণ সববিষয়েই আমাদের পরিচিত positive energy-র আচরণের উল্টো। এ জগতের কণাদের মধ্যে কাজ করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (gravitation)। নেগেটিভ শক্তিলোকের কণাদের মধ্যে বিরাজ করে মহাবিকর্ষণ শক্তি (cosmical repulsion)। তাই আলোড়িত negative শক্তিলোক মধ্যস্থলে আকৃষ্ট না হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আবার, আমাদের পজিটিভ শক্তির জগতে কণারা পরস্পরের যত কাছে থাকে, তাদের মধ্যে আকর্ষণ তত প্রবল হয়। তেমনি নেগেটিভ শক্তিজগতে কণারা পরস্পরের থেকে যত দূরে থাকে, তাদের মধ্যে বিকর্ষণশক্তি তত বেড়ে ওঠে। তাই বিশ্বমূলের ঐ নেগেটিভ শক্তি-উৎসের প্রসারণকালে কণাদের মধ্যে দূরত্ব যতই বাড়তে লাগল, তারা পরস্পরের থেকে ততই বেশি দ্রুতবেগে সরে যেতে লাগল। অর্থাৎ এই inflationary expansion হতে লাগল ক্রমত্বরান্বিত বেগে (with constant accelaration)।

মনে পড়তে পারে, আইনস্টাইন তাঁর কল্পিত সসীম ও সুস্থিত (finite and stable) বিশ্বছবিটিতে মাধ্যাকর্ষণ-জনিত collapse-এর প্রবণতাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য এইরকম একটি cosmical repulsion force-কে (lambda factor নামে) তাঁর সমীকরণগুলিতে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন, এবং De Sitter তাঁর ধীর-প্রসারণশীল বিশ্ব-মডেলে ঐ মহাবিকর্ষণ শক্তির আপেক্ষিক প্রাধান্য দেখিয়েছিলেন। কিছুকাল পরেই আইনস্টাইন নিজেই ঐ cosmical constant-এর ধারণাটিকে অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব বলে পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু প্রায় সত্তর বছর পরে এই inflation তত্ত্বের মাধ্যমে ঐ ধারণাটি আবার অদ্ভুতভাবে বিশ্বতত্ত্বের রঙ্গমঞ্চে ফিরে এল। Paul Davies-এর ভাষায়—"The 'antigravity' that Einstein had thrown out of the door had come back in through the window"। তবে আইনস্টাইনের মডেলে ঐ বিশ্ববিকর্ষণশক্তি বা antigravity ছিল মাধ্যাকর্ষণের পাশাপাশি বিদ্যমান এক বিপরীত শক্তি। Inflationary expansion-এর পর্যায়ে মাধ্যাকর্ষণ বলে কিছু নেই, আছে শুধু ঐ অবাধ মহাবিকর্ষণশক্তি, যার তাড়নায় বিশ্ব উত্তরোত্তর দ্রুতবেগে স্ফীত হতে লাগল।

ঐ অতিক্ষণস্থায়ী কিন্তু অতিদ্রুত প্রসারণের ফলে—তাত্ত্বিক হিসাব অনুযায়ী—বিশ্বের আয়তন প্রতি 10^{-34} সেকেণ্ডে দ্বিগুণ হয়ে যেতে লাগল। এই অতিক্ষণস্থায়ী পর্যায়ে, সেকেণ্ডের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মধ্যে, বিশ্বের আয়তন একটা প্রোটনের 100 কোটি ভাগের এক ভাগ থেকে কয়েক সেন্টিমিটার প্রমাণ হয়ে উঠল।

মহাবিকর্ষণের ক্ষান্তি ঃ মাধ্যাকর্ষণের আবির্ভাব

কিন্তু সেই শূন্যকণার, সেই false vacuum-এর, সাময়িক অস্থিতির দরুন যে প্রসারণক্রিয়ার শুরু, তার প্রকৃতিগত অস্থিতির কারণেই সেই ক্রিয়া বেশিক্ষণ চলতে পারে না।

এক সময়ে ঐ আলোড়নজনিত স্ফীতি থেমে যায় (হঠাৎ, না ধীরে ধীরে সে বিষয়ে মতভেদ আছে), এবং মহাবিকর্ষণশক্তি অন্তর্হিত হয়। Antigravity-র অন্তর্ধানের মুহূর্তেই তার বিপরীত শক্তি gravitation আবির্ভূত হয়ে বিশ্বনিয়ন্ত্রণীশক্তির ভূমিকা গ্রহণ করল। তখনও কিন্তু বিশ্ব আগেকার প্রচণ্ড ধাক্কায় স্ফীত হয়েই চলল, কিন্তু এখন আর ক্রম-ত্বরান্বিত হারে নয়। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ঐ প্রসারণগতি এখন থেকে হয়ে উঠল ক্রম-মন্থর।

Inflation পর্বের এই অন্তমুহূর্তে আর একটি চমকপ্রদ পরিবর্তন হল। Positive energy-র সংহতি সৃষ্টি করে তাপ; negative energy সৃষ্টি করে শীতলতা। তাই প্রচণ্ড দ্রুতিময় inflation-পর্বের শেষ পর্যন্ত বিশ্ব ছিল শীতল। Inflation শেষ হওয়ামাত্র বিকর্ষণশক্তি যেমন আকর্ষণশক্তিতে পরিণত হল, তেমনি negative energy-জনিত শীতলতা positive energy-জনিত তাপে পরিণত হলো। নিমেষের মধ্যে শীতল বিশ্বের তাপমাত্রা হয়ে উঠলো 10^{27} ডিগ্রি কেলভিন (one billion billion billion degrees Kelvin)। এই প্রচণ্ড তাপশক্তি (thermal energy) থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বস্তুকণা (ও বিপরীতকণা) উৎপন্ন হতে লাগল। বিভিন্ন বস্তুকণার প্রচণ্ড দ্রুত পারস্পরিক রূপান্তরণ এবং বস্তুকণাদের বিকিরণকণায় (photon-এ) বিলয় এবং বিকিরণকণা থেকে বিভিন্ন বস্তুকণার পুনরুৎপত্তি অভাবনীয় দ্রুতহারে চলতে লাগল। অর্থাৎ এখন থেকে "Standard Hot Big Bang" মডেল অনুযায়ী বিশ্বলোক বিবর্তিত হতে লাগল—যার বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে।

আগেকার Hot Big Bang মডেলের তুলনায় এই Inflation থিওরি কতকগুলি মৌলিক সমস্যার সমাধানের দিকে আরো অনেকটা এগিয়ে যায় বলে দাবি করা হয়েছে। কী থেকে মহাবিস্ফোরণটি ঘটে? Inflation তত্ত্বের উত্তর : নেগেটিভ শক্তি-সংহত quantum vacuum-এর অপকেন্দ্রিক চাপে শূন্যতাই—শূন্য পরিসরই বিস্ফোরিত হয়েছিল। অর্থাৎ শূন্যের এক বিচিত্র আভ্যন্তরীণ আলোড়ন থেকেই এই প্রসারণশীল বিশ্বের সৃষ্টি, অন্য কিছু থেকে নয়। এই অর্থেই Guth একটু মজা করে করে বলেছেন : "It is sometimes said that there is no such thing as a free lunch. The universe, however, is a free lunch"। অর্থাৎ, ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভোজটি একেবারে নিখরচায়, অর্থাৎ সম্পূর্ণ শূন্যতা থেকে জুটে গেছে।

দ্বিতীয়ত, আজ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিশ্বচিত্রটিকে যে আশ্চর্যরকমের সমসত্ত্ব ও সবত্রসম মনে হচ্ছে (homogeneous and isotropic) তারও একটা ভালো ব্যাখ্যা inflationary model থেকে পাওয়া যেতে পারে। মহাবিকর্ষণ প্রক্রিয়াটি এত প্রচণ্ড রকমের ক্রম-ত্বরান্বিত গতিতে ঘটে যে ঐ কণাবৎ বিশ্বের মধ্যে যদি কোথাও কোনো অসমানতা থেকে থাকে তাহলে তা ঐ মারাত্মক স্ফীতির ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল—ফোলানো বেলুনের গায়ের একটু-আধটু অসমানতার মতো। আর Inflation-পর্বের শেষে প্রায় একই মুহূর্তে সর্বত্র বিপুল তাপশক্তির তাড়নায় এক প্রচণ্ড দ্রুত কণাসৃষ্টি-কণাবিলুপ্তির পর্ব শুরু হলো। সুতরাং এই অবস্থা থেকে উদ্ভূত বিশ্ব সর্বত্র সমরূপ হওয়ার কথা।

এই তত্ত্ব সম্পর্কে আর একটি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট দাবি করা হয়। Friedmann-Lemaitre তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত বিশ্বমডেলগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি যে বিশ্বে বস্তুর বা ভরের গড় ঘনত্ব কত তার ওপরেই নির্ভর করে বিশ্বের আকার সসীম না অসীম। বিশ্বে অলক্ষিত ভর (missing mass) কত থাকতে পারে তা আন্দাজ করে বর্তমানে ধারণা এই দাঁড়িয়েছে যে ঐ ভর critical mass-এর বেশ কাছাকাছি—একটু কমের

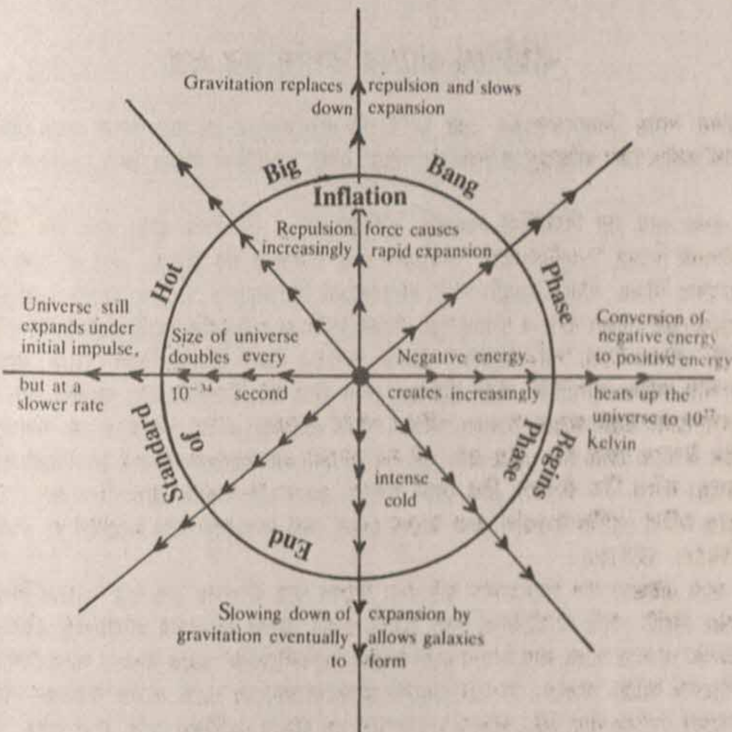
দিকে। Inflation তত্ত্ব থেকে নাকি ঐরকমই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ ঐ তত্ত্ব বিশ্বের জন্মপ্রক্রিয়ার যে বিবরণ দেয় তাতে বিশ্বের প্রসারণের বেগ এবং (তার বিপরীত শক্তি) মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণী ক্ষমতা—এই দুটির প্রবলতা খুব কাছাকাছি হওয়ারই কথা।

বিশ্বসৃষ্টি-সূচনার তত্ত্বকল্পিত চিত্রের যথার্থতা : COBE যন্ত্র-উপগ্রহের সাক্ষ্য

জ্যোতিবিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে আছেন। গ্যালাক্সিগুলির গঠন কীভাবে শুরু হয়? মহাশূন্যে সমানভাবে ছড়ানো সেই নির্বিশেষ হাইড্রোজেন-হিলিঅম গ্যাসসাগর থেকে কীভাবে এই নানারকম চেহারার গ্যালাক্সিদের বিশেষ আকারগুলি জেগে ওঠে? ঐ সমবিস্তৃত ক্ষীণ গ্যাসলোকে অসমতা, অর্থাৎ ঘনত্বের তারতম্য, এল কীভাবে? মনে হয় ঐ নির্বিশেষ গ্যাসসাগর কোনো কারণে বিশাল বিশাল পুঞ্জে ঈষৎ-বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তখন থেকেই প্রতিটি মহাকায় গ্যাসপুঞ্জ তার ক্ষীণ (কিন্তু ক্রমবর্ধমান) অভিকেন্দ্রিক টানে অতি ধীরে (কিন্তু ক্রমত্বরিত গতিতে) সংকুচিত হতে হতে আজকের মহাগ্যালাক্সিপুঞ্জসমূহের (galactic superclusters) আদিরূপগুলি সৃষ্টি করেছিল। ঐরকম প্রত্যেকটি মহাগ্যাসপুঞ্জ আবার সংকুচিত হতে হতে বার বার ক্ষুদ্রতর পুঞ্জে বিভক্ত হয়েছিল—যার থেকে শেষ পর্যন্ত উৎপন্ন হয়েছে পৃথক পৃথক গ্যালাক্সিগুলি।

আমরা জানি Big Bang তত্ত্বের বাস্তবতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য হচ্ছে মহাকাশের চতুর্দিক থেকে আসা 2.7° কেলভিন তাপমাত্রার সেই অতিক্ষীণ microwave রশ্মিস্রোত—যা বিশ্বের সেই আদিম অগ্নিকুণ্ড থেকে নির্গত হয়ে বিশ্বপরিসরের বিপুল প্রসারণের ফলে আজ এই অতি দুর্বল অতিশীতল বিকিরণস্রোতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই বিকিরণের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই বিশেষ সময়টিতে যখন প্রথম সর্বব্যাপী ইলেকট্রনকণাগুলি প্রোটন ও নিউট্রনগুলির সঙ্গে জুড়ে গিয়ে বিশ্বপরিসরকে আলোকগম্য (transparent to radiation) করে তুলেছিলো। নিশ্চয় পরমাণুসৃষ্টির সেই সময় থেকেই মাধ্যাকর্ষণশক্তির অতিসূক্ষ্ম প্রভাবে সেই নবজাত হাইড্রোজেন-হিলিআমের বিশ্বসাগরে বিভাজনরেখার আভাস ফুটে ওঠে এবং ঘনত্বের ঈষৎ তারতম্য দেখা দেয়। তা যদি হয় তাহলে ঐ অপেক্ষাকৃত ঘন অঞ্চলগুলির তাপমাত্রা বস্তুশূন্য বা বস্তুবিরল অঞ্চলগুলির তাপমাত্রার চেয়ে সামান্য একটু বেশি হওয়ার কথা। সুতরাং ঐ সৃষ্টিপ্রত্যূষের বার্তাবহ যে microwave background radiation-এর সন্ধান আমরা পেয়েছি তার তাপমাত্রায় আদি বিশ্বপরিসরের ঈষৎ-অসম ঘনত্বের একটা প্রতিফলন থাকার কথা। অর্থাৎ বিভিন্ন দিক থেকে আসা ঐ বিকিরণের ঐ 2.7 ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রারও সামান্য—অতি সামান্য—হেরফের হওয়ার কথা। ঐ প্রত্যাশিত তাপ-তারতম্যের সন্ধান পেলে মহাবিস্ফোরণতত্ত্ব আরো বিরাট এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে। তাই নিরন্তর সন্ধান চলতে লাগলো।

1992-এর মার্চ-এপ্রিল নাগাদ এই অন্বেষণ সাফল্যমণ্ডিত হল। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই উদ্দেশ্যেই পাঠানো Cosmic Background Explorer Satellite (COBE) যে তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিল তা বৎসরাধিক কাল ধরে কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে জানা গেল যে ঐ background radiation-এর 2.7 ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রার মধ্যেও সত্যিই একটু হেরফের দেখা যাচ্ছে। তফাৎটি অবিশ্বাস্য রকমের অল্প—এক ডিগ্রির তিন কোটি ভাগের এক ভাগের মতো। কিন্তু যতই অল্প হোক, এর থেকে মনে হয় যে আদি বিশ্বের সেই গ্যাসসাগরে



চিত্র 40

শূন্যের স্ফীতিসম্ভূত বিশ্বসৃষ্টি-প্রক্রিয়ার একটি সরল ছক। কালো কেন্দ্রস্থলটি সব কিছুর উৎস অস্থিত quantum vacuum-এর প্রতীক।

ঘনত্বের সামান্য তারতম্য সত্যিই দেখা দিয়েছিল—যে তারতম্য মহাগ্যালাক্সিপুঞ্জ গঠনের আদিতম পর্যায়টির ইঙ্গিত বহন করছে। অর্থাৎ মহাবিস্ফোরণতত্ত্ব, বিশেষত তার নতুন সংস্করণ Inflationary Big Bang তত্ত্বটি, আজকের গ্যালাক্সি-পরিকীর্ণ বিশ্বলোক গঠনের পথে প্রকৃতির প্রথম পদক্ষেপের যে চিত্রটির অবতারণা করেছিল, অবশেষ-রশ্মির এই আঞ্চলিক তাপ-তারতম্য যেন তারই যথার্থতার সাক্ষ্য বহন করে।



এগারো

বহির্বিশ্বে প্রাণের উপস্থিতির প্রশ্ন

বহুদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানজগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরাও মনে করতেন যে জড় পদার্থ থেকে চেতন পদার্থ অর্থাৎ জৈব অস্তিত্বের আবির্ভাবের পিছনে একটা অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া না থেকে যায় না।

এখন প্রায় সব বিজ্ঞানীরই অনুমান, হাইড্রোজেন ও হিলিআম ছাড়া আর সব মৌল উপাদানই বিশ্বের "আধুনিককালে" নক্ষত্রদের তপ্ত অভ্যন্তরে সৃষ্ট হয়েছে, এবং ঐ তারাদের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে ছোটো-বড়ো নানারকমের বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ধরনের গ্যাস ও ধূলোর পুঞ্জ থেকেই সূর্যের ও সূর্য-প্রদক্ষিণকারী গ্রহমণ্ডলের সৃষ্টি। পৃথিবী সৌরজগতের "নাতিশীতোষ্ণ" অঞ্চলে অবস্থিত বলেই এখানে "প্রাণ" (life) নামক অবর্ণনীয় জটিল ব্যাপারটির উদ্ভব হয়েছে। এখন প্রায় সব বিজ্ঞানীই মনে করেন, প্রাণ বা জৈবপদার্থের উদ্ভব হয়েছে সাধারণ অজৈব পদার্থ থেকেই। প্রাণীর দেহজাত বহু পদার্থকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা গেছে এবং এই সব সাফল্য এই ধারণাকে ক্রমশই জোরালো করে তুলেছে। যদিও ঠিক কীভাবে, ঠিক কোন পর্যায়ে, কতকগুলি সাধারণ রাসায়নিক অণু থেকে অত্যন্ত জটিল প্রোটিন-অণুগুলি, এবং তাদের থেকে জৈব কোষগুলি গড়ে উঠেছিল তা এখনো রীতিমতো রহস্যাবৃত।

তবে এইভাবে যদি গ্রহমণ্ডলের সৃষ্টি এবং বিশেষ গ্রহে জীবনের জন্ম হয়, তাহলে বিপুল বিশ্বের কোটি কোটি গ্যালাক্সিতে গাঁথা অগণ্য কোটি তারার অনেকের চারদিকেই এইরকম গ্রহমণ্ডল থাকতে পারে, আর তাদের মধ্যে অনেক "নাতিশীতোষ্ণ" গ্রহও থাকতে পারে যেখানে প্রাণীজগৎ আছে। থাকলে, সেখানে মানুষের মতো বা মানুষের চেয়ে অনেক উন্নততর প্রাণী থাকতেও কোনো বাধা নেই। আমাদের ছায়াপথে দশ হাজার কোটিরও বেশি তারা আছে। সে হিসাবে অন্তত কয়েক লক্ষ গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব।

সম্প্রতিকালে অপেক্ষাকৃত কাছের কয়েকটি তারার গতির বিশেষত্ব লক্ষ করে বোঝা গেছে তাদের চারিদিকে বেশ বেশি ভরের এক বা একাধিক গ্রহ বা গ্রহজাতীয় কিছু রয়েছে। যেমন Ophiuchus মণ্ডলে অবস্থিত মাত্র ছ' আলোকবর্ষ দূরের লাল-বামন তারা Barnard's Star-এর একটি প্রায় বৃহস্পতির ভরের সঙ্গী আছে বলে মনে করা হয়—যদিও এটি একটি গ্রহ না ক্ষুদ্রতম ভরের একটি তারা তা বোঝার উপায় নেই। কৃত্রিম উপগ্রহে বসানো দূরবীক্ষণ ক্যামেরার সাহায্যে জানা গেছে উত্তর আকাশের (27 আলোকবর্ষ দূরস্থ) Vega ও দক্ষিণ আকাশের (50 আলোকবর্ষ দূরের) Beta Pictoris নক্ষত্রদুটির চারিদিকে বস্তুপুঞ্জের একটি

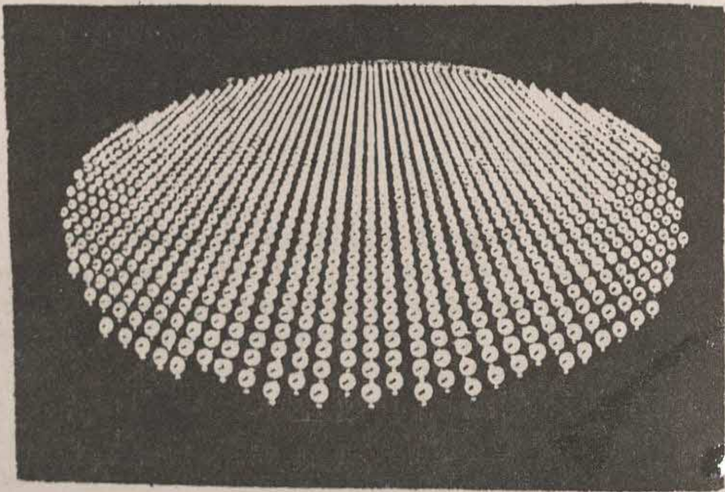
আবর্তনশীল কুণ্ডলী রয়েছে—যার মধ্যে হয়তো গ্রহের সৃষ্টিক্রিয়া চলছে। (এ বিষয়ে প্রথম পরিচ্ছেদেও কিছু আলোচনা আছে।)

দুস্তর ব্যবধান

তবে এই জীবনসমৃদ্ধ দ্বীপগুলি যদি সত্যিই মহাকাশে ছড়ানো থাকে, তাহলে তারা আছে পরস্পরের থেকে বড্ড বেশি দূরে। একই গ্রহমণ্ডলে দুটি সজীব গ্রহ থাকলে অবশ্য আলাদা। বৃহস্পতি বা শনির কোন জীবনসমৃদ্ধ উপগ্রহ থাকলে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আমাদের একটা স্থায়ী যোগাযোগ-ব্যবস্থা সৃষ্টি হতো। এমন কি দুটি সভ্যতা হয়তো পরস্পরকে গভীরভাবে প্রভাবিতও করতো—উচ্চমানের কল্পবিজ্ঞান-রচয়িতারা যে বিষয়ে বহু রোমাঞ্চকর চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু বিভিন্ন নক্ষত্রের সম্ভাব্য গ্রহমণ্ডলগুলির মধ্যে ব্যবধান এতই বিপুল যে তাদের মধ্যে সংযোগস্থাপনের আশা নিতান্তই ক্ষীণ। আমাদের সবচেয়ে কাছের যে নক্ষত্র—তিনটি তারা সম্বলিত Alpha Centauri System—তার থেকে আসতে আলোকেরই লাগে সওয়া চার বছর। তাছাড়া গ্রহের কোন নিজস্ব দীপ্তি নেই—যার ফলে অন্য নক্ষত্রের কোনো গ্রহকে আমাদের বৃহত্তম টেলিস্কোপগুলি দিয়েও দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অবশ্য কোনোদিন বাতাবরণহীন চাঁদের ওপর যদি 400 বা 500 ইঞ্চি ব্যাসের টেলিস্কোপ বসানো যায়, তাহলে তার মাধ্যমে নিকটতম নক্ষত্রগুলির বৃহত্তম দু-চারটি গ্রহকে দেখা যেতেও পারে।

কিন্তু যাতায়াতের মাধ্যমে যোগাযোগ তখনও প্রায় অসম্ভবের পর্যায়েই থাকবে। আন্তঃনক্ষত্র যোগাযোগের একমাত্র উপায় রেডিও-সংকেত, যার গতি আলোকেরই সমান। কিন্তু মহাশূন্যের বিপুল আয়তনই এই ধরনের যোগাযোগের পথে এক নিষ্ঠুর বাধা। Sirius বা লুব্ধকের কোনো গ্রহ থেকে যদি কোনো বার্তা আসে তাহলে আমরা সেটা ন' বছরের মধ্যেই পেতে পারি এবং তারা বার্তা পাঠানোর আঠারো বছরের মধ্যেই তার উত্তর পেতে পারে।

কিন্তু 900 আলোকবর্ষ দূরের (কালপুরুষ মণ্ডলের) Rigel বা বাণরাজা নক্ষত্রের পরিবেশ থেকে কোনো বার্তা যদি 1900 সালে রওনা হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমরা 2800 খ্রিস্টাব্দের আগে পাবো না। যদি তারা ঐ বার্তা পাঠিয়ে থাকে 200 খ্রিস্টাব্দে, তাহলে তার বেতারসংকেত পৃথিবীতে পৌঁছেছে 1100 খ্রিস্টাব্দে—যখন ঐ বার্তা গ্রহণ করার বয়স মানবসভ্যতার হয়নি। আর অন্যান্য গ্যালাক্সির কথা? আমাদের নিকটতম spiral galaxy M31 থেকে আজ যদি কোনো রেডিও-বার্তা রওনা হয় তবে তা পৃথিবীতে পৌঁছোবে আজ থেকে 22 লক্ষ বছর পরে। আমাদের খবর পেতেও তাদের একই সময় লাগবে। তারপর উত্তর দেওয়ার পালা। আজ পর্যন্ত আমরা বিশ্বের কোনো গ্রহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারিনি। কিন্তু আশা করা যায়, কোনো না কোনোদিন পারবো—এবং সেই আশায় ভর করেই মর্ত-বহির্ভূত চেতনা-উৎসের সন্ধান—Search for Extra Terrestrial Intelligence বা SETI—নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অক্লান্তভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু সে সংযোগের মাধ্যমে সম্পর্কস্থাপন বোধহয় কোনদিনই সম্ভব হবে না!



চিত্র 41

Project Cyclops: বহির্বিশ্বের কোনো সভ্যতা থেকে পাঠানো রেডিও-সংকেত ধরার জন্য পরিকল্পিত 1000টি রেডিও টেলিস্কোপের সমাবেশ। প্রতিটি dish-এর ব্যাস 100 মিটার। শিল্পী-কল্পিত আকাশ থেকে দেখা দৃশ্য।

নতুন তত্ত্ব: মহাকাশই প্রাণের আদি উৎস

জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি সাম্প্রতিক তত্ত্ব সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দরকার। Fred Hoyle, Geoffrey Burbidge, Margaret Burbidge, শ্রীলঙ্কার Chandra Wickramsinghe প্রমুখ বেশ কিছু নামকরা বিজ্ঞানী সন্দেহ করেন, পৃথিবীতে বিরাজমান এই প্রাণের জন্ম পৃথিবীতে হয়নি। এই প্রাণের বীজ বিভিন্ন রকমের জীবাণুরূপে মহাশূন্য থেকে কয়েক কোটি বছর আগে ভেসে এসেছিল। মহাশূন্যের আন্তঃনাক্ষত্র পরিসরে ঘনভাবে বা ক্ষীণভাবে পরিব্যাপ্ত ধূলিপুঞ্জের কথা আমরা জানি। ঐ-সব মহাশূন্যস্থিত ধূলিপুঞ্জের মধ্যে নানারকম জটিল জৈব অণুর (organic molecules-এর) সন্ধান পাওয়া গেছে। আরো উল্লেখযোগ্য এই যে, জীবকোষ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য amino acid-গুলির চেয়ে এই আন্তঃনাক্ষত্র জৈব অণুগুলির গঠন অনেক বেশি জটিল, অর্থাৎ জীবকোষ গঠনের দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে-থাকা। মহাকাশের ultraviolet রশ্মির প্রবাহের মধ্যেও তারা কীভাবে তাদের অণুর জটিল গঠন বজায় রেখেছে তা এখন এক গুরুতর গবেষণার বিষয়। পক্ষান্তরে, এই তাত্ত্বিকদের ধারণা, পৃথিবীর যা বয়স এবং যে-ধরণের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস, তাতে এই গ্রহের বুকে স্বাধীনভাবে জটিল জৈব অণুসমূহের গঠন ও তাদের জৈবকোষে পরিণতি সম্ভব ছিল না। সুতরাং এঁদের অনুমান, হয়তো সমস্ত বিশ্ব জুড়েই ঐ interstellar dust-cloud-গুলিতেই প্রাণের বীজের সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে ঐ বীজগুলি যেখানেই অনুকূল ক্ষেত্র পায় সেখানেই বিকশিত হয়ে ওঠে। পৃথিবী সেইরকম একটি অনুকূল ক্ষেত্র। তাই তাঁরা

বলেন, পৃথিবী প্রাণের জন্মক্ষেত্র নয়, প্রাণের উপাদানগুলির সমাবেশের একটি ক্ষেত্র মাত্র (an assembly station for life)।

এই তাত্ত্বিকদের ধারণায় পৃথিবীতে এই মহাশূন্যজাত প্রাণের বীজ এসে পৌঁছেছে নানা ধরনের ও নানা আকারের উল্কাপিন্ডের (meteorite-এর) মাধ্যমে আর মহাকাশ থেকে ভেসে-আসা অতিক্ষুদ্র ধূলিকণায় বাহিত হয়ে। এঁদের ধারণা, দূর মহাকাশে যে-সব ধূলোর মেঘের মধ্যে জৈব অণু পাওয়া গেছে তাদের সঙ্গে ধূমকেতুদের উৎপত্তি জড়িত। ধূমকেতুদের গঠন, ঘনত্ব, তাপমাত্রা ইত্যাদি থেকে মনে হয় ওখানে জীবাণুপর্যায়ের প্রাণের অস্তিত্ব থাকার কথা। ধূমকেতুরা প্রতিবার সূর্য প্রদক্ষিণ করার সময়ে সূর্যের আকর্ষণে তাদের কিছুটা অংশ বেরিয়ে এসে গ্যাস ও ধূলোর কণা হয়ে সৌরজগতের কেন্দ্রাঞ্চলে পাক খেতে থাকে। এই কণাগুলি বহু কোটি বছর আগে থেকে পৃথিবীতে প্রাণকণা বয়ে এনেছে। এছাড়া মহাকাশ থেকে আসা উল্কাপিণ্ডদের মধ্যে—এঁরা মনে করেন—জীবাণুদের (bacteria-র) জীবাশ্ম পাওয়া গেছে: বিশেষ করে 1969-এর 28 সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার Victoria অঞ্চলে পতিত Murchison Meteorite-এর মধ্যে জীবাশ্মের উপস্থিতির এই অনুমিত সাক্ষ্য খুবই প্রবল বলে মনে করা হচ্ছে। Hans Pflug ও A. H. Delsemme নামক দুজন বিজ্ঞানী এই সব সূক্ষ্ম পরীক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী।

ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে চিন্তার এবং গভীরতর গবেষণার বিষয়। তবে নিশ্চিতভাবে কোন কিছুই এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু এই তাত্ত্বিকদের সবচেয়ে সামনের লোক যিনি—সেই এক এবং অদ্বিতীয় Fred Hoyle—তিনি তাঁর 1983 সালে প্রকাশিত *The Intelligent Universe* বইটিতে একটু উগ্রভাবে ঐ তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণ সত্য বলে দাবি করেছেন। তাঁর মতে ডারউইনের জীববিবর্তনতত্ত্ব যে একেবারেই ভুয়ো তা বুঝতে নাকি কোনোই অসুবিধে হয় না। পৃথিবীতে নাকি কোনোদিনই অজৈব পদার্থ থেকে জীবন বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। উল্কাপিণ্ডগুলোতে মহাকাশীয় জীবাশ্মের উপস্থিতি সম্বন্ধে কোনো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন বিজ্ঞানীর নাকি সন্দেহ থাকতে পারে না। তাঁরই সহকারী Wickramsinghe যখন বলছেন, ধূমকেতুর উপাদান বোধহয় প্রাণের আশ্রয় হতে পারে, তখন Hoyle বলেছেন, শুধু তা কেন: ধূমকেতুর উপাদানই হচ্ছে প্রাণ ("comet material is life")।আর তাঁর ধারণায় বিশ্বময় জীবনকে ছড়িয়ে দেবার একটা সচেতন পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে: "The universe is a put-up job"।

Hoyle-এর মনীষা সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেও বলতে হয় এখানে তিনি যেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছুটা সরে গিয়ে একটা পূর্বকল্পিত ধারণার পথে চালিত হয়েছেন। যাকে সম্ভব, এমন-কি কিছুটা সম্ভাব্য বলেও মনে করা যেতে পারে তাকে তিনি নিশ্চিত বলে ঘোষণা করছেন। Murchison Meteorite-এর মধ্যে জীবাশ্মের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়নি। তাছাড়া ধূমকেতুর মধ্যে প্রাণের উপস্থিতি সম্বন্ধে হইল-এর দৃঢ় প্রত্যয়ের কোনো তথ্যগত সমর্থন পাওয়া যায়নি। 1986 সালে Comet Halley-র শেষ আবির্ভাবকালে তার গঠন, উপাদান ইত্যাদির পরীক্ষার্থে প্রেরিত সন্ধানী যানগুলি (probes) যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছে সেগুলির মধ্যে কোনো জীবাণুর বা কোনো অসাধারণ রকমের পরিণত জৈব অণুগুচ্ছের ইঙ্গিত নেই। এ থেকে অবশ্য কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং বলতে হয় এই গভীর রহস্যটি আজও অমীমাংসিত। পরের পরিচ্ছেদে এই দুর্জ্ঞেয় বিষয়টি সম্পর্কে কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর চিন্তা-ভাবনার কিছু আভাস দেওয়া হয়েছে।



বারো

শেষ কথা কে বলবে?

বিশ্বলোক সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান বিজ্ঞানীরা আহরণ করতে পেরেছেন সে সম্পর্কে বহু কথাই এখনও বাকি। অনেক কথাই এই সীমিত পরিসরের মধ্যে বলা সম্ভব হলো না এবং অনেক কথাই বর্তমান লেখকের ধারণার বাইরে। কিন্তু এবার শেষ করতে হয়। কারণ বিশ্বতত্ত্বের গোলকধাঁধায় এই ইতস্তত ভ্রমণের কোনো শেষ দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং বিশ্বলোক সম্বন্ধে দীর্ঘবিবর্তিত এইসব ধারণাগুলি থেকে যে-সব বিচিত্র প্রশ্ন মানুষের মনে জেগে উঠেছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলে আমাদের এই বিশ্বপরিক্রমা-প্রসঙ্গ শেষ করা যাক।

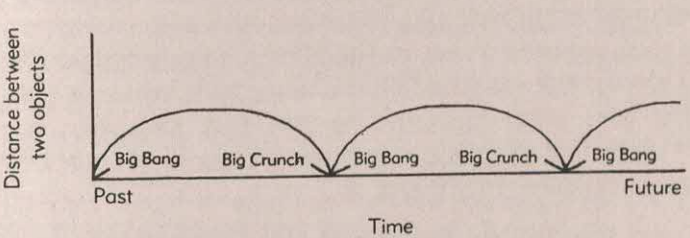
বিশ্বের গঠন সম্পর্কে যে-সব তত্ত্ব ও চিত্রগুলির পরিচয় আমরা দিয়েছি সেগুলি সবই General Theory of Relativity-র ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু এ-বিষয়ে আরো কয়েকরকম তত্ত্ব আছে যা Relativity-ভিত্তিক নয়। এদের মধ্যে Hoyle-Narlikar Theory of Gravitation একটি। এই জাতীয় তত্ত্বগুলি রচিত হয়েছে Mach's Principle-এর ভিত্তিতে—যে-সূত্র অনুযায়ী বিশ্বের যে-কোনো একটি কণার ভর ঠিক কত হবে তা নির্ভর করছে বিশ্বলোকে উপস্থিত অন্য-সমস্ত কণার সম্মিলিত ভরের ওপর। এই-সব তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত আর একটি মৌলিক ধারণা প্রবর্তিত হয়েছে। সেটির বক্তব্য এই যে মহাকর্ষ-ধ্রুবক বা gravitational constant (G) একটা চিরস্থির ব্যাপার নয়। বিশ্বের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে G-এর মান ক্রমশই কমে এসেছে। অর্থাৎ একই দূরত্বে অবস্থিত একই ভরের দুটি বস্তুপিণ্ডের মধ্যে অভিকর্ষের টান বিশ্বের প্রাক্কালে যতটা প্রবল ছিল এখন আর ততটা নেই। তা যদি হয় তাহলে অবশ্য অনেক হিসেবই বদলে যায়। 1937 সালে প্রখ্যাত কোআন্টাম-বিজ্ঞানী Paul Dirac এইরকম একটি ধারণার প্রাথমিক অবতারণা করেন। সামগ্রিকভাবে এই চিন্তাসূত্রগুলির স্থান এখন নিতান্তই গৌণ। কিন্তু ভবিষ্যতে কোনো একদিন এদের কোনোটি যে অন্তত কিছুটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে বিশ্বতাত্ত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনবে না তা জোর করে বলা যায় না।

Missing mass-এর রহস্য

সব মিলিয়ে, এই বিশ্বের ছবি আমাদের মনে এক দুর্বার সম্মোহন, এক অসীম বিস্ময়ের দোলা জাগায়। এত জেনেও মনে হয় আমরা যেন সবে রহস্যের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি।

নক্ষত্রখচিত এই যে ছায়াপথ-মহাকাশ, আর তার ওপারে কোটি কোটি ছায়াপথ-বিকীর্ণ যে মহাশূন্যের প্রসার—এ কী অসীম, অনন্ত? নাকি কোথাও এর একটা শেষ আছে? শেষ থাকলে তার ওপারে কী আছে?

বিশ্ব কি চিরদিনই ছিল, না কি এক মহাবিস্ফোরণের ভিতর দিয়ে তার জন্ম হয়েছিল? 1500 কোটি বা 2000 কোটি বছর আগেকার এই বিস্ফোরণই কি সব কিছুর শুরু? না কি, আগেকার এক প্রসারিত অবস্থা থেকে সংকোচনের ফলেই ঐ বিস্ফোরণ হয়ে আবার এক প্রসারণপর্ব শুরু হয়? তাহলে বিশ্বটি কি একটি দোলকের মত (an oscillating universe) একবার প্রসারিত, একবার সংকুচিত হচ্ছে? আজকে আমরা বিশ্বের প্রসারণের যে চিত্রটি পাচ্ছি, তার পরিণতি কোথায়? বিশ্বে বস্তুর ঘনত্ব কি এমন যে তার অভিকর্ষশক্তি শেষ পর্যন্ত প্রসারণকে ঠেকিয়ে তাকে আবার সংকোচনে পরিণত করবে?



চিত্র 42 মহাবিশ্বের oscillating বা দোলনশীল মডেল।

একটি বিরাট অমীমাংসিত প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সি-র মধ্যে এবং সাধারণভাবে বিশ্বের গ্যালাক্সিপুঞ্জগুলিতে লক্ষিত missing mass বা ভরের আপেক্ষিক ঘাটতি। একটি গ্যালাক্সি বা গ্যালাক্সিপুঞ্জের নিজস্ব অভিকর্ষজনিত যে আবর্তনছন্দ তার থেকে আমরা তার মধ্যে কতটা বস্তু বা ভর আছে তা নিউটনীয় তত্ত্বের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারি। আশ্চর্য এই যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লক্ষিত ভর প্রত্যাশিত ভরের চেয়ে অনেক অনেক কম। এর থেকে অনুমান করা হচ্ছে সমস্ত বিশ্বক্ষেত্রেই মহাকর্ষ-জনিত গতিছন্দ ও অভিকর্ষ-সৃষ্টিকারী বস্তুভরের মধ্যে এই অদ্ভুত আপাত-বৈষম্য রয়েছে।

এই missing mass-কে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? আমাদের কুশলী পর্যবেক্ষণকে এড়িয়ে এই বিপুল-পরিমাণ ভর কোথায় লুকিয়ে আছে? তিনটি প্রধান উৎস অনুমিত হয়েছে। প্রথমত, আমরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রধানত আলোকনিঃসারী, infrared-নিঃসারী ও রেডিওতরঙ্গ-নিঃসারী বস্তুগুলিকে দেখতে পাই। তার সঙ্গে অবশ্য অন্ধকার ধূলিপুঞ্জগুলিকেও যথাসম্ভব লক্ষ্য করে গ্যালাক্সিতে তাদের গড় ঘনত্ব অনুমান করতে পারি। কিন্তু মহাকাশে হয়তো অন্ধকার রশ্মিহীন পদার্থ বিপুল পরিমাণে বর্তমান—যার একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মাত্র সন্ধান আমরা পেয়েছি। অদৃশ্য তারাগুলির মধ্যে ধরা পড়েছে শুধু সেইগুলিই যারা কোনো দৃশ্য-তারার সঙ্গে মহাকর্ষ-বন্ধনে জড়িত। কিন্তু যে-সব সঙ্গীহীন white dwarf একেবারে নিবে গিয়ে black dwarf-এ পরিণত হয়েছে, বা যে-সব নিঃসঙ্গ neutron star-এর রেডিওরশ্মির মেরু আমাদের দিকে ফেরানো নয় তাদের অস্তিত্ব আমরা টেরই পাব না। এই অদৃশ্য collapsed star-দের বিপুল সংখ্যা হয়তো মহাকাশের অদৃশ্য ভরের বেশ কিছুটা রচনা করে আছে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য উৎস হচ্ছে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে অগণ্য সংখ্যায় সেই ছায়াময় neutrino-দের উপস্থিতি। Weak interaction-এ নিউট্রিনোদের ভূমিকা আমরা আলোচনা করেছি। আমরা জানি যে আদিবিশ্বের অতি-উত্তপ্ত অবস্থায় বস্তুকণা ও রশ্মিকণার নিরন্তর রূপবিনিময়ের যুগে অগণ্য কোটি নিউট্রিনো (ও অ্যান্টিনিউট্রিনো) সৃষ্টি হয়েছিল। এমনও হতে পারে যে আমাদের যা ধারণা তার চেয়ে বহুগুণ বেশি সংখ্যায় উৎপন্ন হয়েছিল। তত্ত্ব অনুযায়ী নিউট্রিনোরা আলোককণার (Photon-এর) মতো স্থিতি-ভরহীন (rest mass=0)। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানীই এখন সন্দেহ করেন neutrino-দের অতি সামান্য একটু ভর থাকতেও পারে। তা যদি হয় তাহলে ঐ অভাবনীয় সংখ্যায় বিদ্যমান নিউট্রিনোদের সম্মিলিত ভরের মধ্যে missing mass-এর একাংশ লুকিয়ে থাকতে পারে।

তৃতীয় উৎসটি হচ্ছে black hole-দের অদৃশ্য উপস্থিতি। অনুমান করা যায়, অতিঘন আদি বিশ্বের পরিসরে সর্বত্রই ঘনত্বের কিছুটা স্থানীয় তারতম্য ছিল, এবং অত্যধিক ঘন অঞ্চলসমূহের বস্তুকণাগুলি collapse করে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু রীতিমতো গুরুভর ব্লাকহোল-এ পরিণত হয়ে থাকতে পারে। ঐ কণাবৎ ব্ল্যাকহোলগুলির সম্মিলিত ভর হয়তো গ্যালাক্সিদের সম্মিলিত ভরের চেয়েও বেশি। তাছাড়া supernova-দের ধ্বংস থেকে সময়ে সময়ে যে-সব বিপুল-ভরের ব্ল্যাকহোল সৃষ্টি হয় তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট। কারণ সঙ্গীহীন ব্ল্যাকহোলদের অস্তিত্ব আমরা জানতেই পারব না।

সহজেই বোঝা যায়, প্রসারণশীল বিশ্বে বস্তুর গড় ঘনত্বের প্রশ্নের সঙ্গে এই missing mass-এর ব্যাপারটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই অদৃশ্য ভর যদি যথেষ্ট বেশি হয় তাহলে বিশ্বে মাধ্যাকর্ষণশক্তি সামগ্রিকভাবে অনেক বেশি প্রবল হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ফলে বহুযুগ পরে একদিন বিশ্বের প্রসারণ থেমে গিয়ে বিশ্ব আবার ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকবে। কিন্তু এই অদৃশ্য ভরের পরিমাণ আজও আমাদের অজানা।

বিশ্বের উৎপত্তি-সন্ধানে Big bang ও Inflation তত্ত্ব কি আমাদের আরো অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারবে? সেই আদিম অগ্নিকুণ্ডের রহস্য-যবনিকা কোনোদিনই কি উন্মোচিত হবে? সেই আদি মুহূর্তগুলির রহস্যের মধ্যেই কি আজকের বিশ্বের জটিলতম রহস্যগুলির সূত্র প্রচ্ছন্ন আছে? এই যে অগণ্য ছায়াময় virtual particle সেকেন্ডের কোটি ভাগেরও কম সময় ঝিলিক মেরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, এদের কি real অবস্থায় পাওয়া যাবে ঐ আদিম অগ্নিগোলকের মধ্যে? Antiparticle-গুলির অন্তর্ধানের রহস্যও কি ওখানেই লুকিয়ে আছে?

Alan Guth ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের চিন্তাপ্রসূত quantum vacuum-এর ধারণা শেষপর্যন্ত কতটা যুক্তিসহ বা গ্রহণযোগ্য হয়ে দাঁড়াবে? সত্যিই কি নিছক শূন্য থেকে বিশ্ব জেগে উঠে থাকতে পারে কণাপুঞ্জের ফেনা হয়ে? শূন্য কি তাহলে শূন্য নয়? তার মধ্যে কি সত্যিই বস্তু ও শক্তিকণা সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে শুধু একটু ভারসাম্য পরিবর্তনের অপেক্ষায়? এঁদেরই চিন্তাপ্রসূত এই ধারণার আর একটি দিকও আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে। বিশ্বের মূলস্বরূপ যে কণাবৎ quantum vacuum-টি ছিল বলে মনে করা হয়েছে, তার মধ্যে কি স্ফীতির প্রাক্কালে (সময়ের মাত্রাটি বাদে) দশমাত্রিক পরিসরের— ten-dimensional space-এর—বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল? কোনো অস্থিতি বা ভারসাম্যচ্যুতির কারণে কি শূন্যের সাতটি

মাত্রা কুঁকড়ে গিয়ে বাকি তিনটি মাত্রার প্রচণ্ড স্ফীতি ঘটায়—যার ফলে বিশ্বপরিসর হয়ে ওঠে ত্রিমাত্রিক (time-কে ধরলে চতুর্মাত্রিক), এবং বাকি সাতটি সংকুচিত মাত্রা electromagnetism, SI, WI প্রভৃতি বিভিন্ন force রূপে দেখা দেয়? এই জাতীয় ধারণা কি বাস্তববিশ্বের কোনো সূক্ষ্মতর ব্যাখ্যা দিতে পারবে?

সময়ের পিছু হাঁটার অর্থাৎ অতীতের দিকে ফিরে যাওয়ার কোন লক্ষণ কি বিশ্বে দেখা যায়? নোবেল-বিজয়ী বিজ্ঞানীদ্বয় John Wheeler ও Richard Feynman যে বলেছেন, positron হচ্ছে অতীতমুখী electron, তার বৃহত্তর তাৎপর্য কী?

সত্যিই কি প্রকৃতির জগতের সমস্ত আলোড়ন থেকেই অতীত ও ভবিষ্যত দুদিকেই তরঙ্গসংকেত প্রসারিত হয়—যাকে এঁরা অভিহিত করেছেন advanced ও retarded wave বলে? সত্যিই কি অতীতমুখী তরঙ্গগুলি অতীতকালের কণাদের দ্বারা প্রতিহত হয়ে নাকচ হয়ে যায়—যার ফলে শুধু ভবিষ্যৎগামী তরঙ্গগুলিই(retarded waves) আমাদের নজরে পড়ে? প্রকৃতির জগতে arrow of time-এর একমুখিতার এই কি তাৎপর্য?

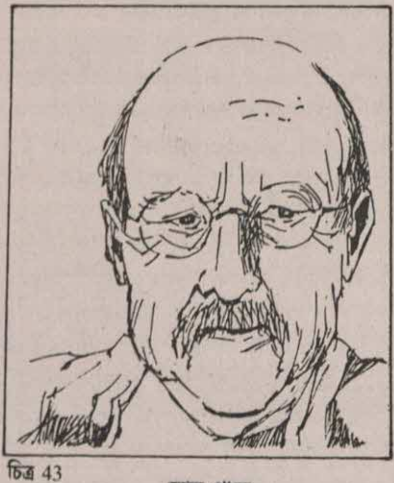
বিশ্বসৃষ্টির মূলে কি আছে?

বিশ্বের সংগঠনে সর্বত্রই লক্ষিত হয় এক অসীম, অভাবনীয় সূক্ষ্মতা আর এক অত্যাশ্চর্য সর্বব্যাপী সামঞ্জস্য। জড়জগতে এবং জীবজগতে, অণুপরমাণুলোকে এবং বিপুলতম বস্তুপুঞ্জে সর্বত্রই এই অতিসূক্ষ্ম ও অপূর্ব সুষম বুননের ছাপ। Cosmic harmony-র এই পরমাশ্চর্য দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে এখন উচ্চতম স্তরের বিজ্ঞানীরাও অনেকে ভাবছেন: এই আশ্চর্য সূক্ষ্ম ও সঙ্গতিময় বিন্যাস, এই symmetry at the heart of everything—এ কি নিছক ঘটনাচক্র-প্রসূত, a product of blind chance, নাকি এর মধ্যে কোনো একটা সচেতন পরিকল্পনার, কোনো একটা conscious design-এর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের কাছে আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রকৃতির যে অসংখ্য নিয়ম বা সূত্রগুলি বিশ্বের নাড়িতে নাড়িতে কাজ করছে সেগুলি মানুষের কাছে, মানুষের নিউট্রিনোবৎ মস্তিষ্কের কাছে, আদৌ বোধগম্য। মনে হয়, সেগুলির ছন্দ মানুষের চেতনার ছন্দের সঙ্গে মেলে বলেই মানুষ বিশ্বস্পন্দনের গূঢ় সূত্রগুলিকে একে একে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করতে পেরেছে। বহু বিজ্ঞানীই এখন তাই মনে করেন যে বিশ্বপ্রক্রিয়া এবং মানুষের মানসপ্রক্রিয়ার মধ্যে গভীরতম স্তরে একটা সামঞ্জস্য না থাকলে বিশ্বের অন্তঃপ্রক্রিয়াগুলির এই বিচিত্র উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভব হোত না, এবং মানুষের গাণিতিক চিন্তাপ্রসূত সমীকরণগুচ্ছ দিয়ে বিশ্বের জটিল প্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা সম্ভব হোত না। এই সবের থেকে বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর মনে একটা সুদূর অনুমান জেগে উঠেছে যে এই মহাবিশ্বের সংগঠনে যেন মানুষের চেতনার সমধর্মী কিন্তু তার চেয়ে অনন্তগুণ শক্তিশালী ও অসীম উন্নত কোনো চেতনার ক্রিয়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

আবার বহুবার এমন হয়েছে যে মানুষ তার অতিনিপুণ, বহুপ্রযুক্ত তত্ত্বগুলি দিয়ে প্রকৃতির কোনো জটিল ক্রিয়ার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। তখন অভ্যস্ত চিন্তার নিগড় ভেঙে নতুন চিন্তাপথ আবিষ্কার করে প্রকৃতির আপাত-অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে বার করতে হয়েছে। এই জাতীয় ঘটনার সবচেয়ে চমকপ্রদ নজির আছে quantum mechanics-এর জন্মবৃত্তান্তের

মধ্যে। দেখা গেল, মৌলকণাদের (fundamental particle-দের) আচরণ, বিশেষত বিচ্ছিন্ন এক-একটি মৌলকণার আচরণ, অনেকটাই এক-একটি খেয়ালি মানুষের আচরণের মতো—কোনো সুস্পষ্ট নিয়মের মধ্যে পড়ে না। এও ধরা পড়ল যে কোয়ান্টাম জগতের কতকগুলি প্রক্রিয়া কোনো পর্যবেক্ষণ বা পরিমাপের মাধ্যমেই নিখুঁতভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। প্রকৃতি যেন এ-সব ক্ষেত্রে একটি প্রহেলিকার জাল তার সামনে মেলে রেখেছে। বিজ্ঞানীরা ঐ বাধার প্রকৃতিকে উপলব্ধি করে এবং ঐ বাধাকে অনতিক্রম্য বলে জেনে বহু সূক্ষ্ম quantum phenomena-র ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছেন নিশ্চয়তার(certainty-র)বদলে সম্ভাব্যতা (probability) দিয়ে এবং নিশ্চয়তাবাদের (determinism-এর) জায়গায় অনির্ণেয়তা বা অনিশ্চয়তাবাদ (indeterminacy বা uncertainty principle) দিয়ে।

এই সময় থেকেই অনেক বিজ্ঞানীর মনে metaphysical speculation বা অধিতাত্ত্বিক চিন্তার ছোঁয়াচ দেখা দেয়। হাইসেনবার্গ-এর অনিশ্চয়তা-সূত্র উপস্থাপন উপলক্ষে আর্থার এডিংটন বলেন যে এখন থেকে বিজ্ঞানীদের মনে ধর্ম কিছুটা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করলো। মোটামুটি এই সময়েই জেম্স্ জীন্স বলেন যে বিশ্বের বিচিত্র গঠন দেখে মনে হয় যে এই জগৎ কোনো pure mathematician-এর সৃষ্টি। বার্ট্রান্ড রাসেল অবশ্য বিজ্ঞানের মধ্যে ঈশ্বর-প্রসঙ্গের অবতারণা করা এবং অধিতাত্ত্বিক চিন্তা নিয়ে আসার জন্য এঁদের কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রবণতাটি চাপা অবস্থায় রয়ে যায়, এবং সম্প্রতিকালে



চিত্র 43
ম্যাক্স প্লাংক



চিত্র 44
ভের্নার হাইসেনবার্গ

আদিবিশ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াস মানুষকে তথ্য ও চিন্তার যে রোমাঞ্চলোকে নিয়ে গেছে তার প্রভাবে এই metaphysical speculation-এর প্রবণতা যেন আরো ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা এই অপার বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে কয়েকজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর উক্তি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করছি।

Quantum theory-র জনক Max Planck বলেন: "বিজ্ঞানের ক্ষমতা নেই প্রকৃতির চরম রহস্যকে উদ্ঘাটিত করার; কারণ আমরা নিজেরাই প্রকৃতির এবং প্রকৃতির রহস্যের অংশ"।



চিত্র 45

এরউিন শ্রডিংগার



চিত্র 46

স্টিফেন হকিং

আইনস্টাইন বলেন: "আমাদের কাছে যা দুর্ভেদ্য রহস্যস্বরূপ তার অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। তার অভিব্যক্তি মহত্তম প্রজ্ঞা ও অনবদ্য সৌন্দর্যের দীপ্তিতে"("manifesting itself as the highest wisdom and the most radiant beauty") । তাঁর ধারণায় "বিশ্বসূত্রগুলির মধ্যে এমন একটি চৈতন্যের অভিব্যক্তি রয়েছে যা মানুষের তুলনায় অসীম উন্নত"("a spirit is manifest in the laws of the universe—a spirit vastly superior to that of man") । তিনি আরো বলেন যে Spinoza-র মতো তিনি বিশ্বব্যবস্থার সামঞ্জস্যের মধ্যে প্রতিভাত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন; তবে মানুষের ভাগ্য বা কার্যকলাপ নিয়ে সারাক্ষণ মাথা ঘামান এমন কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাস নেই।

নোবেল-বিজয়ী Ilya Prigogine, আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনের কথা স্মরণ করে বলেন: "অদ্ভুত ব্যাপার এই যে আজকের বিজ্ঞানের গতি ভারতীয় কবির নির্দেশিত পথেই চলেছে। বাস্তবকে আমরা যে-ভাবেই দেখিনা কেন, বাস্তব আমাদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের সেতুরচনার ভিতর দিয়েই"।

1929 সালে ভারতে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করার পর uncertainty principle - এর আবিষ্কর্তা হাইসেনবার্গ বলেন: "কোয়ান্টামতত্ত্ব-নির্দেশিত বাস্তবের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া এখন অনেকটা সহজ বলে মনে হচ্ছে"।

কোয়ান্টামতত্ত্বের অন্যতম মূল প্রবক্তা Niels Bohr বলেন, অস্তিত্বের এই রঙ্গমঞ্চে "আমরা একাধারে অভিনেতা ও দর্শক"। Wave mechanics-এর প্রবক্তা Erwin Schrodinger বলেন: "কর্তা ও কর্ম অভিন্ন"। তিনিই অন্যত্র বলেন: "আমি জানি না আমি কোথা থেকে এসেছি বা আমি কে"। আর একজন নামকরা পদার্থবিজ্ঞানী এই মত প্রকাশ করেন যে ভবিষ্যতে বস্তুসংক্রান্ত তত্ত্বরচনায় বোধ হয় মানবচেতনাকে একটি সুস্পষ্ট উপাদান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ফ্রেড্ হইল তো স্পষ্টভাবেই—হয়তো অত্যধিক স্পষ্টভাবেই—বলেছেন: "বিশ্বলোক একটা পরিকল্পিত ব্যাপার" ("the universe is a put-up job")।

উচ্চতম স্তরের বিজ্ঞানীদের মধ্যে এমনও অনুমান দেখা দিয়েছে যে বিশ্বের সম্পূর্ণ ভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত কণাদের মধ্যে কোনো ধরনের তাৎক্ষণিক যোগাযোগ থাকতে পারে—যদিও তা আইনস্টাইনের বিজ্ঞান-স্বীকৃত Special Relativity তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে যায়। এঁদের মধ্যে আছেন নোবেল-বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী Brian Josephson।

আজকের বিশ্বতাত্ত্বিক চিন্তার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা Paul Davies তাঁর *Superforce* নামক গ্রন্থে বলেছেন: "যে-সব বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলীর মাধ্যমে বিশ্বের স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব ঘটেছে, সেগুলি এক অভাবনীয় কুশলী পরিকল্পনার পরিচয় বহন করে। Physics-এর সূত্রগুলি যদি পরিকল্পনা-প্রসূত হয় তাহলে বিশ্বসৃষ্টির পিছনে নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে, এবং আজকের পদার্থবিদ্যার সাক্ষ্য থেকে আমার খুবই মনে হয় আমরা ঐ সৃষ্টি-পরিকল্পনার অঙ্গীভূত"।

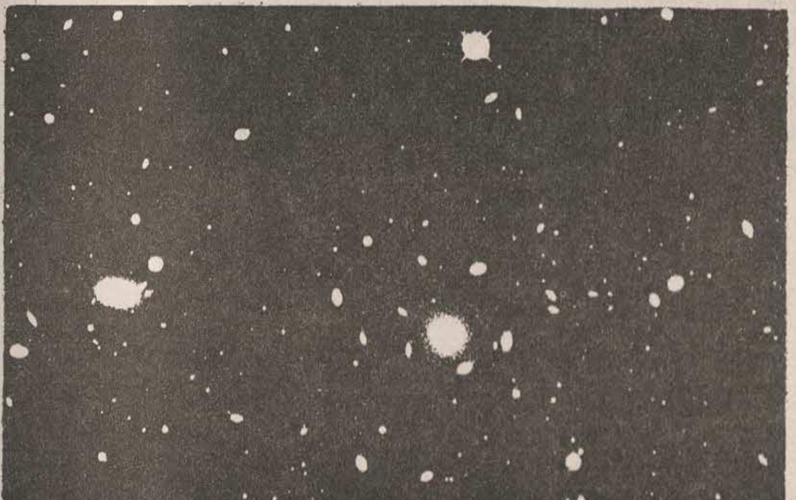
পক্ষান্তরে, বিশ্বতত্ত্বের এই বৈপ্লবিক অগ্রগতির যুগে metaphysical চিন্তাপ্রবণতার বিরোধীদের কণ্ঠস্বর আর বিশেষ শোনা যাচ্ছে না। সে-যুগে Bertrand Russell Jeans ও Eddington-এর অধিতাত্ত্বিক চিন্তার যে ধরনের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন তা আর এ-যুগে বিশেষ শোনা যাচ্ছে না। তবে আজকের বিশ্বচিত্র দেখে বিস্ময়বিমূঢ়, কিন্তু অধিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় অনাগ্রহী কিছু বিজ্ঞানী অবশ্যই রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হচ্ছেন electromagnetic force ও weak interaction-এর মৌলিক অভিন্নতার যুগ্ম-আবিষ্কারক Steven Weinberg। তিনি বলেছেন: "বিশ্ব আমাদের কাছে যতই বোধগম্য হয়ে উঠছে ততই তাকে আরো বেশি অর্থহীন মনে হচ্ছে" ("The more the universe seems comprehensible the more it also seems pointless")।

প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী John Wheeler (যিনি "black hole" নামটি উদ্ভাবন করেন) যা বলেছেন তাও হয়তো এই শ্রেণীর চিন্তার মধ্যেই পড়ে: "কোনো একদিন নিশ্চয়ই একটা দরজা খুলে গিয়ে বিশ্বের জ্যোতির্ময় চালন-কেন্দ্রটির সরল সৌন্দর্য আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হবে" ("Some day a door will surely open and expose the glittering central mechanism in its beauty and simplicity")।

Stephen Hawking বলেছেন: "তবে আমরা সত্যিই যদি কোনোদিন [বিশ্বসৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে] পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে পারি, তাহলে তার মর্মার্থ কালক্রমে সকলের কাছেই পরিস্ফুট হওয়া উচিত—কেবলমাত্র কয়েকজন বিজ্ঞানীর কাছে নয়। আমাদের ও বিশ্বসংসারের অর্থ-সম্পর্কিত আলোচনায় তখন আমরা সকলেই—দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাধারণ লোক সবাই—অংশগ্রহণ করতে পারবো। ঐ প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা পাই তাহলে সেটা হবে

মানব-মনীষার চরম সার্থকতা। কারণ তখন আমরা ঈশ্বরমানসের সঙ্গে পরিচিত হবো। (for then we would know the mind of God)।"

সবশেষে আমরা আজকের বিমুগ্ধকর বিশ্বচিত্রটি সম্বন্ধে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী জে· বি· এস· হলডেন-এর বিচিত্র উক্তিটি তুলে দিচ্ছি: "বিশ্ব শুধু যে আমরা তাকে যতটা অদ্ভুত বলে মনে করি তার চেয়েও বেশি অদ্ভুত তাই নয়, বিশ্ব এতই অদ্ভুত যে আমাদের কল্পনাশক্তিও সেখানে পৌঁছাতে পারে না"।



চিত্র 47

দূরবিশ্বের আর একটি দৃশ্য। ছায়াপথের উত্তর মেরুর দিকে অবস্থিত এক হাজারেরও বেশি প্রচণ্ড-উজ্জ্বল গ্যালাক্সি-সমন্বিত Coma Cluster নামে পরিচিত এক বিপুল গ্যালাক্সিপুঞ্জ। ছবিতে পুঞ্জের কেন্দ্রস্থলটি দেখা যাচ্ছে। পুঞ্জটি প্রায় 40 কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এবং সেকেন্ডে 6700 কি·মি· বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। (Kitt Peak National Observatory-র সৌজন্যে)

আর সবচেয়ে বড় বিস্ময় বোধহয় এই আমরা—যারা মহাশূন্যের এক নগণ্য বালুকণায় পাক খেতে খেতে আমাদের quark-সদৃশ মস্তিষ্ক দিয়ে এই অভাবনীয় বিপুলতাকে বোঝার চেষ্টা করছি, এর অসীম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছি, এর অতল রহস্যকে আমাদের মানসপ্রসূত তত্ত্বজালে বন্দি করার চেষ্টা করছি। বিশ্বের স্তরে স্তরে যে বিচিত্র বৈপরীত্য, আমাদের মধ্যেও তাই। মানুষের বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞানপিপাসা, মহত্ত্ব, উদারতা, সৌন্দর্যচেতনা, প্রীতিপ্রবণতা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং মহান আদর্শবাদিতা তাকে তথাকথিত দেবতার পর্যায়ে নিয়ে যায়—Hamlet-এর বিখ্যাত উক্তি, What a piece of work is man!-এর মধ্যে যার মর্মার্থ ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু একই

সঙ্গে—যদিও কম পরিমাণে—রয়েছে মানুষের নিজেরই বৃহত্তর স্বার্থ সম্পর্কে অদ্ভুত নির্বুদ্ধিতা, অন্ধ কুসংস্কার, নীচতা, সংকীর্ণতা, কুৎসিততা, বিদ্বেষ, অপরাধপ্রবণতা এবং নির্মম স্বার্থান্ধ সুযোগসন্ধান। বিশ্ব তার বিপুল প্রচ্ছন্ন রহস্যলোক দিয়ে আমাদের ঘিরে আছে। আমাদের উদ্দেশে কোনো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা বিশ্বলোক থেকে উৎসারিত হচ্ছে কি না—"নীরবতার গভীরে, বিহ্বল বায়ে, নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে" কোনো সুর ভেসে আসছে কি না—তা বোঝার কোনো উপায় নেই। অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, আমাদের প্রতি বিশ্ব সংবেদনহীন, নিরুত্তর। আমাদের দিকে এগিয়ে আসার তার উপায় নেই। কিন্তু মানুষের উপায় আছে মহাবিশ্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার। মনুষ্যলোকের অন্তর্দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে পারলে তবেই মানুষ তার সংহত শক্তিকে নিয়োগ করতে পারবে বিশ্বলোকের মর্মে আরো গভীরভাবে প্রবেশ করার প্রয়াসে। যার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক চেতনা ও সৌন্দর্যবোধ এই অভাবনীয় পর্যায়ে উন্নীত, এই দুর্জ্ঞেয় বিশ্বকে উপলব্ধি করতে যে এত উৎসুক, আশা করা যায় সে একদিন তার মহত্তর সত্তাকে তার হীনতর প্রবৃত্তিগুলির নিয়ন্ত্রক করে তুলবে। সেদিন সে আরো বেশি শক্তি ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে বিশ্বরহস্যের সম্মুখীন হবে, এবং হয়তো ঐ রহস্যের সন্ধানের ভিতর দিয়ে নিজের অস্তিত্বের রহস্যের সন্ধানের দিকেও এগিয়ে যাবে।



বিশ্বশক্তিগুলির ঐক্যসন্ধানের পটভূমি : সুপারস্ট্রিং তত্ত্বের পুনরভ্যুত্থান

নবম পরিচ্ছেদে 92 পৃষ্ঠায় আমরা Quantum Chromodynamics বা কোআর্ক-তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনাকালে String theory বা সূত্রতত্ত্বের উল্লেখমাত্র করেছিলাম। চারটি বিশ্বশক্তির সমন্বয়ের এই অভিনব তত্ত্বটি খুবই জটিল। কিছু গুরুতর বাধার সম্মুখীন হয়ে মাঝখানে তত্ত্বটির অগ্রগতি ব্যহত হয়। কিন্তু 1984 থেকে মহাসূত্রতত্ত্ব বা Superstring theory নামে পরিচিত এই চিন্তাসূত্রটি আবার এগোতে থাকে, এবং বর্তমানে এটি বিশ্বতত্ত্ব-রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রস্থলেই অবস্থান করছে বলা যায়। স্টিভ্‌ন ওআইনবার্গ ও স্টিফেন হকিং-এর পর্যায়ের মনীষীরাও আশা করছেন এই তত্ত্বটি বিশ্বরহস্যের সন্ধানে আমাদের অনেকদূর নিয়ে যেতে পারবে। এখানে আমরা এই চিন্তাসূত্রটির একটি নিতান্তই সরল এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করব।

সমন্বয়-সাধনার পটভূমি

বিশ্বের বিভ্রান্তিকর বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের মধ্যে ঐক্যসূত্রের সন্ধান মানুষের এক সহজাত প্রেরণা। আধুনিক কালে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে নিউটন আমাদের পার্থিব জীবনে লক্ষিত মাধ্যাকর্ষণ-ক্রিয়াগুলির সঙ্গে বিশ্বব্যাপ্ত বিপুল গ্রহনক্ষত্রলোকের গতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেন। প্রায় দুশতাব্দী পরে 1860 নাগাদ ম্যাক্‌সওয়েল (James Clerk Maxwell) বিদ্যুৎশক্তি (তড়িৎশক্তি) ও চুম্বকশক্তিকে একই মৌলিক শক্তির দুটি অভিব্যক্তিরূপে দেখান। তারপরে 1905 সালে আইনস্টাইন-এর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ সমন্বিত করলো স্থান ও কালকে এবং একই সঙ্গে বস্তু ও শক্তিকে। 1915-16 সালে তাঁরই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নতুন মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের মাধ্যমে বস্তু-শক্তির সঙ্গে স্থান-কালকে সমন্বিত করলো। এর পরে বিশ ও ত্রিশের দশকে কোআন্টাম বলবিদ্যা বস্তু ও শক্তি দুটির মধ্যেই নিহিত কণাপ্রকৃতি ও তরঙ্গপ্রকৃতিকে সমন্বিত করলো।

কোআন্টাম বলবিদ্যাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে আইনস্টাইন দীর্ঘদিন চেষ্টা করেন তড়িৎচুম্বকীয় শক্তি ও মাধ্যাকর্ষণকে একসূত্রে গাঁথতে। সে চেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি।

বর্তমান যুগ হচ্ছে আগেকার পরিচিত দুটি শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ ও তড়িৎ-চুম্বকত্ব, এবং পরবর্তীকালে কোআন্টাম বলবিদ্যা চর্চার মাধ্যমে আবিষ্কৃত 'প্রবল' ও 'দুর্বল' শক্তি—এই চারটি বিশ্বশক্তির মৌলিক একত্বসন্ধানের যুগ। এই সন্ধানের পথে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হচ্ছে

এযুগের দুটি শ্রেষ্ঠ ও সফলতম তত্ত্বচিন্তা আপেক্ষিকতা ও কোআন্টাম বলবিদ্যার দুটি ভিন্ন পর্যায়ের জ্ঞানলোককে সমন্বিত করা। কোআন্টাম বলবিদ্যা অতিক্ষুদ্র কণাজগতের সঠিক পরিমাপ করতে পারে, কিন্তু এই কোআন্টাম জগতের সঙ্গে আপেক্ষিকতা-প্রদত্ত মাধ্যাকর্ষণের ব্যাখ্যাকে মেলানো যাচ্ছে না। আবার আপেক্ষিকতা কণাজগতের বিচিত্র আচরণকে—তরঙ্গ-কণা দ্বৈততাকে, অনিশ্চয়তাসূত্রকে বা প্রবল ও দুর্বল শক্তিকে—ব্যাখ্যা করতে পারে না।

মহাসমন্বয় তত্ত্বগুলি (Grand Unified Theories বা GUT) মাধ্যাকর্ষণকে বাদ দিয়ে বাকি তিনটি শক্তির সমন্বয়সূত্র আবিষ্কারে প্রয়াসী। এই ক্ষেত্রে একটি বিরাট সাফল্য হচ্ছে সম্প্রতিকালে ওআইনবার্গ ও সালাম কর্তৃক তড়িৎচুম্বকশক্তি ও দুর্বল আন্তঃক্রিয়ার মৌলিক একত্ব প্রতিপাদন (93 পৃষ্ঠা দেখুন)। কিন্তু এর পরের ধাপটি, অর্থাৎ এই সমন্বিত ইলেকট্রো-উইক (Electroweak) শক্তির সঙ্গে প্রবল শক্তির সমন্বয়-সাধন এখনও বহু দূরে।

আদিবিশ্বের তাপমাত্রা আমাদের নাগালের বাইরে

অধিকাংশ বিশ্বতাত্ত্বিকেরই ধারণা, চারটি শক্তির অভিন্নতাকে যদি প্রত্যক্ষ করতে হয় তাহলে মহাবিস্ফোরণের পরবর্তী কয়েক মুহূর্ত পর পর্যন্ত (10^{-43} সেকেণ্ড পর পর্যন্ত) বিরাজমান সেই কল্পনাতীত তাপের অবস্থাটিকে (যাকে Planck energy বলা হয়) আবার কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করতে হবে। তা যে সম্ভব নয় তা বলাই বাহুল্য। কারণ তার জন্য এমন একটি কণাত্বরণযন্ত্র (particle accelerator) নির্মাণ করতে হবে যার কুণ্ডলিত গতিপথের পরিধি হবে 1000 আলোকবর্ষ। প্রসঙ্গত, সৌরজগতের পরিধি এক আলোকদিবসের মতো (*Scientific American February 1994*-এ প্রকাশিত John Horgan-এর Particle Metaphysics দ্রষ্টব্য)।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে CERN-এর যন্ত্রটির চেয়ে কুড়ি-পঁচিশগুণ শক্তিশালী যে Superconducting Super Collider (SSC) নামক কণাত্বরণ যন্ত্রটির নির্মাণের আয়োজন শুরু হয়েছিল সেটি দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যয়াধিক্যের জন্য পরিত্যক্ত হয়েছে। অবশ্য তার মাধ্যমে ইলেকট্রো-উইক ও প্রবল আন্তঃক্রিয়ার সমন্বয় প্রত্যক্ষ করার মতো তাপমাত্রাও, বা তার কাছাকাছি তাপও, উৎপন্ন করা যেতো না। কারণ, ঐ পরিমাণ তাপ উৎপাদনের জন্য কুণ্ডলিত ত্বরণযন্ত্রটির পরিধি হওয়া দরকার এক লক্ষ কোটি কিলোমিটার।

ত্রিশক্তি বা চতুঃশক্তি সমন্বয় সন্ধানের অবশ্য আর একটি পথ আছে। সেটি নিছক তত্ত্বচিন্তার পথ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি"। সে পথে কোআন্টাম বলবিদ্যা ও আপেক্ষিকতাকে সমন্বিত করে বহু quantum-gravity-ভিত্তিক সাহসিক তত্ত্বরচনার প্রয়াস সম্প্রতিকালে হয়েছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্যের (lack of internal symmetry-র) জন্যই সেগুলি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি।

অসীমতার প্রকোপ: সামঞ্জস্যের দৈন্য

এইসব তত্ত্বরচনার পথে একটি বাধা হচ্ছে সমীকরণগুলিতে পদে পদে অবাঞ্ছিত এবং বিভ্রান্তিকর infinity অর্থাৎ অসীমতাসূচক সংখ্যার আবির্ভাব। ব্যাপারটা খানিকটা এইরকম।

সকলেই জানেন, কোনো উৎস থেকে নির্গত আলো বা মাধ্যাকর্ষণশক্তি উৎস থেকে যতই দূরে যায় ততই তার জোর কমে আসে দূরত্বের বিপরীতবর্গ (inverse square) হিসাবে। চারগুণ দূরত্বে গেলে শক্তির তীব্রতা 16 গুণ কমে যাবে; চারগুণ কাছে এলে 16 গুণ বাড়বে। অর্থাৎ বিশেষ দূরত্বে উৎস থেকে বিকীর্ণ শক্তির তীব্রতার মাপ পাওয়া যাবে শক্তির পরিমাণকে d^2 অর্থাৎ দূরত্বের বর্গ দিয়ে ভাগ করলে (d^2 এর জায়গায় r^2 অর্থাৎ radius squared-ও বলা হয়)। d^2 দিয়ে ভাগ মানে $1/d^2$ দিয়ে গুণ।কিন্তু শক্তির উৎস ঐ বিন্দু-কণাটির একেবারে গায়ে—যেখানে দূরত্ব হচ্ছে শূন্য ($d=0$)—সেখানে শক্তির পরিমাণ কী দাঁড়াবে? গণিতের নিয়ম অনুযায়ী পরিমাণটি হবে$1/0^2$, অর্থাৎ অসীম। এই জাতীয় সংখ্যাকে পদার্থবিদ্যায় ill-defined এবং infinite বলা হয়, এবং এগুলির উপস্থিতিতে নির্ভরযোগ্য তত্ত্বরচনা সম্ভব নয়।

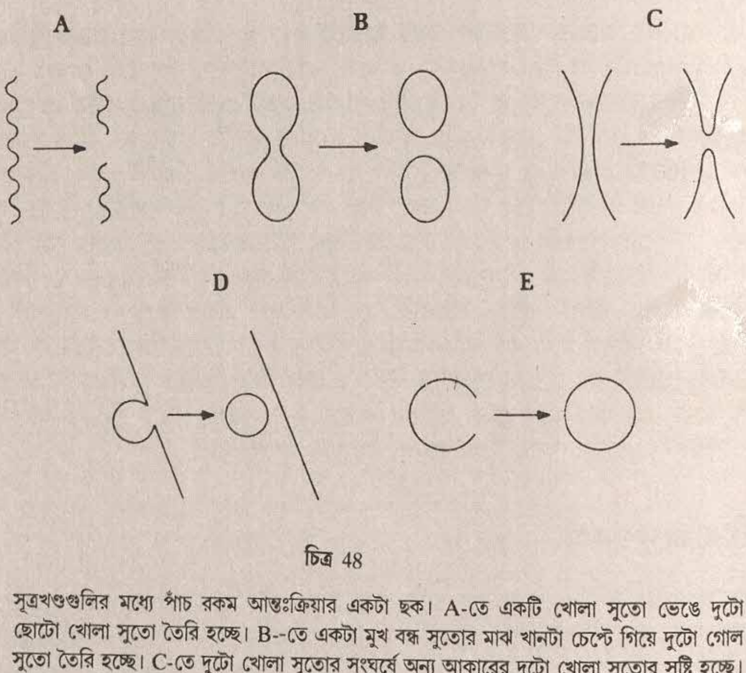
বলা হয়, এই জাতীয় অধিকাংশ তত্ত্বই দাঁড়াতে পারেনি তাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে gauge symmetry বা মিতি-সামঞ্জস্য নেই বলে। অতি সংক্ষেপে বলা যায়, কোনো তত্ত্বের সূত্রগুলি বিভিন্ন রকমের ঘূর্ণন বা বৈপরীত্যের মধ্যেও কতটা অপরিবর্তিত থাকে তার ওপর নির্ভর করছে ঐ তত্ত্বের গেজ্-সিমেট্রি কতটা। (যেমন একটি গোলকের মিতি-সামঞ্জস্য একেবারে পরম বা absolute।) কণাগুলি যদি সব বিপরীতকণায় পরিবর্তিত হয়, ডান ও বাঁ দিকের যদি পারস্পরিক রূপান্তর ঘটে, এবং সমস্ত কণাদের গতি যদি বিপরীতমুখী হয়ে যায় তাহলেও যে-তত্ত্বের সূত্রগুলি অপরিবর্তিত থাকবে তার মিতি-সামঞ্জস্য বেশ ভালো বলে ধরতে হবে। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় এই ধরনের মিতি-সামঞ্জস্যকে বলে CPT Symmetry। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ, প্রবল শক্তি-ব্যাখ্যাকারী কোআর্ক-তত্ত্ব এবং সালাম-ওআইনবার্গ-এর ইলেকট্রো-উইক তত্ত্বের মধ্যে এই মিতি-সামঞ্জস্য খুবই উচ্চ পর্যায়ের। কিন্তু GUT বা গ্র্যান্ড ইউনিফাইড থিওরিগুলি, যেগুলি ইলেকট্রো-উইক ও প্রবল আন্তঃক্রিয়াকে সমন্বিত করতে চায়, তাদের মধ্যে এই জাতীয় সুষমার গুরুতর অভাব ধরা পড়ছে। আর GUT-এর সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণকে মেলানোর দিকে এক পা-ও এগোনো যাচ্ছে না।

স্ট্রিং থিওরির মূল কথা

স্ট্রিং বা সুপারস্ট্রিং তত্ত্বের প্রবক্তাদের দাবি, তাঁদের তত্ত্ব ঐ সমস্ত বাধাগুলোকে বহুলাংশে অতিক্রম করে সমস্ত বিশ্বের একটি চতুঃশক্তি-সমন্বিত গণিতচিত্র রচনার দিকে এগিয়ে চলেছে। এই অভিনব তত্ত্বটির মূল কথাটিকে আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব। অবশ্য এই তত্ত্বের বহুরকম রূপ বিজ্ঞানীমহলে প্রচলিত, এবং এদের কোনটি বা কোনগুলি যে শেষ পর্যন্ত বাস্তব বিশ্বচিত্রের সঙ্গে খাপ খাবে তা কিছুই বলা যায় না।

যে মূল ধারণাটি এই জাতীয় তত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ তা এই যে মহাবিশ্ব-গঠনকারী ক্ষুদ্রতম উপাদানগুলি কণা নয়, ছোটো ছোটো সুতোর টুকরো—strings। এগুলি অবশ্য কল্পনাতীত রকমের ক্ষুদ্র—একটি প্রোটনের দশ লক্ষ কোটি কোটি ভাগের একভাগ (100 billion billion times smaller than a proton)। এই সূত্রাংশগুলির হরেকরকমের সংযুক্তি ও বিযুক্তির ফলেই বিভিন্ন বস্তুকণা ও শক্তিকণার সৃষ্টি, এবং শেষ পর্যন্ত এই অসীমবৈচিত্র্যময় বিশ্বলোকের সৃষ্টি। এই হিসাবে এই জাতীয় তত্ত্বগুলি Theories of Everything বা TOE

নামেও পরিচিত। এই সব সূত্রাংশ সর্বদাই কম্পমান—বহু বিচিত্র ছন্দে কম্পিত বা স্পন্দিত। আর এদের এক এক ধরনের কম্পন এক এক ধরনের বস্তুকণা বা শক্তিকণা সৃষ্টি করে। সেতার বা বেহালার তারে যেমন নানা স্বর ও স্বরসংগতি ধ্বনিত করা সম্ভব, তেমনিই এইসব সূত্রখণ্ডের অসীম কম্পনবৈচিত্র্যই মৌলকণা জগতের বিভ্রান্তিকর বৈচিত্র্য রচনা করেছে। অর্থাৎ প্রকৃতির জগতে যে মূল শক্তি বা আন্তঃক্রিয়াগুলি রয়েছে এবং যে দুশোটিরও বেশি মৌলকণা রয়েছে সেগুলি ঐ সূত্রাংশসমূহের বিভিন্ন ধরনের কম্পন ছাড়া আর কিছুই নয় (the fundamental forces and various particles found in nature are nothing but different modes of vibrations of strings)।



চিত্র 48

সূত্রখণ্ডগুলির মধ্যে পাঁচ রকম আন্তঃক্রিয়ার একটা ছক। A-তে একটি খোলা সুতো ভেঙে দুটো ছোটো খোলা সুতো তৈরি হচ্ছে। B--তে একটা মুখ বন্ধ সুতোর মাঝ খানটা চেপ্টে গিয়ে দুটো গোল সুতো তৈরি হচ্ছে। C-তে দুটো খোলা সুতোর সংঘর্ষে অন্য আকারের দুটো খোলা সুতোর সৃষ্টি হচ্ছে। D-তে একটি খোলা সুতো রূপান্তরিত হচ্ছে একটি খোলা আর একটি গোল সুতোয়। E-তে একটা খোলা সুতোর মুখ দুটো জুড়ে গিয়ে একটা মুখ বন্ধ গোল সুতো তৈরি হচ্ছে।

এই সুতোগুলো দু-ধরনের: দুমুখ-খোলা বা মুক্ত (open), এবং বন্ধ বা মুখজোড়া বা গোলাকার (closed or circular)। একটা খোলা সুতো যখন নড়ে বেড়ায় তখন তার চেহারা হয় কাগজের টুকরোর বা ফালির মতো, আর চলমান মুখবন্ধ সুতোর আকৃতি হয় কাগজের নল বা রবার ব্যান্ডের মতো। কোনোটাই রেখার মতো দেখায় না। দুটি কাগজের ফালির মতো সূত্রখণ্ড যখন সংঘর্ষে আসে তখন তারা সহজেই মিশে গিয়ে একটি নতুন ফালি সৃষ্টি করে।

তাতে একটা Y-আকারের ফালি তৈরি হতে পারে; কিন্তু ঐ Y- গঠন-করা লাইনগুলো রেখা নয়। ওগুলোও ফালি।

আলোককণা বা photon-এর স্থিতি-ভর (rest mass) শূন্য। মাধ্যাকর্ষণশক্তির (তত্ত্বনির্ধারিত কিন্তু এখনো অনাবিষ্কৃত) বাহক-কণা graviton-এরও স্থিতিভর শূন্য। সুপারস্ট্রিং তত্ত্বের ধারণা অনুযায়ী ফোটন হচ্ছে একটা খোলা সুতোর নিম্নতম কম্পন, আর গ্র্যাভিটন হচ্ছে মুখবন্ধ সুতোর নিম্নতম কম্পন। সুতোর কম্পাঙ্কের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে ঐ কম্পাঙ্ক-সৃষ্ট কণার ভর সম্পর্কিত।

এই তত্ত্বগুলির ধারণায় সুতোগুলোর মধ্যে মাত্র পাঁচ রকমের জোড় বা আন্তঃক্রিয়ার ভিত্তিতেই সমস্ত তত্ত্বের কাঠামোটিকে দাঁড় করানো যায়।

এই জাতীয় তত্ত্বের একটা সুবিধে যে থাকবে তা সহজেই বোঝা যায়। এদের সমীকরণগুলিতে GUT-জাতীয় তত্ত্বগুলির মতো অসীমতা-সূচক সংখ্যার প্রকোপ থাকার কথা নয়। কারণ এখানে মৌল উপাদানগুলি কণা নয়, সুতো বা ফালি আকারের। এগুলি একেবারে আয়তনহীন বিন্দু নয়। এদের একেবারে গায়েও কেন্দ্র থেকে দূরত্ব শূন্য হতে পারে না ($d=0$ বা $r=0$ হতে পারে না)। সুতরাং কণার একেবারে গায়ে $d=0$ হওয়ায় শক্তির পরিমাণ যে $1/0^2$ অর্থাৎ অসীম হয়ে দাঁড়াচ্ছে,সে বিপদ স্ট্রিং-এর ক্ষেত্রে নেই। 1-এর নিচে শূন্যের চেয়ে একটু বেশি কিছু থাকবেই। সুতরাং শক্তি যতই বেশি হোক, অসীম হতে পারবে না।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা

স্ট্রিং বা সুপারস্ট্রিং তত্ত্বের সূত্রপাত 1968 সালে CERN-এ প্রবলশক্তি সম্পর্কিত গবেষণায় রত ভেনেৎসিয়ানো-র (Gabriel Veneziano-র) তত্ত্বচিন্তায়। বিজ্ঞানীরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে কোআন্টাম বলবিদ্যা ও আপেক্ষিকতা দুটিরই সর্ত পূর্ণ করতে প্রয়াসী এই কণাবিক্ষেপণ (particle-scattering) তত্ত্বের গাণিতিক ছকে যে মৌল উপাদানগুলি এসে পড়ছে সেগুলি কণা নয়, সূত্রখণ্ডের মতো। আর মুখবন্ধ সুতোর অসংখ্য সম্ভাব্য কম্পনের মধ্যে একটি কম্পনের ধর্ম যেন জেনারেল রিলেটিভিটির সেই অধরা মাধ্যাকর্ষণবাহী কণা গ্র্যাভিটনের মতো।

এর পর তত্ত্বটি বহু বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে দেখা গেল স্ট্রিং-তত্ত্ব-কল্পিত গণিত-ছকটি এমন এক বিশ্বের সঙ্গে মেলে যে বিশ্বের স্থানকাল-গঠন চতুর্মাত্রিকের জায়গায় ছাব্বিশমাত্রিক (26-dimensional)। তারপরে অবশ্য Neven-Schwarz-Ramond মডেলে এই স্ট্রিং-বিশ্ব দশমাত্রিক হয়ে দেখা দিল। তা সত্ত্বেও বিশ্বের এই সাংঘাতিক মাত্রাধিক্য বিজ্ঞানীদের কাছে এতই অসম্ভব মনে হল যে এর ধাক্কাতেই সুপারস্ট্রিং তত্ত্ব তখনকার মতো পরিত্যক্ত হল।

তারপরে 1984-তে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অভ্ টেকনোলজি-র গ্রীন (Michael Green) ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শোয়ার্টস্ (John Schwarz) স্ট্রিং-তত্ত্বের অন্তর্নিহিত গভীরতর সামঞ্জস্যের সাক্ষ্য তুলে ধরেন এবং স্ট্রিং-বিশ্বের দশমাত্রিকতার একটা নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে তত্ত্বটিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ঐ মুহূর্তটি সম্বন্ধেই ওআইনবার্গ বলেন: "সমস্ত কাজ ফেলে আমি স্ট্রিং-তত্ত্ব সম্পর্কে যত কিছু জানা সম্ভব জানার চেষ্টা করতে লাগলাম"।

বিশ্বের দশমাত্রিকতার ব্যাখ্যা খানিকটা এইরকম। একেবারে আদিতে বিশ্ব ছিল দশমাত্রিক, কিন্তু অস্থিত অবস্থায়। ফলে স্থিতি ফিরিয়ে আনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াসে বিশ্বের ঐ দশমাত্রিক স্থানকাল-কাঠামো ভেঙে দুখানা হয়ে যায়। ক্ষুদ্রতর চতুর্মাত্রিক খণ্ডটিই আমাদের বিশ্ব। সেটিও তার অস্থিতির দরুন Inflation ও Big Bang প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমস্ফীত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে ছয়মাত্রার খণ্ডটি কুঁকড়ে গিয়ে এত ছোটো হয়ে গেছে যে আমাদের পক্ষে আর তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। এসব কিন্তু খেয়ালি কল্পনা নয়; এর সূক্ষ্ম ও সুসমঞ্জস গণিত-ভিত্তি আছে। তবে বাস্তববিশ্বের সঙ্গে শেষপর্যন্ত এর কতটা মিল হবে তা কেউ জানে না।

মুশকিল হচ্ছে, স্ট্রিং বা সুপারস্ট্রিং তত্ত্বের অসংখ্য রূপগুলির মধ্যে কোনটি বা কোনগুলি যে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে তা বলা এখনো সম্ভব নয়। তবে কয়েকজন উচ্চতম পর্যায়ের বিজ্ঞানীর আশা, এই তত্ত্বের কোনো একটি রূপ হয় আমাদের বিশ্ব-উপলব্ধিকে এক উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাবে, নয়তো আরো গভীর কোনো তত্ত্বচিন্তার পথ উন্মুক্ত করে দেবে।

মানবাস্তিত্ববাদের নিঃশব্দ সঞ্চরণ

স্ট্রিং-তত্ত্বের কোন রূপটি বিশ্বের সামগ্রিক সংগঠনের নিশানা দিতে পারে এই প্রশ্নটি ঘিরে anthropic principle বা মানবাস্তিত্ববাদ নামক একটি সংশয়ক্লিষ্ট চিন্তারীতি বিশ্বতাত্ত্বিকদের মনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর বক্তব্য এই যে বিশ্বসৃষ্টির নিয়মাবলী এমন হওয়ার কথা যাতে তার থেকে এমন সব বুদ্ধিমান জীব জন্মাতে পারে যারা ঐ সৃষ্টিসূত্রগুলো সম্পর্কে চিন্তা ও প্রশ্ন করতে পারে। অনেক বিজ্ঞানী এমন কথা বলেছেন যে প্রকৃতির নিয়মগুলিকে প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে আশ্চর্যরকমের অনুকূল মনে হয়। দর্শিত দৃষ্টান্তগুলির সহজ ব্যাখ্যা করা বেশ দুরূহ। একটি এই যে, তিনটি হিলিআম পরমাণু জুড়ে প্রাণসৃষ্টির পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্বন পরমাণুর সৃষ্টি হওয়াটা একটা প্রায় অলৌকিক ব্যাপার। এই সমন্বয় ঘটানোর জন্য কার্বন পরমাণুর একটি বিশেষ-শক্তিসম্পন্ন অবস্থার প্রয়োজন, এবং পরীক্ষার মাধ্যমে ঠিক ঐ অবস্থাটির অস্তিত্ব সত্যিই ধরা পড়েছে।

আর একটি যুক্তি হল, প্রসারমান আদিবিশ্বের বিভিন্ন পর্যায়ে মহাবিস্ফোরণের অপকেন্দ্রিক শক্তি আর মাধ্যাকর্ষণের অভিকেন্দ্রিক শক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটি আন্তঃসম্পর্ক ছিল, ঠিক যে সম্পর্কটি না থাকলে আদি বিশ্বের বস্তুকণাগুলি অত্যধিক ছড়িয়ে পড়ার আগে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র ইত্যাদির সৃষ্টি এবং প্রাণের আবির্ভাব সম্ভব হোত না। জ্ঞানের বর্তমান পর্যায়ে এ সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত ধারণা সম্ভব নয়। সুতরাং বেচারা anthropic principle আমাদের অভিলাষী চিন্তা, অর্ধবিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মধ্যে দোলা খেয়ে ঘুরে মরছে।

ফিরি কূলহারা সাগরে

তবে চারটি বিশ্বশক্তির সমন্বয়তত্ত্ব যদি আবিষ্কৃত হয়ও, তাহলেও বিজ্ঞানের অন্বেষণ সেখানেই যে শেষ হয়ে যাবে তা মোটেই নয়। অসংখ্য সমস্যা তখনও অমীমাংসিত থাকবে।

গ্যালাক্সিগুলো কী করে গড়ে উঠলো, জীনক্রিয়া কীভাবে শুরু হল, মস্তিষ্কের মধ্যে অগণ্য স্মৃতি কীভাবে সঞ্চিত থাকে, মানুষের সৌন্দর্যচেতনা কোথা থেকে আসে—এসব রহস্য তখনও আমাদের মনকে আন্দোলিত করবে।

আর "সৌন্দর্য" বিজ্ঞানজগতেরও এক পরম রহস্য। জীবন ও প্রকৃতির বিহ্বল-করা সৌন্দর্য ছাড়াও বিজ্ঞানের মহত্তম তত্ত্বসৌধগুলির মধ্যেও এক অপূর্ব সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। শ্রডিংগার-এর wave equation-এর কথা বলতে গিয়ে পল ডিরাক তো স্পষ্টই বলেছেন, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, তত্ত্বরচনায় বাস্তবানুগত্যের চেয়ে সৌন্দর্যের গুরুত্ব বেশি, এবং একটি সার্থক তত্ত্বে সৌন্দর্যের উপস্থিতি অপরিহার্য *("it is more important to have beauty in one's equations than to have them fit experiment"—Scientific American,* May 1963 Pp. 45-53)।

কিন্তু সৌন্দর্য, সামঞ্জস্য, সুষমা—এসবের পাশেই, অন্তত মানবজগতে, রয়েছে সম্পদ-কর্তৃত্ব- ও ইন্দ্রিয়-লালসার ক্রূর বীভৎসতা। জগৎ যদি anthropic Principle অনুযায়ী সৃষ্ট হয়ে থাকে তাহলে ঐ নীতিই, অর্থাৎ ঐ নীতির স্রষ্টার মানসপ্রক্রিয়াই, সৌন্দর্য ও বীভৎসতা দুটি দিকের জন্যই দায়ী, একথা না মেনে উপায় নেই। সমস্ত সৌন্দর্য, যাবতীয় মাধুর্য এসেছে স্রষ্টার anthropic principle থেকে, আর কুৎসিত যা-কিছু তার জন্য দায়ী পাপী মানুষের দুষ্টতা, একথা আর চলবে না। কারণ ঐ দুষ্টতাও ঐ একই সৃষ্টিসূত্রপ্রসূত। আইনস্টাইন যে বলেছিলেন, বিশ্বসৃষ্টিতে প্রতিভাত অপূর্ব সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞাই তাঁর কাছে ঈশ্বরের প্রতীক, এবং মানুষের ভাগ্য নিয়ে মাথা-ঘামানো কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাস নেই—তার পিছনে কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে কি? বহু শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীই মনে করেন এই আংশিকভাবে সক্রিয় ঈশ্বরের ধারণার কোনো মানে হয় না। তাহলে হকিং যে বলেছেন, বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটিত হলে "আমরা ঈশ্বরমানসের সঙ্গে পরিচিত হব" এবং জনসাধারণও ঐ জ্ঞানের অংশীদার হবে (পৃষ্ঠা 110-111 দেখুন), সেটার পরিণতি কী দাঁড়াবে? Anthropic Principle-এর স্রষ্টা, অর্থাৎ বিচিত্র সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচিত্র কুশ্রীতার স্রষ্টা ঐ ঈশ্বরমানসের সঙ্গে বিজ্ঞানের মাধ্যমে সেই নতুন পরিচয় কি ধর্মতত্ত্ব ও নীতিচিন্তার জগতে একটা দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করবে? নাকি এর কোনো প্রভাবই সাধারণ মানুষের ওপর পড়বে না?

হয়তো এরকম কিছুই ঘটবে না। হয়তো মানবাস্তিত্ববাদ একটা ক্ষীণ অনুমানের পর্যায়েই থেকে যাবে। হয়তো হলডেন-এর কথাই (পৃ 111 দেখুন) ঠিক বলে প্রমাণিত হবে। মানুষের বুদ্ধি তো নয়ই, এমন-কি কল্পনাও বিশ্বরহস্যের কাছাকাছি কোথাও পৌঁছাতে পারবে না। সম্ভাবনাটির কথা ওআইনবার্গ তাঁর *Dreams of a Final Theory* বইটিতে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন: খুব বুদ্ধিমান কুকুরদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অনেক কিছু করানো যায়, কিন্তু তাদের কোআন্টাম বলবিদ্যা শেখানো বোধহয় সম্ভব নয়। তেমনি হয়তো দেখা যাবে বিশ্বরহস্য বুদ্ধিমান মানুষের বুদ্ধির একেবারেই অতীত।

বিষয়-সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জি

ক· প্রাথমিক পর্যায়ের

Martha Evans Martin, *The Friendly Stars,* (with star map), Harper & Bros, 1907. Revised by D. H. Menzel, Dover, 1964.

I. Nicholson, *Astronomy,* (with star map) Hamlyn All-colour paperback

P. L. Brown, *Astronomy in Colour,* (with star map)

H. J. Bernhard, Dorothy Bennett & H. S. Rice, *New Handbook of the Heavens,* Mentor Books, 1954.

P. Moore *The Amateur Astronomer,* W. W. Norton NY 1957; পরে নতুন সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।

P. Moore, *A—Z of Astronomy,* Collins 1966, 1976.

P. Moore, *Astronomers' Stars,* Routledge & Kegan Paul, 1987.

James Jeans, *The Universe Around Us,* 1929.

জগদানন্দ রায়, "গ্রহ নক্ষত্র", 1915.

S. Mitton (ed.), *The Cambridge Encyclopaedia of Astronomy,* (with star map), Crown Publishers NY 1977.

রমাতোষ সরকার, "মহাবিশ্ব", রিসার্চ ইন্ডিয়া পাবলিকেশন্স্, 1979.

G. Gamow, *Mr Tompkins in Wonderland,* CUP, 1940.

G. Gamow, *Mr Tompkins Explores the Atom,* CUP 1945.

দ্র· গ্যামোর বইদুটির বিষয়বস্তু পুনর্লিখিত ও একত্রিত হয়ে *Mr Tompkins in Paperback* নামে 1969 সালে প্রকাশিত হয়। মূল বইদুটিই কিন্তু বেশি আকর্ষণীয়।

Lincoln Barnett, *The Universe and Dr Einstein,* Harper Brothers 1948, Mentor Books, 1952.

Carl Sagan, *Cosmos,* Macdonald 1981.

James Jeans, *The Mysterious Universe,* 1930.

R. Jastrow, *Until the Sun Dies: A Scientific History of the Universe,* W. W. Norton 1977, Fontana, 1979.

A. C. B. Lovell, *The Individual and the Universe,* CUP 1959.

Norton's Star Atlas, Gall & Inglis, 1910; Longman, 1986.

খ· কিছু বৈজ্ঞানিক ধারণাসম্পন্ন পাঠকের জন্য

Agnes Clarke, *The System of the Stars,* 1895, 1905.

Robert Burnham Jr. *Burnham's Celestial Handbook*; Vols one, Two & Three, Dover 1978.

G. O. Abell, *The Realm of the Universe,* Sounders, Philadelphia 1980.

D. A. Cooke, *The Life and Death of Stars,* Crown Publishers NY 1985.

P. Murdin & D. Malin, *Colours of the Stars,* CUP 1984.

E. P. Hubble, *The Realm of the Nebulae,* Yale 1936, Dover 1958.

G. Gamow, *The Birth and Death of the Sun,* Revised ed. Mentor, 1952.

G. Gamow, *The Creation of the Universe,* Viking Press, 1952.

J. Jeans, *The growth of Physical Science,* 1933, 1947.

A. Eddington, *The Nature of the Physical World,* 1928.

Fred Hoyle, *Frontiers of Astronomy,* Harper & Brothers 1955, Mentor 1957.

Fred Hoyle, *Galaxies, Nuclei and Quasars,* Heinemann 1965.

R. Kippenhahn, *100 Billion Suns,* Unwin paperback 1985.

F. H. Shu, *The Physical Universe,* Univ. Science Books, Calif. 1982.

P. Murdin & L. Murdin, *Supernovae,* CUP, 1985.

M. Zeilik & Gaustad, *Astronomy: The Cosmic Perspective,* Harper & Row 1983.

R. Harrison, *Cosmology,* CUP, 1982.

J. Silk, *The Big Bang: The Creation and Evolution of the Universe,* W. H. Freeman 1980.

R. Wilson, *The Cosmic Microwave Background Radiation, Science,* August 1979.

P. Peebles & D. Wilkinson, *The Primeval Fireball, Scientific American* June 1967.

J. A. Coleman, *Relativity for the Layman,* W. F. Press, NY, 1954.

H. Friedman, *The Amazing Universe,* National Geog. Soc. 1975.

Valerie Illingworth, *The Macmillan Dictionary of Astronomy,* Macmillan, 1979

গ· জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান ও বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কিত গভীর আলোচনা

(যথাসম্ভব সহজ ভাষায় লেখা)

A. Einstein, *Theory of Relativity: A Popular Exposition,* Methuen 1920.

A. Eddington, *The Expanding Universe,* CUP, 1933.

G. Gamow, *One Two Three Infinity,* Viking Press 1947, Mentor 1953.

Bertrand Russell, *A B C of Relativity*

H. E. Bethe, *What Holds the Nucleus Together, S.A.* Sept 53

John Barrow. *Theories of Everything,* Vintage 1991

G. Gamow, *The Evolutionary Universe, Scientific American*, Sept 56

E. Schrodinger, *What Is Matter? Scientific American,* Sept 53

P. A. M.Dirac,*Evolution of the Physicist's Picture of Nature,S.A* May63

P.C.W. Davies & J. Brown (Ed.), *Superstrings: A Theory of Everything?* (CUP 1988)

K. S. Thorne, *Gravitational Collapse, Scientific American,* Nov 67.

J. Narlikar, *The Structure of the Universe,* OUP 1977.

P. C. W. Davies, *Space and Time in the Modern Universe,* CUP 1977.

S. Weinberg, *The First Three Minutes,* Fontana 1978.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিশ্বপরিচয়", বিশ্বভারতী 1937.

N. Henbest & M. Martin, *The New Astronomy,* CUP 1983.

L. Tarasov, *This Amazingly Symmetrical World,* Moscow, 1985.

M. Kaku & J. Trainer, *Beyond Enistein: The Cosmic Quest for the Theory of the Universe,* Bantam Books 1987.

S. Hawking, *A Brief History of Time,* Bantam Books 1988.

Fred Hoyle, *The Intelligent Universe*

Kenneth Lang & Owen Gingerich (ed.)*A Source Book in Astronomy and Astrophysics,* 1900-1975, Harvard Univ. Press 1979.

Wil Tirion, *Sky Atlas 2000.0,* Sky Publishing. Corp. & CUP, 1981, 1982.

Paul Davies, *Superforce,* Heinemann, 1984.

S. Weinberg, *Dreams of a Final Theory,* Vintage 1994

S. Hawking, *Black Holes and Baby Universes,* Bantam, 1993.

নির্দেশিকা

